মহেশ্বরপাশা পরিচয়।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

("যশোহর-খুলনার ইতিহাস" প্রণেতা, দৌলতপুর কলেজের
ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র
মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত।)

—*—

ডাক্তার—
শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ, সাহিত্যভূষণ
সঙ্কলিত।

আষাঢ়, ১৩৩৬।

[গ্রন্থকারের স্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য ৩ টাকা।

CamScanner

প্রকাশক :—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু

মহেশ্বরপাশা।

প্রিণ্টার :—

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল

"শ্রীরাম প্রেস"

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফটোগ্রাফার :—

(১) শ্রীযুত মণিলাল মজুমদার

১১০নং হাঁজরা রোড, কলিকাতা।

(২) শ্রীযুত অমূল্যকুমার ঘোষ

খুলনা, আর্ট গ্যালারী প্রভৃতি।

ফটো এনগ্রেভার ও ব্লক প্রিণ্টার :—

মহিলা প্রেস,

২৯ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CamScanner

"আজিগো তোমার চরণে জননি
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান,
ভক্তি-অশ্রু-সলিলে-সিক্ত
শতেক ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি
পয়সা কুড়া'য়ে পথে পথে মাগি
তোমারে পূজিতে গিলেছি জননি!
স্নেহের সলিলে করিয়া স্নান।"

দ্বিজেন্দ্রলাল

সচিত্র

[illegible] কাহিনী—

[illegible]।

মূল্য ॥০ আনা।

কাব্য—

প্রভাবতী—

মূল্য ॥৵০ আনা।

[illegible] পদ্যে শিশুপাঠ্য—

ছেলেদের

রা—মূল্য ।৵০ আনা।

গল্প—

মরীচিকা—

মূল্য ॥০ আনা।

ইতিহাস—

মহেশ্বরপাশা

পরিচয়—

মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু

প্রণীত

চিকিৎসা পুস্তক—

৬। প্রাক্‌টিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিকস্‌

—মূল্য ৪৲ টাকা।

৭। সরল হোমিও ভৈষজ্যাবলী

—মূল্য ১॥০ টাকা।

৮। ম্যালেরিয়া ও হোমিওমতে তাহার প্রতিকার—

মূল্য ২৲ টাকা।

৯। বাত চিকিৎসা

—মূল্য ৸০ আনা।

১০। বসন্তরোগ চিকিৎসা—

মূল্য ৸০ আনা।

১১। পথ্যাপথ্য বিচার—

মূল্য ॥০ আনা।

১২। খাদ্য ও দ্রব্য-গুণ বিচার—

মূল্য ।০ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

মহেশ্বরপাশার অধিষ্ঠাত্রী দেবী

শ্রীশ্রী৺কালী মাতার

পবিত্র নামে

মহেশ্বরপাশার ক্ষুদ্র ইতিহাস

দীন গ্রন্থকার

কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

—খগেন্দ্রনাথ—

CamScanner

ভূমিকা।

জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মানবশিশু জননী ও জন্মভূমিকেই প্রথম চিনে, প্রথম ভালবাসে। ইহাই মানব-প্রকৃতি, ইহাই স্বাভাবিক রীতি। জননী ও জন্মভূমি উভয়ই বিশ্বজননীর প্রতিকৃতি; জগন্মাতার ছবি এই উভয়ে যেমন ফুটিয়াছে, আর কোন তৃতীয় আধারে তেমন ফুটে নাই। জননী ও জন্মভূমি উভয়েই সর্ব্বংসহা; সন্তানের মূত্রপুরীষে বা পীড়নদোষে অন্য কাহারও মুখে এমন বিকারশূন্য মধুর ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। উভয়ের স্নেহ-ধারা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত অবিরাম, অবিকৃত ও অপক্ষপাতধারে নিম্নমুখে ক্ষরিত হয়, উহাতে আত্ম বিলাইতে জানে, ফিরিয়া চাহিতে জানে না। জননীর বক্ষোবাহিত ক্ষীরধারা ও জন্মভূমির ফলশস্য বা নীরধারা সহজে সকলে সমানভাবে পায়, প্রতিদানের কোন কথা নাই। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া চিত্রিত, কারণ আমাদের কল্পনায় আনন্দ নিকেতনের শেষ চিত্র স্বর্গ। একদিন বিহার প্রদেশের রোহিতাশ্ব দুর্গের শীর্ষে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিলাম, সেই শৈলপাদমূলে প্রবাহিত গৈরিকানুলিপ্ত জলধারায় ধবলিত শোণনদ যেন রজতধবল শিবের মত শায়িত, আর তাঁহার বক্ষে অপর পারে সৈকতপ্রান্ত হইতে লোকাবাসশেষ পর্য্যন্ত, নীলশস্যমণ্ডিত ও কুটীররাজিবিরাজিত বসুন্ধরা যেন আমার উলঙ্গিনী নীলাঙ্গিনী কালীমায়ের নীলছবি ফুটাইয়া রাখিয়াছে। শস্যভারময়ী পল্লীবাসী যে বিশ্বজননীর লীলার ছবি, সে ধারণা সেদিন কিছুতেই মুছিতে পারিতেছিল না।

এই জননী ও জন্মভূমির প্রতি ভক্তিই প্রকৃত পরানুরক্তি। ইহা হইতেই সকল ভক্তিপ্রীতি স্নেহ-মমতার উৎপত্তি। মায়ের মুখেই পিতার

পরিচয়, পিতৃভক্তি তাহারই ফল ; ভ্রাতৃস্নেহ বা বন্ধুপ্রীতি মাতৃমহিমার ক্রমিক পরিণাম। জন্মভূমির প্রতি আসক্তি বা কৃতজ্ঞতার জন্যই রাজা বা শাসককে চিনি ; তাহা হইতেই স্বগণ বা স্বজাতিপ্রেম মানবকে সবল ও সংঘবদ্ধ করিয়া সকল সাধনায় উন্নীত করে। কাহাকেও আপন মাকে চিনাইয়া দিতে হয় না ; সে আপনি চিনে, আপনি মানে ; তবে এক মা যে কিরূপে দেশের মাঝে ছড়াইয়া পড়িয়া সমাজের সকল সম্বন্ধ পবিত্র করেন, তাহা জানিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। তেমনই চক্ষু মেলিবার শক্তি-বৃদ্ধির সহিত জন্মভূমির ক্ষুদ্র গণ্ডীও ক্রমে অবিচ্ছিন্ন খণ্ডভূভাগের সহিত মিশিয়া দেশে পরিণত হয়। তখন মাতৃভক্তির মত দেশাত্মবোধ মানব-চরিত্রের একটী শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহারই ভিত্তিতে সাহিত্য-দর্শন, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া জাতীয় সভ্যতার সৌধ গড়িয়া উঠে।

মানুষ হইতে হইলে স্বদেশকে চিনিতে হয়। যাহাতে চিনাইয়া দেয়, সেই শাস্ত্রের নাম ইতিহাস। তাহাতে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপদেশ-সম্বলিত পূর্ব্বকথা বর্ণিত থাকে। মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত দেশেরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে। পল্লীই তাহার প্রথম সোপান, কতক-গুলি পল্লী লইয়া জেলা, কতকগুলি জেলা লইয়া বিভাগ বা খণ্ডরাজ্য এবং কতকগুলি বিভাগের সমাহারই দেশ। সমষ্টিতে দেশ, ব্যষ্টিতে পল্লী ; সুতরাং দেশ একটী সুবৃহৎ পল্লী ব্যতীত কিছুই নহে। তাই দেশের ইতিহাস জানিতে হইলে, পল্লীর পরিচয় জানিতে হয় ; এইরূপ পরিচয় নিচয় সঞ্চয় করিতে পারিলে জেলার ইতিহাস গড়িয়া উঠে, জেলার ইতি-বৃত্তের সার সঙ্কলন করিতে পারিলে দেশের ইতিহাস হয়। সেই ইতিহাসে দেশ মাতৃকার পুরাতন যুগের গৌরব-কাহিনী জানা যায়। তাহা না জানিলে, দেশবাসী কখনও আপন সভ্যতা-গৌরবে দণ্ডায়মান হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে শিরোত্তোলন করিতে পারে না।

আমাদের বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই। যাহা আছে, তাহা কতক অসম্বদ্ধ, অবিন্যস্ত খণ্ডকাহিনী মাত্র, অধিকাংশই অনুবাদ ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ লইয়া গ্রথিত। অথচ দেশের ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না। কে লিখিবে? লিখিবার অধিকার সকলেরই বিশেষতঃ যে দেশে বা যে পল্লীতে যাহার জন্ম, তথাকার ইতিহাস তিনিই লিখিবেন। স্নেহমমতায় পুলকিত উলঙ্গিনী মায়ের সর্ব্বাঙ্গ যেমন শিশু-সন্তানের নিকট অতি পবিত্র ভাবে পরিচিত, নিজ জন্মস্থানের ইতিহাস রচনায়ও তেমনি ভক্তলেখক সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি বঙ্গদেশের দুইটি জেলা, আমার প্রিয়জন্মভূমি, যশোহর ও খুলনার ইতিহাস একত্র করিয়া লিখিয়া দুই খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। সংক্ষেপে বিবৃত করিবার বিশেষ চেষ্টা থাকিলেও সে দুইখণ্ড গ্রন্থ আকারে খুব বড় হইয়াছে। বহু লোকে তাহা পড়িবার অবসর পান না, বলিয়া অনুযোগ করেন; সে আমার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশে এখন রেলষ্টীমার মোটরের প্রাচুর্য্যে বহু লোকে যেমন বেশীদূর পায়ে হাটিতে পারে না, তেমনই বহু নাটক নভেল ও সংবাদপত্র প্লাবিত দেশে লোকে কষ্ট করিয়া ইতিহাসের সত্য তথ্য জানিতে চাহে না। তবুও আমার জীবনের একান্ত সাধনা এই যে, আমি যে দুইটি জেলা গ্রহণ করিয়াছি উহার ঘরে ঘরে উহার ইতিকথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কর্ত্তৃক যাহাতে পঠিত ও আলোচিত হয়, তাহাই করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি বালকদিগের জন্যও দুই জেলার দুইখানি শিশুপাঠ্য ইতিহাসও প্রকাশ করিয়াছি। ভূগোলচিত্র, বংশাবলী-সংগ্রহ এবং পল্লীকাহিনী সংগ্রহ প্রভৃতি যে উপায়ে হউক, আমার দ্বারা বা আমার অনুরক্ত ছাত্র বা উদীয়মান লেখকদিগের দ্বারা এই দুই জেলার পূর্ব্বকথা উদ্ভাসিত করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। যশোহর খুলনার ইতিহাসে আমি কত গণ্ডগ্রামের অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক সন্দর্ভ আলোচনা করিয়াছি; সকল গ্রামের কথা বলিতে পারি নাই। প্রসিদ্ধ গ্রাম সমূহের

পৃথক্ পৃথক্ পরিচয়সূচক গ্রন্থ সে সব গ্রামবাসী কর্ত্তৃক লিখিত হইলে, সে জাতীয় অভাব পূর্ণ হইতে পারে। পরন্তু বড় বড় গ্রামের কাহিনী ও বংশবিবরণী প্রকাশিত হইলে, তাহাতে জেলার ইতিহাসকে সম্পুষ্ট করিবে। এই জাতীয় চেষ্টা বর্ত্তমান গ্রন্থে হইয়াছে। এজন্য আমার বড় আনন্দ। তাই হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে আমার কিছু প্রাণের কথা লিখিলাম।

মহেশ্বরপাশা খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম; এখানে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের এবং বৈশ্যবারুজীবীদিগের বহু বংশের বাস। সে সব বংশের অনেক কৃতী সন্তান এই মহেশ্বর-পাশা গ্রামের যশঃ বিস্তৃত করিয়াছেন। মদীয় অন্যতম প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ খগেন্দ্র নাথ বসু এই গ্রামের ইতিবৃত্ত ও বংশ-কাহিনী সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করিতেছেন। এরূপ পুস্তককে প্রকৃত ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না; এজন্য তিনি পুস্তকের নাম দিয়াছেন, "মহেশ্বর-পাশা পরিচয়।" খগেন্দ্র নাথ এই গ্রামের অধিবাসী, তিনি তাঁহার পল্লীকে একান্ত ভালবাসেন। সুতরাং তিনিই ইহার বিবরণ লিখিবার অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি সুলেখক বলিয়া পরিচিত; তৎপ্রণীত "মালঞ্চ" "মরীচিকা" প্রভৃতি গল্প পুস্তক, "প্রভাবতী" কাব্য ও অন্যান্য কতকগুলি গ্রন্থ সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পাঠকগণ এই পুস্তকে তাঁহার সরল ও প্রাঞ্জল এবং অনাবিল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার পরিচয় পাইবেন। পুস্তকখানি ত্বরিতগতিতে লিখিত বলিয়া অনেক স্থলে বিষয়-সমাবেশের বিশেষ শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ভাষা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, লেখকের উৎসাহ অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এই ভাবে আমাদের জেলার অন্যান্য প্রধান প্রধান জনবহুল গ্রাম গুলির "পরিচয়" সঙ্কলিত হইলে, মহদুপকার সাধিত হইবে।

মহেশ্বরপাশা গ্রাম চাঁচ্ড়া রাজসরকারের কর্ম্মচারী মহেশ্বর ঘোষ

কর্ত্তৃক আনুমানিক ১০০০ সালে বা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মহতাব রাম রায় চাঁচড়ার রাজা, তাঁহার রাজত্ব কাল—(১৫৮৮-১৬১৯)। সুতরাং এই গ্রামের বয়স আনুমানিক ৩৫০ বৎসর। মহেশ্বর ঘোষ হইতে ১০।১১ পুরুষ নামিয়াছে, সে হিসাবেও উহা সপ্রমাণ হয় কারণ সাধারণতঃ তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরা হয়। মহেশ্বর ঘোষের আগমনের পূর্ব্বে এখানে সুন্দর বনের মত জঙ্গল ছিল। এইস্থানে দক্ষিণ বাহী ভৈরব নদ হইতে কয়েকটি শাখা নদী পশ্চিম মুখে জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। এখন নদী নাই, খাতের চিহ্ন আছে। গ্রামের উত্তর দিকে মালঞ্চের খাত এখনও বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া নদীর মত দেখায়। গ্রামের দক্ষিণদিকে পশ্চিমমূখী একটী নদীর উত্তর কূলে ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে এক তান্ত্রিক কাপালিক সন্ন্যাসী পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর ৺মহাকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উহাই এখন পুরাতন ৺কালী বাড়ী। বিশেষ বিবরণ পুস্তক মধ্যে আছে। মূর্ত্তি সম্বন্ধীয় অভিমত আমি পূর্ব্বে গ্রন্থকারের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম, গ্রন্থকারের উক্তি সেই মতেরই পরিপোষক। নানাবিধ কিম্বদন্তীতে আস্থা বা অনাস্থা করা পাঠকের স্বেচ্ছাধীন ; তবে এক তান্ত্রিক মহাসাধক সিদ্ধাসনে যে মহামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শতবিড়ম্বনায় তাঁহার অঙ্গচিহ্ন বিলুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইলেও মহাশক্তির সাধনার মাহাত্ম্য এখনও জাগ্রত আছে। স্থানীয় আনুষ্ঠানিক হিন্দু অধিবাসিগণের আধুনিক চেষ্টায় স্থানটিকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। মায়ের বাড়ীর সম্মুখে সাঁড়াডাঙ্গির মাঠ দিয়া যে দূরবিস্তৃত খাতের চিহ্ন আছে, সম্ভবতঃ নদীটির নাম ছিল—সাঁড়া,সেখানে দাঁড়াইয়া অতীতের প্রতি নয়নক্ষেপ করিলে কল্পনার আলোকে অনেক স্মৃতি আত্মপ্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দেয়, কোথায় মহাশ্মশানের উপর শ্মশানবাসিনীর আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ৪০০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে;সাধকের ধ্যানের লীলা এখনও সেখানে বিরাজমান।

মহেশ্বরপাশা গ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বহুশাখা বিশিষ্ট কুলীন ও বংশজের বাস। তন্মধ্যে "খনিয়ার চাটুতি" বলিয়া চিহ্নিত কুলীন চট্টোপাধ্যায় বংশ বিখ্যাত এবং দানশীল ও অতিথি-বৎসল বলিয়া সুপরিচিত। তদ্ব্যতীত খড়দহ ও বল্লভীমেলের শাণ্ডিল্য, খড়দহ মেলের মুখোপাধ্যায়, হরিদাসপুরের কাঞ্জীবংশ সম্ভূত "মুখভারত" উপাধিধারী ভট্টাচার্য্য, ঐ বংশীয় সুরাইমেলের কুলীন কাঞ্জিলালগণ, হরিদাসপুর হইতে আগত "আগমবাগীশ" বংশ, শাণ্ডিল্য বংশজ মল্লিকগণ, শ্রোত্রিয় মুন্সী ও রায় এবং সাবর্ণ বারেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বংশ মহেশ্বরপাশার ব্রাহ্মণ সমাজের অঙ্গ। কায়স্থকুলীনের ছয়সমাজভুক্ত কুলীনেরা এখানে বাস করিতেছেন। বড়িশা ও টেকার কুলীন মিত্র, মাহিনগর সমাজের বসু কুলীন, আকনা সমাজের বিদ্যানন্দকাটি ও মঙ্গলপৈতার ঘোষ বিশেষ সম্মানিত। এতদ্ব্যতীত করাতিয়ার ঘোষ বলিয়া চিহ্নিত গোষ্ঠীপতি মৌলিক কায়স্থেরা এখানকার অধিবাসী। এই বংশীয় গৌর ঘোষ দারোগার স্থাপিত "দারোগার হাট" এবং গ্রামের মধ্যে বিস্তীর্ণ দীঘি আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা পূর্ব্বে "খাঞ্জালি" দীঘি ছিল, কিন্তু খাঁ জাহান আলি ভৈরবের এপার দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার গতিপথ আমার ইতিহাসে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কায়স্থ মৌলিকদিগের মধ্যে গুহমজুমদারগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং গ্রামের মধ্যে নামে বা বৈষয়িক বিত্তে, কীর্ত্তি কথায় বা লক্ষ্মী সরস্বতীর কৃপায় তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী এবং সমাদৃত। ইহারা কাশ্যপ গোত্রীয় "বরাটের গুহ" বলিয়া পরিচিত। হুগলী জেলায় মহানাদ সমাজে গঙ্গা-তীরে বরাট গ্রাম অবস্থিত ছিল। বরাট হইতে চণ্ডীদাস গুহ চাঁচড়া রাজসরকারের চাকরী উপলক্ষ্যে মহেশ্বরপাশায় আসিয়া মহেশ্বর ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন এবং কালে এখানে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া এখানে বাস করেন। চণ্ডীদাস হইতে ১০ পুরুষ হইয়াছে, চণ্ডীদাস পুত্র পৌত্রাদি

সহ বৃদ্ধকালে এখানে বাস করেন, সুতরাং তাহার বাস প্রায় ৩০০ বৎসর ধরিতে পারি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের অব্যবহিত পরে চণ্ডীদাস মহেশ্বরপাশায় বাস করেন; অরাজককালে প্রতাপাদিত্যের হস্তচ্যুত সম্পত্তির কিছু কিছু চণ্ডীদাসের পুত্র রাজীব লোচনের হস্তে আসিতেছিল; তিনি ও তাহার ভ্রাতা কমললোচন তখন নবাব সরকারে চাকরী করিতেন। সম্ভবতঃ কপোতাক্ষতীরে মীর্জানগরে মীর্জা সাফ্‌সিকান্ মোগল ফৌজদার ছিলেন। তখনই রাজীব ও কমল চাকরীসূত্রে ফৌজদারের ব্যবস্থায় যথাক্রমে "মজুমদার" ও "সরকার" উপাধি লাভ করেন। সেনহাটি গ্রামে "সরকার-ঝি" নামক যে দীঘি আছে, উহার প্রতিষ্ঠাতা রাজারাম নামক মৌলিক কায়স্থ কর্ম্মচারীও এই আমলে মীর্জানগর হইতে সরকার উপাধি পান।

কাশ্যপ গোত্রীয় গুহগণ বঙ্গজ সমাজে উচ্চ কুলীন। রাজ্য রাজপাটই তাহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। যোদ্ধৃজীবনে বীরত্ব প্রদর্শন এই বংশের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ। মহেশ্বরপাশার গুহমজুমদারগণও কাশ্যপ গোত্রীয় এবং তাহাদের বংশ ধারায় সাহসিকতা ও শৌর্য্যের নিদর্শন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বিরাট গুহ বীজী পঞ্চকায়স্থের অন্যতম। তিনি কোলাঞ্চ হইতে আদিশূরের যজ্ঞে বঙ্গে আসেন। * তৎপুত্র নারায়ণ, এবং নারায়ণের পুত্র দশরথ। দশরথের চারি পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। রাজা বল্লাল সেনের সময়ে লক্ষ্মণের পুত্র হাড়ো এবং ভরতের পুত্র পীতাম্বর কুলমর্য্যাদা লাভ করেন। এই পুস্তকে পাঁজিয়ার প্রসিদ্ধ ঘটকরাজ নন্দরাম মিত্রের যে কারিকার অনুচিত্র প্রকাশিত হইতেছে,

* ঘটক নন্দরামের কারিকায় আছে "কলুঙ্ক নগরধাম"। বোধখানার চৌধুরী দেব বংশীয়দিগের কারিকায় আছে—"কুলঞ্চে বসতি, রাজার সন্ততি, হরিদেব ঠাকুর নাম।"

তাহা হইতে দেখা গিয়াছে রামগুহ বঙ্গে যান, ও ভরত শত্রুঘ্নের বংশ নাই, লক্ষ্মণ দক্ষিণরাঢ়ে থাকেন। একথা ঠিক নহে। বঙ্গজদিগের মধ্যেই গুহেরা কুলীন, দক্ষিণরাঢ়ীয় গুহ কুলীন নহেন। ইদিলপুরের অতি পুরাতন যে ঘটককারিকা আমার নিকট আছে, তাহাতে লক্ষ্মণ ও ভরতের উভয়ের বংশধারা পাইতেছি এবং বাচস্পতির কারিকানুসারে উহাদের পুত্র প্রথম সমীকরণে বল্লালী কৌলীন্য পান। হাড়োর পুত্র রুদ্র এবং পীতাম্বরের পুত্র সাক্ৰি। সেনবংশীয় দনুজমাধবের রাজত্বকালে তাঁহার সভায় বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের যে সমীকরণ হয়, তাহাতে রুদ্র গুহজ চণ্ডেশ্বর ও ভীম এবং সাক্ৰি গুহজ ভাস্ত সমীকুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩৫৫ পৃঃ)। নন্দরামের কারিকায় দেখি, লক্ষ্মণের দুই পুত্র, মুরারিধর ও অলঙ্কার। অলঙ্কারের অন্য নাম হাড়ো কিনা জানি না, সেরূপ হইলে তিনি যে বংশশূন্য নহেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। হাড়ো যদি অলঙ্কার হইতে পৃথক্ ব্যক্তি হন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি কৌলীন্য পাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে থাকেন, এবং তাহার অন্য ভ্রাতা মুরারিধর গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য রাঢ়ে আসেন। মুরারির পৌত্র দিবাকরের বংশ হুগলী জেলায় মহানাদ সমাজে বাস করিতেন। বিরাট গুহ হইতে ১৫শ পুরুষ গোপাল মহানাদে ছিলেন, এই বিরাট হইতে তাহার প্রপৌত্র ভরতের ধারায় ১৫শ পুরুষ প্রতাপাদিত্য প্রবল প্রতাপে যশোহরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ও ভরতের এই দুইধারা পাশাপাশি দেওয়া যাইতেছে। ৪ লক্ষ্মণ—মুরারিধর—বীরভদ্র—দিবাকর—বশিষ্ঠ—পৃথ্বীধর—হরীধর—কমলাকান্ত—ব্রহ্মানন্দ—রামশঙ্কর—১৪ শ্রীকর—১৫

এই কুলক বা কোলাক বলিতে দাক্ষিণাত্য বুঝায়, তথা হইতে কান্যকুব্জাদি দেশ ঘুরিয়া বিরাটের পুত্র দশরথ গুহ বঙ্গে আসেন।

গোপাল। ৪ ভরত—পীতাম্বর—সাত্রি—তপন—শঙ্কর—অশ্বপতি (বা আশগুহ)—গজপতি—ছকড়ি—রামচন্দ্র নিয়োগী—ভবানন্দ—১৪ শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য—১৫ মহারাজ প্রতাপাদিত্য। মরারির ধারা রাঢ়ে আসিবার পর ক্রমে ক্রমে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে প্রবিষ্ট হন—এখন হইতে উঁহারা মৌলিক হইয়া যান। কলিকাতা হোগলকুড়িয়ার বিখ্যাত কাঞ্জপ গুহেরা এই বংশীয় এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজভুক্ত। অশ্বগুহ ও গোবর প্রভৃতি বিখ্যাত মল্লবীর এই বংশের বীরত্বগৌরব রক্ষা করিয়াছেন। মহানাদ বরাটের গোপাল গুহের ধারা এই—১৫ গোপাল—শিব—হরিদাস—১৮ চণ্ডীদাস—শ্রীমুখ, রাজীব ও কমল। ঘটক নন্দরাম স্পষ্টই লিখিয়াছেন—চণ্ডীদাস "মহানাদ সমাজ ছাড়ি, মহেশ্বরপাশায় বাড়ী, জমিদারী হইল তথাকার। শ্রীমুখ রায় তস্য সুত, রাজীব মজুমদার খ্যাত তদনুজ কমল সরকার।" লবকুশ তুল্য দুইটী ভ্রাতা ঈশ্বর ও রাম কাহার পুত্র ঠিক বুঝা যায় না। তবে তাহারা চণ্ডীদাসের পৌত্র হওয়াই সম্ভব। চণ্ডীদাস মহেশ্বর ঘোষের কন্যা বিবাহ করিয়া বহুকাল পরে পুত্র পৌত্রগণসহ রাঢ় ছাড়িয়া বঙ্গে মহেশ্বরপাশায় আসেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। তদবধি মহেশ্বরপাশা এতদ্বংশীয় দিগের কীর্ত্তিগৌরবে দেশে বিদেশে যশোমণ্ডিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই বংশীয় কয়েকজন কৃতী সন্তানের জীবনচরিত দিয়া পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে, অন্য লেখকেরা এইভাবে গ্রাম্য বিবরণী লিখিয়া দেশের সেবা করিলে, আমি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিব।

দৌলতপুর কলেজ
১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৬

শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমি ঐতিহাসিক নহি বা ইতিহাস লিখিবার স্পর্দ্ধাও আমি রাখি না। চিকিৎসকের কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের অন্তরালে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার সময়াভাব। প্রত্যেকে পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সহিত তাহার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিচয় দেওয়া এবং বংশাবলী রক্ষা করাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। মহেশ্বরপাশা ঐতিহাসিক সম্পদে সম্পদশালিনী কি না, সে বিচার করিবার ক্ষমতা এবং অবসর আমার নাই, কিন্তু আমার মনে হয় ক্ষুদ্র বৃহৎ, নূতন পুরাতন, প্রত্যেক গ্রামের ইতিহাস হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক বালকের—ভিন্ন দেশের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে—নিজের গ্রামের ইতিহাস, নিজের বংশের ইতিহাস, নিজের পিতৃপুরুষের নাম অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে প্রতি সন্ধ্যায় প্রত্যেক পরিবারের প্রাচীনগণ বালকদের অন্যান্য পাঠের সহিত বংশের অন্ততঃ সাত পুরুষের নাম মুখস্থ করাইতেন। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই, তাই শিক্ষিতের নিদারুণ অধোগতি।

প্রতিবাড়ী হইতে আমি বংশ পরিচয়ের সহিত কীর্ত্তিমান ব্যক্তিগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। নিজের বংশগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যিনি যাহা বলিয়াছেন, প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহাই পুস্তকে সন্নিবেশ করি নাই। ফলতঃ এসম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তবুও ত্রুটী বিচ্যুতি থাকা সম্ভব, সেজন্য আমি সাধারণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। গ্রামের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া কি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, এখন, বুঝিতেছি এবং যিনি ভুক্তভোগী কেবলমাত্র তিনিই বুঝিবেন।

এই পুস্তক প্রণয়নে গ্রামবাসীগণ আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন এবং মুদ্রণে অনেকে সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু রায় সাহেব শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুত নলিনী নাথ মজুমদার আন্তরিকতার সহিত যেরূপ সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তাঁহারা গ্রামের গৌরব। এই পুস্তককে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে রায় বাহাদুর অত্যন্ত পরিশ্রম এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। স্বীয় বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ বংশের কীর্ত্তিকাহিনী সংগ্রহ করিতে যত্নপর হইতেন তাহা হইলে গ্রন্থকারের গ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য আজ সফল হইত।

গ্রামের অন্যতম সুসন্তান রায় বাহাদুর শ্রীযুত শশিভূষণ মজুমদার কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য জীবনী লিখিয়া দিয়া এই পুস্তকের সৌষ্ঠব যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাঁহার জীবনী তাঁহার বিদূষী তনয়া শ্রীমতী রেণুকা লিখিয়াছেন। ইহা ভিন্ন শ্রীমান নলিনীরঞ্জন মিত্র এবং শ্রীমান গোপাল চন্দ্র মজুমদার কয়েকটী জীবনী লিখিয়া দিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন; এই অমূল্য সহায়তার জন্য আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতেছি।

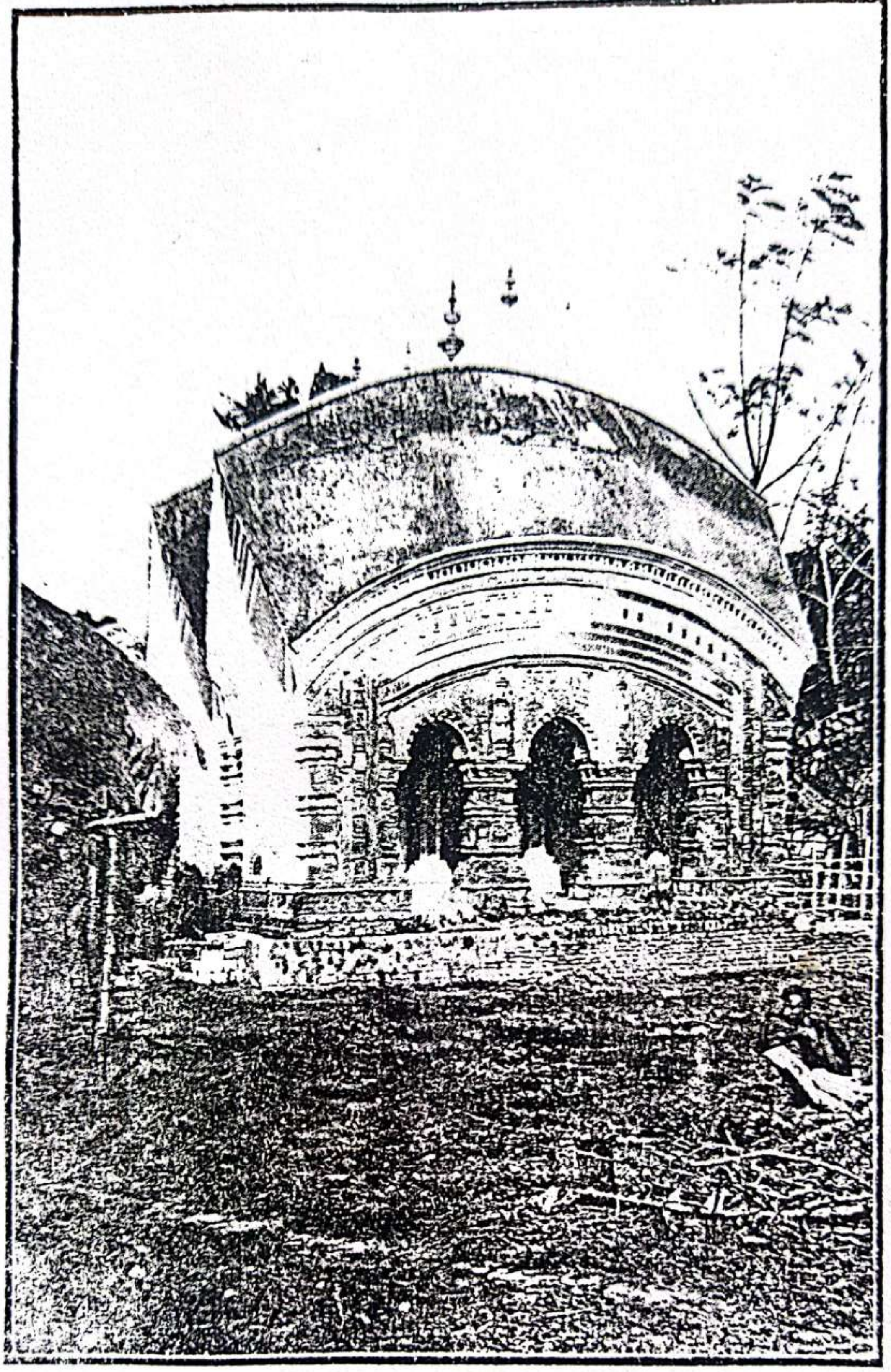
খুলনার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, "যশোহর খুলনার ইতিহাস" লেখক, দৌলতপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে নানাবিধ উপদেশ দিয়া এবং ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া আমাকে চির ঋণে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা ইহার অঙ্গে শোভা পাইতেছে; এই পুস্তকের ঐতিহাসিক ভাগ বিশেষতঃ সুন্দরবনে ভূমিগঠন এবং চাঁচড়া রাজবংশের

ইতিহাস প্রধানতঃ তাঁহার পুস্তক অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই পুস্তকের প্রুফ্ দেখিবার সময় শ্রীযুত কালিদাস ঘোষ, বি, এল, এবং শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মজুমদার আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকটও ঋণী।

কিন্তু এত সাবধানতাসত্ত্বেও কতকগুলি বানান ও অন্যান্য ভুল রহিয়া গিয়াছে। মফঃস্বলে থাকিয়া কলিকাতার প্রেসে পুস্তক ছাপাইবার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল, একথা ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যদি কখনও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয় এ সম্বন্ধে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করা যাইবে। ইতি।

মহেশ্বরপাশা (খুলনা)
১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৬।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু।



মল্লিক বাড়ীর যোড়বাংলা। [পৃষ্ঠা ৮২

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬	৩	১৩৩৫ সাল	১৩১৫ সাল
৭০	১৩	চতুথা	চতুর্থী
৭৪	১৫	চতুথা	চতুর্থী
৮৬	১	মহাষ্টমীর	মহাষষ্ঠীর
৯৩	১২	১২২৪	১২৩৪
১৩৫	১৬	১২৩৪	১৩৩৪
১৪৯	১৭	সঙ্গাঙ্গ	সর্ব্বাঙ্গ
১৮৮	১২	সসম্মানের	সম্মানের
১৯১	১৪	১৩০০	১৩৩০
১৯২	৫	তাঁহাকেই	তাঁহাতেই
১৯৬	২২	১২।১২।৯১২২	১২।১২।১৯২২
২৫৯	২২	সস	সন
২৬৬	৮	পালিতা	পালিকা

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বংশ পরিচয়।

CamScanner

অন্যান্য জাতি।

তৃতীয় অধ্যায়—বিবিধ।

চতুর্থ অধ্যায়—জীবনী সংগ্রহ।

CamScanner

অতিরিক্ত অধ্যায়।

CamScanner

চিত্র সূচী।

মহেশ্বরপাশা পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা।

——◦◦ ⁂ ◦◦——

মহেশ্বরপাশা খুলনার একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, সহর হইতে ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। খুলনা হইতে রেলপথে কলিকাতায় আসিতে প্রথমেই দৌলতপুর ষ্টেশন। দৌলতপুর মহেশ্বরপাশার পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত। খুলনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক জেলা, পূর্ব্বকালে এ স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল। খুলনা নদীমাতৃক দেশ, বহু নদী সমন্বিত এরূপ দেশ ভারতের অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। নদীর অন্যতম কার্য্য পলিমাটী দ্বারা ভূমি গঠন। পলিমাটীতে চড়া পড়িতে পড়িতে সমুদ্রও ক্রমে সরিয়া যায়। চড়া অত্যন্ত সারযুক্ত মাটী বলিয়া এ স্থানে প্রচুর পরিমাণে বনজঙ্গল জন্মে, এই বন সুন্দরবন নামে অভিহিত। পূর্ব্বকালে সমগ্র খুলনাই সুন্দরবন ছিল, বর্ত্তমানে খুলনার দক্ষিণাংশে সুন্দরবন অবস্থিত, উত্তরাংশে ধীরে ধীরে লোকের বসতি হইয়াছে।

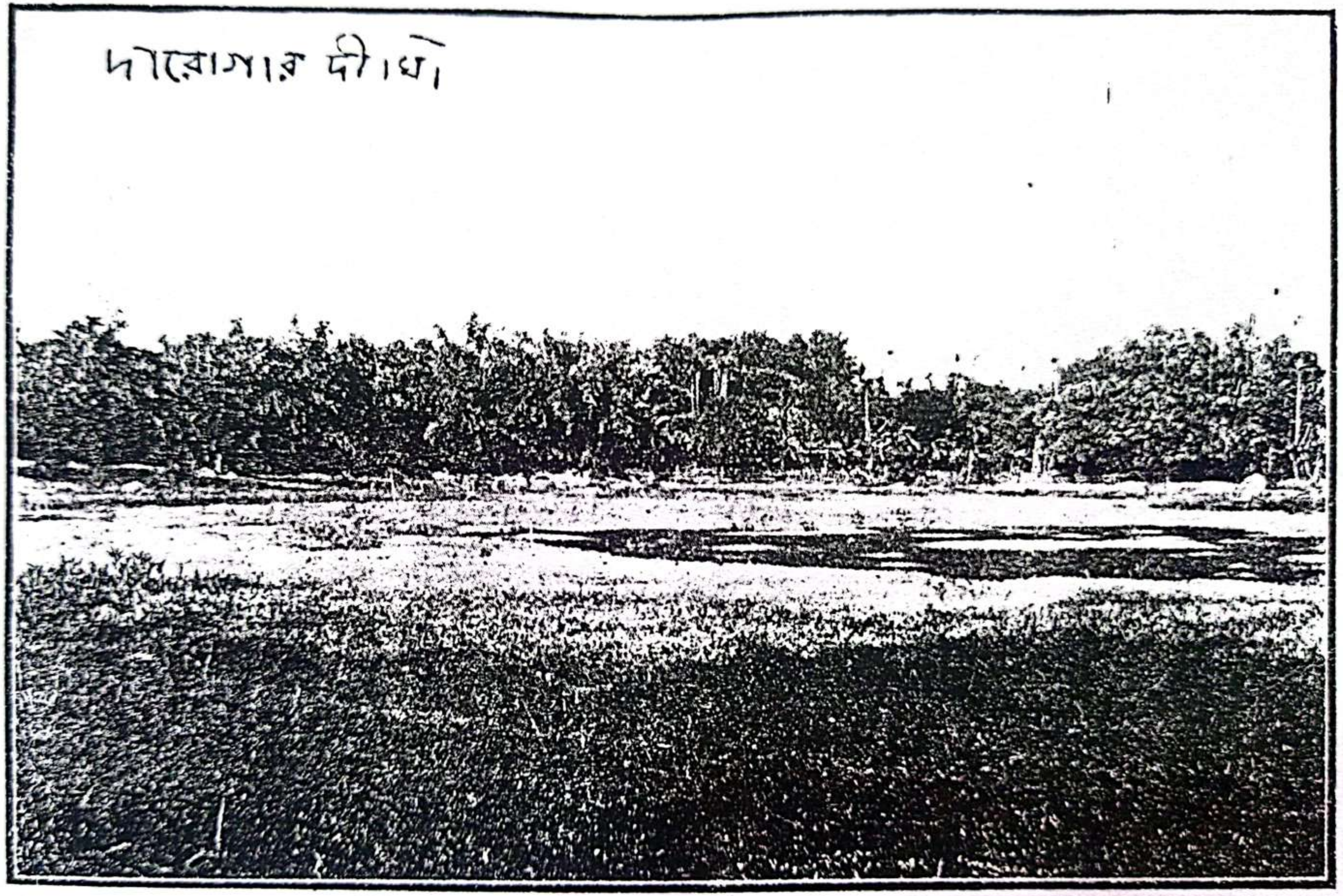
মহেশ্বরপাশাও এক সময়ে এই সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। এই বন সুন্দরী, পশুরী, কেওড়া প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষপূর্ণ ছিল। পুষ্করিণী খননে এখনও সেই সমস্ত পুরাতন বৃক্ষের গুঁড়ি এবং নিম্নস্তরে জোবমাটী দেখা যায়। সেই সমস্ত বৃক্ষ বহুকাল ধরিয়া পচিয়া জোব মাটিতে পরিণত হইয়াছে।

খুলনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও খুলনার অস্তিত্ব ছিল এবং তখন স্থানে স্থানে বনে জঙ্গলে অসভ্য ও নানা জাতি বাস করিত। ক্রমে পশ্চিমদেশ হইতে আর্য্যরা আসিয়া অনার্য্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া এখানে বাস করেন। আদি হিন্দুযুগের আর্য্য সভ্যতার বহু নিদর্শন খুলনা জেলায় এখনও অনেক স্থানে বর্ত্তমান।

অনেকে অনুমান করেন মহেশ্বরপাশা গ্রামও বহু পুরাতন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম অপেক্ষা ইহা অনেক পূর্ব্বে উঠিয়াছে এবং বাসের উপযুক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত বর্ষণে এবং জলপ্লাবনে অনেক গ্রাম জলমগ্ন হইয়া থাকে অথচ মহেশ্বরপাশা কখনও সেরূপ দুর্ভাগ্যে পতিত হয় নাই। কিন্তু মহেশ্বরপাশা বহু পুরাতন হইলেও ইহার বর্ত্তমান নাম আধুনিক। ইহা মহেশ্বর ঘোষের নামানুসারে হইয়াছে এবং বর্ত্তমান অধিবাসীবৃন্দের বসতিও তাঁহার সময় হইতেই হইয়াছে। এই গ্রামের পূর্ব্ব নাম অজ্ঞাত। এই গ্রামে সুন্দরবনে অসভ্য জাতির বসতি ছিল। মাঝে মাঝে দুই চারি ঘর ভদ্রলোকের বসতি থাকাও সম্ভব কিন্তু সে সমস্ত বংশের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে, এরূপ অনুমানের হেতুও আছে, বলিতেছি।

মহেশ্বরপাশার উত্তরাংশে দশ বিঘা জমির উপর একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, ইহাকে দারোগার দীঘি বলে। গৌর ঘোষ দারোগার অধিকারে ছিল এবং তিনি ইহার সংস্কার করেন বলিয়া ইহাকে দারোগার দীঘি বলে কিন্তু বাস্তবিক ইহা কত পুরাতন তাহা অনুমান সাপেক্ষ। খাঁ জাহান আলীর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধর্ম্মপ্রচারে বাহির হইয়া বহুস্থানে এই প্রকারের দীর্ঘিকা খনন করেন। সে আজ সাড়ে চারিশত বৎসরের কথা। কেহ কেহ বলেন, ইহা খাঁ জাহান আলীর অক্ষয় কীর্ত্তি;

CamScanner



দারোগার দীঘি। [পৃষ্ঠা ২

আবার অনেকে বলেন খাঁ জাহান আলীর বহু পূর্ব্বে এই দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছে। সদলবলে বাগেরহাটে যাইবার পথে, তাঁহার এই গ্রামে অবস্থিতি করার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি পয়োগ্রাম কসবা হইতে আসিয়া শ্যামগঞ্জের উত্তরে ভৈরব পার হইয়া বারাকপুর এবং সেনহাটির মধ্য দিয়া গমন করেন। ফলতঃ এই দীর্ঘিকার ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন।

মুসলমান বাদসাহের আমলে এখানে কোন শাসনকর্ত্তার বাস ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; কারণ তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত দীর্ঘিকার উত্তর পাড়ে ফুলবাড়ী নামে একটী ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লী আছে, ইহার সন্নিকটেই তাঁহার বাড়ী বা বাসস্থান ছিল এবং এই স্থানেই তাঁহার ফুলবাগিচা থাকা সম্ভব। ফুলবাড়ীর উত্তর-পূর্ব্বে রেল লাইনের দুইপার্শ্বের স্থানকে ভিতরবাস ও বাহিরবাস বলে। ফুলবাড়ীর প্রায় এক মাইল পশ্চিমে থানাবাড়ী নামে একটী মুসলমানপল্লী আছে; এইস্থানে প্রবলপ্রতাপ মুসলমান শাসনকর্ত্তার থানা তৈয়ার হইত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। দীর্ঘিকার পূর্ব্ব পাড়ে একটী নাতিদীর্ঘ বিল আছে এক সময়ে উহা ভৈরব নদের শাখা ছিল, এই বিলকে মালঞ্চ বলে; কিন্তু কেন ইহার নাম মালঞ্চ হইয়াছে তাহার কোন ইতিহাস জানা যায় না। মুসলমান শাসনের প্রভাবে এই স্থানের অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যায়।

এই গ্রামের অন্যতম কীর্ত্তি পুরাতন কালীবাড়ী, তাহা যে কতকালের, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সে বিষয়ের আলোচনা পরে করা যাইবে। ফলতঃ সুন্দরবনের ন্যায় এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই গ্রামের বহুবার উত্থান পতন হইয়াছে এরূপ অনুমানে বিস্ময় প্রকাশের কোন হেতু নাই। কালের কুটিল চক্রে সব গিয়াছে, শুধু তাহার কীর্ত্তি আছে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাদশাহ আকবর যখন আগ্রাতে রাজত্ব

CS CamScanner

করিতেন, তখন বঙ্গদেশে বার জন রাজার উদ্ভব হয়, ইহাদের নাম ছিল বারভূঞা। যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্য ইহাদের অন্যতম। তিনি গুহবংশীয় বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ ছিলেন। তাহার প্রতাপের কথা কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালি,
ষোড়শ হল্‌কা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

সমগ্র সুন্দরবন প্রতাপাদিত্যের জমিদারী ছিল, সুতরাং এই গ্রামও তাঁহার জমিদারীভুক্ত ছিল, সে আজ প্রায় ৪০০ বৎসর হইতে চলিল।

যশোহরের চাঁচ্‌ড়া একটী পুরাতন রাজবংশ। ইহার পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়ের ভ্রাতা রত্নেশ্বর প্রতাপাদিত্যের সরকারে চাকুরী করিতেন। এক সময়ে প্রতাপাদিত্যের নিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণ সামিয়ানার তলে বসিয়া আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রবল ঝড় উঠিয়া ব্রাহ্মণদের আহার বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। রত্নেশ্বর অত্যন্ত বলবান পুরুষ ছিলেন, তিনি সেই প্রকাণ্ড সামিয়ানার মধ্যস্থলের খুঁটি ধরিয়া ঝটিকা হইতে সামিয়ানা রক্ষা করেন। এইভাবে ব্রাহ্মণভোজনরূপ যজ্ঞ রক্ষা করেন বলিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যজ্ঞেশ্বর নাম রাখেন এবং তাঁহাকে বার হাজার বিঘা নিষ্কর জমি প্রদান করেন। তদানীন্তন মহেশ্বরপাশা গ্রাম এইভাবে প্রতাপাদিত্য হইতে চাঁচ্‌ড়া জমিদারীভুক্ত হয়, কিন্তু এ সময়ে চাঁচ্‌ড়ায় রাজবাটী নির্ম্মিত হয় নাই। কেশবপুরের

CamScanner

নিকটে কোন গ্রামে তাঁহাদের বাস ছিল। রাজা কন্দর্প রায়ের সময়ে চাঁচ্ড়ায় রাজধানী নির্ম্মিত হয়; তিনি ইং ১৬১৯ হইতে ১৬৫৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা মনোহর রায়ের (১৬৫৮—১৭০৫) নাম মহেশ্বরপাশার অধিকাংশ তায়দাদে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহেশ্বর ঘোষ এবং তাঁহার গ্রাম।

এই সময়ে ঘোষবংশের বীজ পুরুষ মকরন্দের অধস্তন ১৫শ পর্য্যায়ের মহেশ্বর ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি চাঁচ্ড়ার রাজা মহতাবরাম রায়ের সময়ে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজ সরকারের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিবাস হুগ্লীর অন্তর্গত বালি নামক গ্রামে ছিল। তিনি কুলীন ছিলেন কিন্তু মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিয়া, কুল নষ্ট করিয়া বংশজ হন, এই পাপের জন্য তিনি আর দেশে যাইতে পারেন নাই। চাচঁ্ড়ার রাজাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া মহেশ্বরকে এই গ্রাম নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যতখানি জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপন করিতে পার, তাহাই তোমাকে জায়গীর দিলাম।"

মহেশ্বর ঘোষের বংশে এখনও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে তিনি এখানে আসিয়াই তাঁহার সীমানা ঠিক করিয়া লইলেন। ভৈরবের কূলে (মদন ভদ্রের ঘাটে) একটী বটের চারা পুতিলেন, ইহা হইল পূর্ব্ব সীমানা। সে বট গাছ এখন নাই, তাহা ভৈরবের বিশাল উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। দৌলতপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের পরে জীবন জোদ্দারের রাস্তা যে স্থানে দৌলতপুরের রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, সেখানে একটী বটের চারা

CamScanner

পুতিলেন, ইহাই তাঁহার গ্রামের দক্ষিণ সীমা। এই প্রকাণ্ড বটগাছ তিন শত বৎসর পরে গত ১৩১৬ সালের প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে (Cyclone) ভূমিশায়ী হইয়াছে। পশ্চিম সীমানায় তেলিগাতিরও পশ্চিমে দুটী বটের চারা একই স্থানে রোপণ করেন; উহা আজও জোড়া বটতলা নামে বর্ত্তমান আছে। উত্তর সীমানার বটের চারা যোগীপল্লী (জুগীপোল) গ্রামের উত্তর প্রান্তে। নিজ হস্তে বটের চারা পুতিয়া তিনি মাঝে মাঝে লোকের বসতি করান। এইভাবে পতিত গ্রামের পুনরুদ্ধার করেন বলিয়া তাঁহার নাম হইতে গ্রামের নূতন নামকরণ হইয়াছে মহেশ্বরপাশা।

বর্ত্তমান কালের সুন্দরবন যেমন বহু নদীনালায় পূর্ণ, এই গ্রামের মধ্যেও সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বিদ্যমান ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে। দারোগার হাটের দক্ষিণ হইতে একটী নালা বরাবর মালঞ্চ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বমুখী হইয়া ভৈরবের সঙ্গে মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার মাঝে মাঝে চড়া জমিতে লোকের বসতি হইয়াছে। সেইরূপ আর একটি নদী দৌলতপুর ষ্টেশনের নিকট হইতে বুনোপাড়ার নিম্ন দিয়া সাড়াডাঙ্গি মাঠ অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে।

জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া বসতির উপযুক্ত হইলে মহেশ্বর ঘোষ ভৈরবের পূর্ব্বোক্ত শাখা দিয়া আসিয়া বসুমিত্রপাড়ায় তাঁহার আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বে লোকে নদীর ধারে ধারে বসতি স্থাপন করিত। কিন্তু এই সময় দেশে আরাকানবাসী মগ এবং পর্টুগীজ ফিরিঙ্গীদের ভয় ছিল। তাহারা জলপথে আসিয়া গৃহস্থের বাড়ী ঢুকিত, স্ত্রীলোকদের ইজ্জৎহানির চেষ্টা করিত এবং নানাভাবে গৃহস্থের উপর অত্যাচার করিত। তখন দস্যুভয়ও ছিল। এই জন্য মহেশ্বর নদীতীর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার সহিত পুরোহিত বারেন্দ্র শ্রেণীর জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী ছিলেন, পরামানিক ভবানন্দ বা ভবাই, একজন

ধোপা এবং একজন নমঃশূদ্র ভৃত্য ছিল। তিনি পুরোহিতের বাড়ী পশ্চিমপাড়ায় করিয়া দেন। পরামানিক প্রথমতঃ কালীবাড়ীতেই ছিল, পরে বংশবৃদ্ধি হইলে কোপারকূল উঠিয়া যায়। নমঃশূদ্র ভৃত্য পশ্চিমপাড়ায় বাস করে, তাহার বংশধর সরদার ও তেলিগাতির হালদারগণ এখনও বর্ত্তমান। ধোপার বংশ নাই। কেহ কেহ বলেন, মহেশ্বর গুরুদেবকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। তিনি পরিণত বয়সে একবার কাশীধামে গিয়াছিলেন, সেখানে মণিকর্ণিকার ঘাটে রামগোবিন্দ আগমবাগীশের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া এখানে লইয়া আসেন এবং নিজ বাটীর সন্নিকটেই তাহার বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেন।

চণ্ডীদাস গুহ রায় নামক হুগলী জেলাস্থ মহানদের নিকটবর্ত্তী বরাট গ্রামের জনৈক কায়স্থ সন্তান চাচঁড়া-রাজ-সরকারে আমীনের কার্য্য করিতেন। মহেশ্বরপাশার আবাদ উঠিয়া গেলে জরিপের জন্য মহেশ্বর চণ্ডীদাসকে এখানে লইয়া আসেন এবং তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া পূর্ব্বপাড়ায় তাঁহাদের বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই চণ্ডীদাসই মহেশ্বরপাশার প্রসিদ্ধ গুহ মজুমদার বংশের আদি।

মহেশ্বর ঘোষ এবং তাঁহার বংশধরগণ এখানকার বহু বংশের আশ্রয়দাতা, মজুমদার বংশও অনেক কুলীনকে আশ্রয় দিয়াছেন।

এখানে এক আদি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ রায়বংশ ছিলেন। তাঁহারা জমিদার ছিলেন বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তির কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহারা মহেশ্বর ঘোষের কত পরে এখানে আসেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাঁহারা এখানকার প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় এবং মুন্‌সী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সে রায় বংশে এখন কেহ নাই, অথবা তাঁহাদের জমিদারীও নাই। বর্ত্তমানে কয়েক ঘর রায় আছেন তাঁহারা জমিদার রায়ের বংশধর বলিয়া দাবী করেন,

কিন্তু জমিদার রায় বংশের চৌধুরী খেতাব ছিল বলিয়া প্রকাশ। যাহা হউক, মহেশ্বর পাশার বসতি ক্রমে এইভাবে বিস্তার লাভ করে।

মহেশ্বর ঘোষের তৎকালীন মহেশ্বরপাশার কতকাংশ দৌলতপুর ইউনিয়ানভুক্ত হইয়াছে। মহেশ্বরপাশা ইউনিয়নে নগর, মধ্যডাঙ্গা, কার্ত্তিকের কূল, বুঁজিতলা, তেলিগাতি, যাব্দিপুর, থানাবাড়ী, ফুলবাড়ী, মীরের ডাঙ্গা প্রভৃতি মুসলমান পল্লী এবং কয়েক ঘর কায়স্থের বসতিযুক্ত যোগীপল্লী গ্রাম অবস্থিত। বলা বাহুল্য এ সমস্তই মহেশ্বর ঘোষের চিহ্নিত মহেশ্বরপাশার অন্তর্গত। মহেশ্বর পাশার সমগ্র ইউনিয়ানের পরিমাণ ফল ৩১৬৫ একার বা ৫'৪১ বর্গ মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা পুরুষ ৩৪৪২ এবং স্ত্রী ৩৪৩৪ মোট ৬৮৭৬। মহেশ্বর পাশা মৌজা, নিজ মহেশ্বর পাশা, বুঁজিতলা, কার্ত্তিকেরকূল এবং মধ্যডাঙ্গা লইয়া গঠিত। ইহার পরিমাণ ফল ২৮৬৫ একর বা ২'৫৫ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা পুরুষ ২২৩২ এবং স্ত্রী ২২৫৯ মোট ৪৪৯১। মহেশ্বর পাশায় প্রায় দেড় শত ঘর ব্রাহ্মণ এবং দুইশত ঘর কায়স্থ ও আড়াই শত ঘর বারুজীবির বাস।

বর্ত্তমান মহেশ্বরপাশা হাজি মহম্মদ মহশীনের জমিদারীভুক্ত, ইহাকে মহান ওয়াকফ্ চারিআনি বলে। ইহার এজেণ্ট খুলনার কালেক্টার বাহাদুর।

মহেশ্বর পাশার অধিবাসী অনেকেই চাঁচড়ার রাজ প্রদত্ত নিষ্কর ভোগ করিতেছেন। চাঁচড়ার রাজা হইতে এই গ্রাম কেমন করিয়া মহম্মদ মহশীনের জমিদারীভুক্ত হয় তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আগামুতাহর নামক পারস্যের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাদশাহের প্রিয় সভাসদ হন। মুতাহর সম্রাটের নিকট হইতে কিছু জাইগীর প্রাপ্ত হন এবং হুগলীতে যাইয়া বাস করেন। মন্নুজান খানম্ নামে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার একমাত্র কন্যা হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্যার নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া যান। এদিকে

তাঁহার স্ত্রী হুগলীর এক ধনী ব্যবসায়ীকে পুনরায় বিবাহ করেন। এই ব্যবসায়ীর ঔরসে মন্নুজানের মাতার গর্ভে দানবীর মহাত্মা মহম্মদ মহ্‌শীনের জন্ম হয়। মন্নুজান এবং মহশীন উভয়ে পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ীর বাড়ীতে প্রতিপালিত হন।

মীর্জা সালাহ্‌উদ্দীন নামক একব্যক্তি হুগলীর সহকারী-ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার সহিত যথাকালে পরমা রূপবতী মন্নুজানের বিবাহ হয়। সালাহ্‌উদ্দীনও বাদসাহ হইতে কলিকাতার নিকটে বহু জায়গীর পান। ইং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে মীরজাফর বাঙ্গলার নবাব হইলে খিদিরপুরে জাহাজঘাটা নির্ম্মাণের জন্য তিনি ইংরাজকে বহু জমী জমা দিতে বাধ্য হন। এই জমীর মধ্যে সালাহ্‌উদ্দীনের জায়গীর ছিল। এই জায়গীরের পরিবর্ত্তে নবাব তাঁহাকে কিছু জমীদারী দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সময়ে নবাবের পক্ষে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। চাঁচ্‌ড়ার চারি আনা অংশের মালিক রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের পুত্র রামগোপাল নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে নবাব তাঁহার প্রয়োজনানুযায়ী এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সালাহ্‌উদ্দীনকে দেন। এই সময়ে মহেশ্বরপাশা সালাহ্‌উদ্দীনের শাসনাধীন হয়, কিন্তু তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন, সুতরাং পিতার এবং স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিই মন্নুজানের হাতে গিয়া পৌঁছিল।

কিন্তু সম্পত্তির লোভ মন্নুজানের কিছুমাত্র ছিল না। তিনি অনেক সময় ভাবিতেন এই বিপুল সম্পত্তি দিয়া কি করিবেন, তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতা মহম্মদ মহ্‌শীন রাজধানী মুরশিদাবাদে বিদ্যাশিক্ষায় এবং ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনাতিপাত করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হন। নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ভগিনীর অনুরোধে বৃদ্ধবয়সে দেশে ফিরিয়া আসিলে, মন্নুজান ইং ১৮০৩ সালে সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতাকে লিখিয়া দিয়া দেহত্যাগ করেন। কিন্তু মহম্মদ মহ্‌শীন আজীবন অকৃতদার,

সংসারে আসক্তিহীন সন্ন্যাসী, তিনি এ সম্পত্তি দিয়া কি করিবেন? সুতরাং ইহার ৩ বৎসর পরে ইং ১৮০৬ সালে আরবী ভাষায় লিখিত এক দানপত্র দ্বারা সমস্ত সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া ইহার ৬ বৎসর পরে নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাকেই মহাল ওয়াকফ্ চারি আনি বলে এবং খুলনার কালেক্টার বাহাদুর ইহার তত্ত্বাবধারক, ইহার বার্ষিক আয় প্রায় ২ লক্ষ। ৬০ হাজার টাকা হুগলীর ইমামবারার ধর্ম্মকার্য্য ও উৎসবাদিতে খরচ হয়। সম্পত্তির মুনাফার উদ্বৃত্ত টাকা চিকিৎসা এবং মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবার কথা। অনেক স্কুল কলেজে এই আয় হইতে সাহায্য করা হয়। দৌলতপুর স্কুল এবং ডাক্তারখানা সৈদপুর ষ্টেটেরই প্রতিষ্ঠিত, কেবলমাত্র দৌলতপুরের ডাক্তারের বেতন গবর্ণমেণ্ট দিয়া থাকেন।

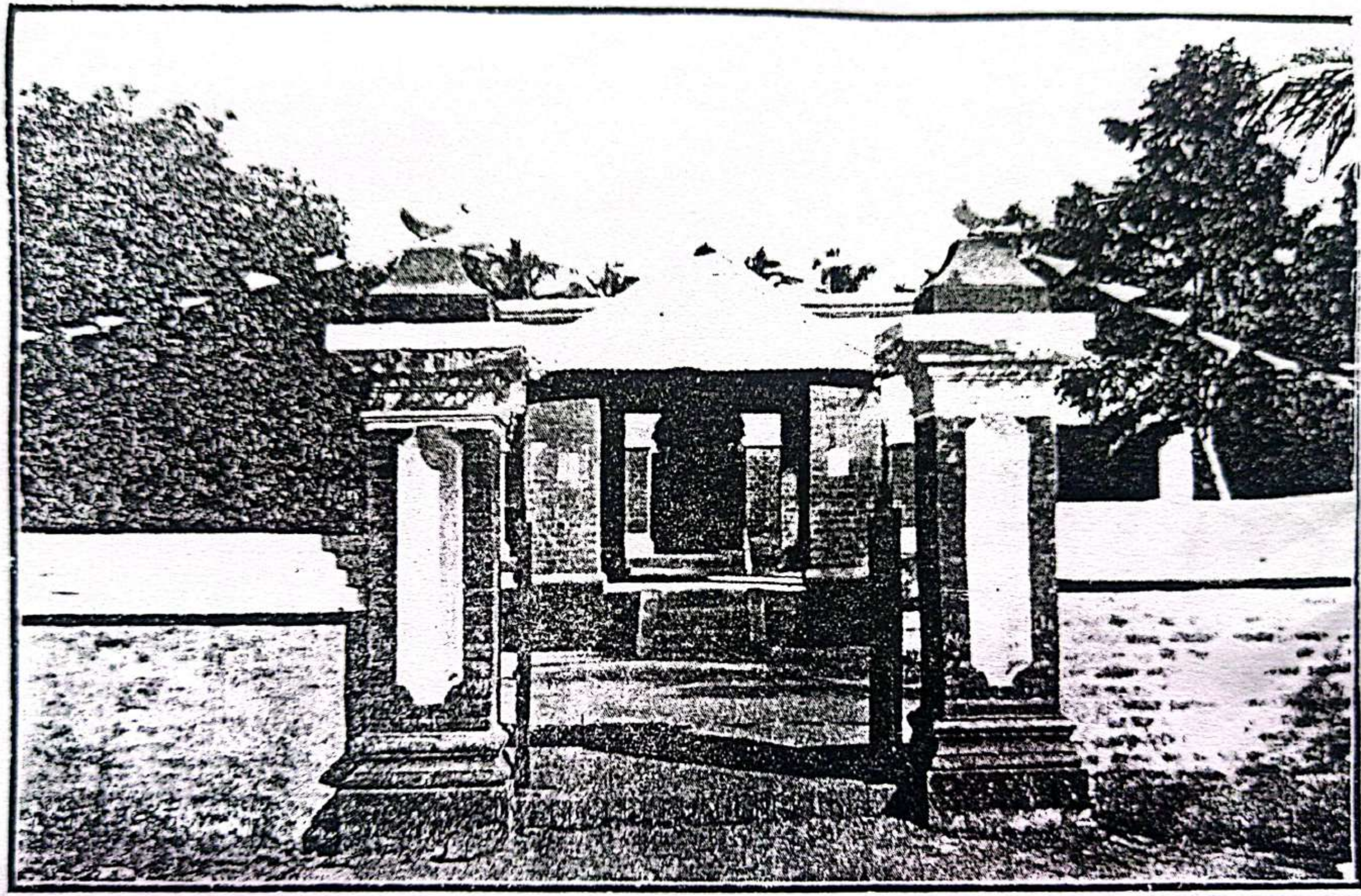
৺কালীবাড়ী।*

এই গ্রামের পুরাতন ৺কালীবাড়ীর ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। এই মূর্ত্তি কতকালের এবং কোন্ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাহা কেহই বলিতে পারেন না, কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহা কি মূর্ত্তি সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে, কারণ এই মূর্ত্তি অনেকের গবেষণার বিষয় হইয়াছে।

এই মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা; একখানি বসন দ্বারা ইহার কটীদেশ আবৃত; কটীদেশে মৃৎহস্তের কাঞ্চীও শোভা পাইতেছে। কর্ণে কুণ্ডল,

---

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।



পুরাতন ৺কালীবাড়ী। [পৃষ্ঠা ১০

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য)

CamScanner

ললাটে, মুকুটের নিম্নদেশে মালার ন্যায় অস্পষ্টভাবে একটা মোটা দাড়া দেখা যায়। গলে মুণ্ডমালা, বক্ষস্থলে দুই স্তনের মধ্যস্থানে পদকযুক্ত হার —সূত্রনির্ম্মিত বলিয়াই মনে হয়। বাম হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও মুণ্ড, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়, মায়ের পদতলে মহাকাল বা শবরূপী শিব পূর্ব্বশির হইয়া শয়ান আছেন। মায়ের বামপদ মহাকালের বক্ষস্থলে এবং দক্ষিণপদ উরুদেশে অবস্থিত। দক্ষিণ পদের নিম্নেই একটী সিংহ মস্তক জীর্ণাবস্থায় অদ্যাপি বিদ্যমান দেখা যায়, পশ্চাৎ দিকে উহার দেহও আছে বলিয়া প্রকাশ।

এ মূর্ত্তি কি? শিবের পূর্ব্বশির ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র শিবকে প্রায়ই দক্ষিণ অথবা পশ্চিমশির দেখা যায়, ইহাই দক্ষিণাকালী। কিন্তু কালীবাড়ীর এ মূর্ত্তিকে কেহ কেহ দক্ষিণাকালী বলেন।

এ দেশে কোন দেবীরই ধ্যান অনুযায়ী মূর্ত্তি হইতে প্রায়ই দেখা যায় না, সুতরাং ধ্যান দেখিয়া মূর্ত্তি বিচার করা আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব, বিশেষতঃ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উচিতও নহে, কোন বিশেষজ্ঞ তান্ত্রিক পণ্ডিতের উপর এই ভার ন্যস্ত হইলে ভাল হইত।

করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং॥ ইত্যাদি

ধ্যানে সাধারণতঃ দক্ষিণাকালীর পূজা হইয়া থাকে। এই ধ্যানের দেবী দিগম্বরী বা নগ্না, অথচ আমাদের মায়ের পরিধানে বস্ত্র আছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন ইহা বহুকালের মূর্ত্তি, পূর্ব্বে হয়ত নগ্না ছিলেন, বহুবার মায়ের অঙ্গরাগ হইয়াছে, এইরূপ কোন অঙ্গরাগের সময় তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক যদি তিনি পূর্ব্বে দক্ষিণাকালীর ধ্যানের অনুরূপ নগ্না থাকেন, তবে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাকে

কাপড় পরাইয়া ধ্যানের বিপরীত কার্য্য করিবার দুঃসাহস কাহার হইতে পারে, ইহাও এচিন্তার বিষয়। এই ধ্যানের দেবীর কর্ণে শবযুগ্ম কিন্তু মায়ের কর্ণে কুণ্ডল। দক্ষিণাকালীর ধ্যানে মহাদেব কোন্ শিয়রে আছেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত দক্ষিণাকালীর মহাদেব দক্ষিণ অথবা পশ্চিম শিয়রে শয়ান। দক্ষিণা-কালীর দক্ষিণ পদ শবের বক্ষে স্থিত থাকে, কিন্তু এখানকার শিব পূর্ব্বশিয়রে এবং কালীর বামপদ তাঁহার বক্ষপরি স্থাপিত। "সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্", দেবীর গালের দুই কষ বাহিয়া রক্তধারা বহিতেছে। এই দেবীর এরূপ কিছু দেখা যায় না, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, বিশ, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ ছিল। যাহা হৌক, বহুকালের মূর্ত্তিতে এ সমস্ত চিহ্নের উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। ধ্যানের অন্যান্য যে সমস্ত লক্ষণ আছে,তাহার কতকগুলি অধিকাংশ মূর্ত্তির সহিতই মিলিয়া যায়, আবার যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন কোন লক্ষণানুযায়ী মূর্ত্তি আদৌ গঠিত হয় না, যেমন এই ধ্যানেই—"মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং।"*

মায়ের দক্ষিণ পদের নিম্নদেশে সিংহ মূর্ত্তির কোনরূপ আভাস দক্ষিণাকালীর ধ্যানে নাই। দক্ষিণাকালীর অন্যান্য যে কয়েকটী ধ্যান আছে, তাহাও প্রায় একার্থবোধক, সেগুলির উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

ইনি দক্ষিণাকালী নহেন বলিয়া এবং ভৈরবে বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ পরিধানে (ব্যাঘ্রচর্ম্ম ভ্রমে) বস্ত্র দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা তারামূর্ত্তি, কিন্তু সেরূপ অনুমানের কোন হেতু নাই, কারণ তাহার

* হাতে-লেখা তালপাতার পুঁথিতে "মহাকালে ন চ সমং উপবিষ্টাং রতাতুরাং" এই পাঠান্তর দেখিয়াছি—গ্রন্থকার।



পুরাতন ৺কালী মূর্ত্তি।

[পৃষ্ঠা ১০।

ধ্যানের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। সুতরাং ইনি তারামূর্ত্তি নহেন; দক্ষিণাকালী কিনা—পূর্ব্বেই যেরূপ বলিয়াছি—সে বিচার পণ্ডিতগণের উপর দিয়া আমরা এস্থলে আর একটি ধ্যানের উল্লেখ করিব, ইহা বিশ্বসার তন্ত্রোক্ত মহাকালীর ধ্যান, যথা---

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা বিভূষণা।
খড়্গঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ং॥
কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতী।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসা স্বয়ং॥
মুণ্ডমালাধরাশীর্ষে গ্রীবায়ামথচাপরাং।
বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা॥
কৃষ্ণবস্ত্রধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিন সমন্বিতা।
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদং॥
বিলাপ্য সিংহপৃষ্ঠেতু লেলিহানাসবং স্বয়ং।
সাট্টহাসা মহাঘোররাবযুক্তা সুভীষণা॥”

অর্থাৎ দেবী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা ও মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও নীলোৎপলদ্বয় এবং তিনি বামহস্তে কাটারি ও খর্পর ধারণ করিয়াছেন, দেবীর মস্তকে একটী ঊর্দ্ধমুখী জটা আছে, মস্তকে ও গলদেশে মুণ্ডমালা ও বক্ষস্থলে নাগহার, চক্ষু রক্তবর্ণ, ইনি কটিদেশে কৃষ্ণবস্ত্র ও ব্যাঘ্রাজিন ধারণ করিয়া শবরূপ শিবের উপর বাম পদ এবং সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণ পদ রাখিয়াছেন। ইনি স্বয়ং আসবপানে আসক্তা, অট্টহাস্যযুক্তা, ভয়ঙ্কর শব্দযুক্তা ও ভীষণাকৃতি।

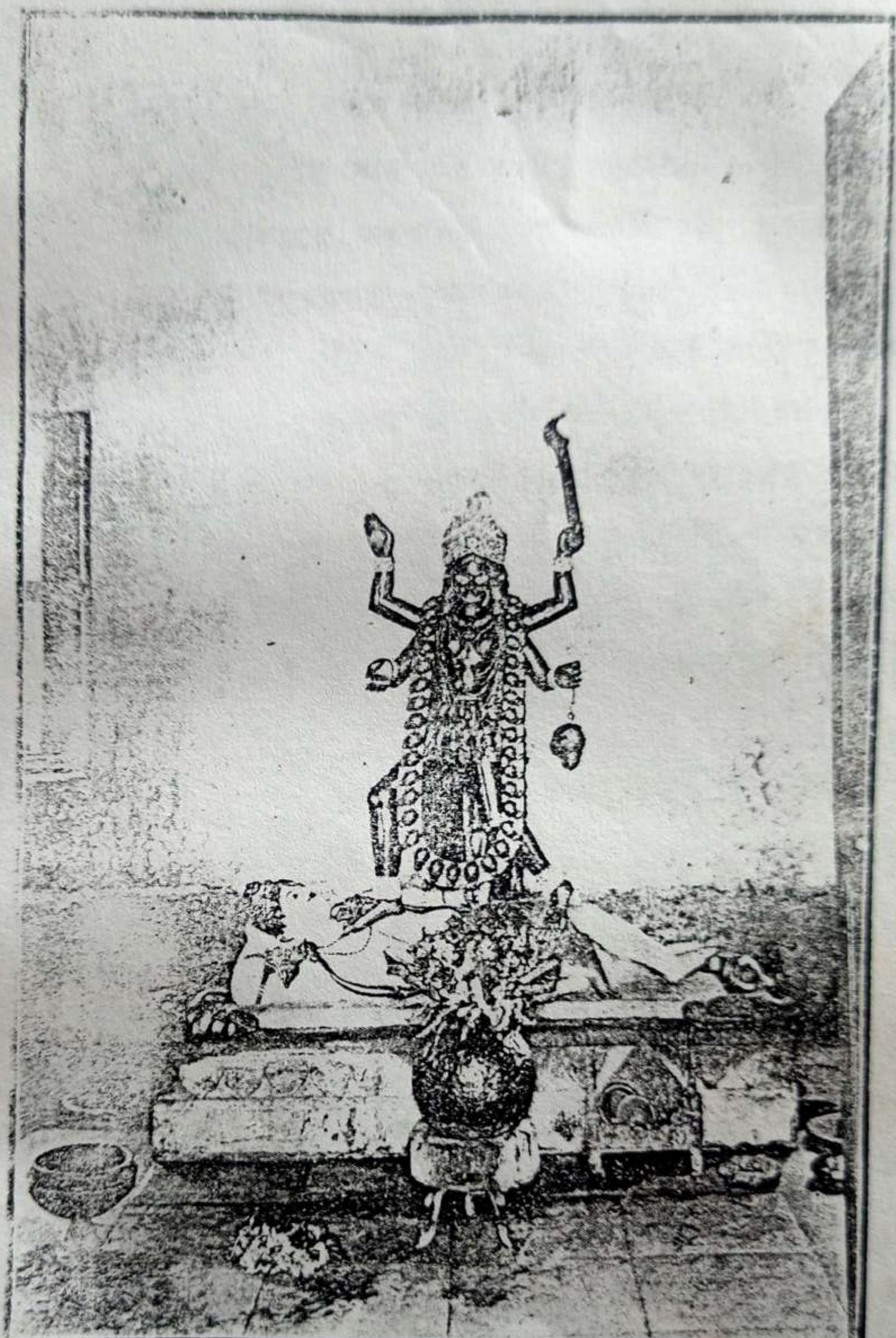
এস্থলে দেবীর হস্ত চতুষ্টয়ের সহিত ধ্যানের মিল হয় না, অন্যান্য সকল স্থানেই বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। এই ধ্যান অনুসারে দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও নীলোৎপলদ্বয় হইবে কিন্তু আমাদের দেবীতে বরাভয় আছে, বামহস্তদ্বয়ে

কর্ত্রী (কাটারি) ও খর্পর হইবে। আমাদের মায়ের উপরের হাতে কর্ত্রী আছে কিন্তু নীচের হাতে খর্পরের পরিবর্ত্তে একটী নরমুণ্ড ঝুলিতেছে। এই সামান্য অসামঞ্জস্যেরও কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। দৈবদুর্ব্বিপাকে, ছাদ এবং গৃহ পড়িয়া কয়েকবার দেবীর অঙ্গহানি হইয়াছে, সে কথা পরে বলিব। এইরূপ অঙ্গহানিতে এই সামান্য অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে। ইঁহার মস্তকের পশ্চাদ্দিকে অঙ্গুলী প্রমাণ জটার কথা ৺কালী বাড়ীর পুরোহিত ঠাকুর বলিয়াছেন। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ বিষয়ে তদন্ত যখন ব্রাহ্মণেতর জাতির করিবার অধিকার নাই, তখন তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিতে হইবে। ইঁহার মস্তকে এবং গলদেশে মুণ্ডমালা, গলদেশে মুণ্ডমালা সকলেরই দৃশ্যরূপে শোভিতেছে। মস্তকে মুকুটের নিম্নে যাহা আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কড়ির ন্যায় চিহ্ন বিশিষ্ট একটী বেড় দেখা যায়। বক্ষে নাগহার; পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবীর বক্ষে সূত্রহারের ন্যায় দৃষ্ট হয়, উহার নিম্নদেশে পদকচিহ্ন। নাগহার অর্থ কি তাহাই দেখা যাউক। এস্থলে নাগহার অর্থ সর্পের হার নহে। কিন্তু নাগহারের অন্য অর্থ আছে, তাহাই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। অষ্টোত্তর সহস্র গ্রন্থিযুক্ত ও অষ্টোত্তর সহস্র খেরো সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত যে পবিত্র, তাহাকে নাগহার বলে।*

দেবীর পরিধানে বস্ত্র আছে, কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণ হইবে। বহুবার ভঙ্গরাগের পূর্ব্বে কৃষ্ণবস্ত্র এবং ব্যাঘ্রাজিন ছিল কিনা, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

---

* ইহার প্রমাণ কালিকা পুরাণে যথা—অষ্টোত্তর সহস্রন্তু রত্নমালেতি গীয়তে। পবিত্রন্তু মহাদেব্যা ভক্তিমুক্তি প্রদায়কম॥ রত্নমালাস্তু যো দদ্যাৎ মহাদেব্যৈ প্রকীর্ত্তিতম্। কল্পকোটী সহস্রাণি স্বর্গে স্থিত্বা শিবোভবেৎ॥ এতন্তু নাগহারাখ্যং শঙ্করস্য প্রকীর্ত্তিতম্। অষ্টোত্তর সহস্রেণ তন্তনাং সুমনোহরম্॥ যৎ প্রযচ্ছতি মহ্যং তৎ স যাবৎ তন্তুসঞ্চয়াঃ। তাবৎ কল্প সহস্রাণি মমলোকে প্রমোদতে॥



রায় সাহেব বঙ্কিম চন্দ্র মজুমদার প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রী৺আনন্দময়ীর পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তী।
(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

মহাদেব কোন্ শিয়রে শয়ান তাহা ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু মহাকালীর বাম পদ শিবের বক্ষস্থলে স্থাপিত থাকার জন্য মহাদেবের পূর্ব্বশিয়রে অবস্থানই সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ পদের নিম্নে সেই জীর্ণ সিংহমস্তক, যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই ধ্যানের সহিত কালীমূর্ত্তির বহুবিষয়ে সামঞ্জস্য দেখা যায়। সুতরাং আমাদের মতে ইহা মহাকালী মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।

সাধক বা পূজারীর আসন পঞ্চমুণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পরে বলিব। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, দেবী কোন সাধারণ মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন নাই, কোন সন্ন্যাসী বা তান্ত্রিকপ্রবর ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং ইহা সিদ্ধ পীঠ এবং ইনি জাগ্রত দেবতা।

এইরূপ প্রবাদ, এই কালী শ্মশানে প্রতিষ্ঠিতা। মহেশ্বর ঘোষের আগমনের বহুপূর্ব্বে, এদেশ যখন সুন্দরবন নামে অভিহিত ছিল, তখন ভৈরবেরই একটী শাখানদী [illegible] বড় রাস্তার দক্ষিণে সমান্তরাল হইয়া আসিয়া সাড়াডাঙ্গীর মাঠ দিয়া পশ্চিম [illegible] তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। কালীবাড়ী হইতে এই নদী কয়েক শত হাত মাত্র ব্যবধান ছিল। কালীবাড়ীর দক্ষিণে শ্মশান ছিল, এরূপ কিম্বদন্তী সেবাইত বংশের মধ্যে প্রচলিত। যাহা বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

সুন্দরবনের মধ্যে কোন তান্ত্রিক বা কাপালিক কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি বহু বর্ষ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ প্রবাদ এখনও বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায়। যশোহর এবং নদীয়া অঞ্চল বসতিস্থান হইলে বহুলোক এখানে কাঠ কাটিতে আসিয়া এই কালীবাড়ী পূজা দিত এবং তখন এখানে নরবলি হইত, এইরূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। প্রতিষ্ঠাতার পরে মহেশ্বর ঘোষের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালীমাতার সেবা কি ভাবে হইত, তাহার কোন

নিদর্শন পাওয়া যায় না, ফলতঃ মহেশ্বর ঘোষের সময় জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে এই কালী মূর্ত্তির কথা চাঁচ্ড়া রাজদরবারে পৌঁছে, এবং সেখান হইতে সেই সময়ে ইহার সেবার বন্দোবস্ত হয়। সম্ভবতঃ কামদেব চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে কালী মাতার সেবার জন্য চাঁচ্ড়া হইতে এখানে প্রেরণ করা হয়। সে বাংলা ১০০০ সনের নিকটবর্ত্তী সময় অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর হইবে। কামদেবের বংশধরগণ এখনও ইহার সেবা করিয়া আসিতেছেন। কামদেবের পুত্র জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী চাঁচ্ড়ার রাজা মনোহর রায়ের প্রদত্ত তায়দাদের গ্রহীতা।

৺কালীবাড়ীর উপর চাঁচ্ড়া রাজবংশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তাঁহারা প্রথমে একখানি খড়ের ঘর করিয়া দেন, কিছুদিন পরে ঝড়ে মন্দির পড়িয়া যায় এবং ইহাতে মায়ের অঙ্গ হানি হয়, এই সময়ে মুড়লী কাছারীতে শ্যামরাম বসু নামক জনৈক ভদ্রলোক নায়েব ছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় [illegible] হইতে কিছু সাহায্য মঞ্জুর হয় এবং জনার্দ্দনের অন্যতম পৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া মায়ের জন্য পুনরায় ঘর করেন। শ্যামরামের পরে রাজারাম বসু নায়েব হইলে, তাঁহার চেষ্টায় প্রাচীর এবং খড়ের চালাযুক্ত একটী নাটমন্দির প্রস্তুত হয়, এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। ইহার পর মহেশ্বরপাশা হুগ্লীর মীর্জা সালাহ্উদ্দীনের জমিদারী ভুক্ত হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সালাহ্-উদ্দীন হুগ্লীর সহকারী ফৌজদার—মহম্মদ মহ্শীনের ভগিনী মন্নুজানের স্বামী। মুন্সী বংশের এখানকার আদি পুরুষ কৃষ্ণকিঙ্কর মুন্সী মীর্জা সাহেবের তরফে দেওয়ান হইয়া মুড়লী কাছারীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

পূর্ব্বে মায়ের নৈবেদ্যর ভোগ হইত, কিন্তু এই সময়ে কৃষ্ণকিঙ্কর অন্নের ভোগ দিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন। সেই অনুসারে তিনি দশ মুদাফত হইতে দশ বিঘা জমি সরকার হইতে বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এই সঙ্গে মাকে কিছু অলঙ্কারও দেওয়া হয়।* ইহার পর ঘর পড়িয়া পুনরায় মায়ের অঙ্গহানি হয়, এইরূপ অঙ্গহানি দেখিয়া কৃষ্ণকিঙ্কর এই মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া ইহার স্থানে এক নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে বাড়ীতে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু পুনরায় তাঁহার স্বপ্নাদেশ হয়—"তুমি যে মূর্ত্তি গড়িয়াছ, তাহা পূজা অন্তে বিসর্জ্জন দাও, আমার ভগ্ন অঙ্গ সারিয়া দাও" সুতরাং কৃষ্ণকিঙ্কর সেইরূপ করিতে বাধ্য হইলেন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণকিঙ্করের চেষ্টাতেই এই সময়ে মায়ের ছাদযুক্ত পাকা কোঠা প্রস্তুত হয়।

সালাহ্ উদ্দীনের মৃত্যুর পরে মহেশ্বরপাশা মহম্মদ মহ্শীনের জমিদারী ভুক্ত হয়, সেই সঙ্গেই দেওয়ান কৃষ্ণকিঙ্কর মুনসীরও কার্য্যকাল শেষ হয়। নূতন সরকার ৺কালীর বৃত্তির জমির ফসলও ক্রোক করিয়া লয়েন। তখন রেল ষ্টীমার কিছুই ছিল না, কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বৃদ্ধ বয়সে নৌকাযোগে বহু কষ্টে হুগ্‌লী যাইয়া দরখাস্ত করিয়া এই সমস্ত উদ্ধার করেন, ফলতঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ৺কালীবাড়ীর জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়, পরিশ্রম এবং আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভূত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং কালীবাড়ী সংক্রান্ত বহুব্যাপারে তাঁহার একাধিপত্য ছিল। এই সময়েরও দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সন ১০৫০ সালের নিকটবর্ত্তী সময়ে ৺কালীবাড়ীর হাট প্রতিষ্ঠিত এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই অবধি এই হাট প্রতি সোম, বুধ এবং শুক্রবারে নিয়মিত বসিতেছে। যাহা হউক সেই সময়ে হাটের মালিক ৺কালীবাড়ীর পুরোহিত বংশ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হাট মাঝে মাঝে মুনসীদিগকে ইজারা দেওয়া হইত এবং তাহাদের কোন ত্রুটী হইলেই পুনরায় ছাড়াইয়া লইতেন। কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনে এইরূপ বহুবার ঘটিয়াছে।

---

* ইহা পরে চোরে লইয়া যায়। কথিত আছে, চোর অলঙ্কার লইতে গেলে দেবী তাহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া নিজেই স্বীয় অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দেন।

সন ১১৯৬ সালের কার্ত্তিক মাসে পুনরায় কোঠার ছাদ ভাঙ্গিয়া যায় এবং মায়ের অঙ্গহানি হয়, এবারও কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁহার বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ছাদ মেরামত করিয়া দেন, কিন্তু মায়ের ভগ্ন অঙ্গ সারিতে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন।

সে সময়ে রায়বংশ অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন, এই বংশের রাম সন্তোষ এবং খেলারাম কালীমূর্ত্তি তাহাদের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন এবং সেজন্য কৃষ্ণপ্রসাদকে মূর্ত্তি মেরামত করিতে দেন নাই। কৃষ্ণকিঙ্করের অন্যতম পুত্র চন্দ্রনারায়ণ মুন্সী অত্যন্ত চতুর মামলাবাজ লোক ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে রায়েদের সহিত যোগ দেন। ৺কালীবাড়ী লইয়া যশোহর-আদালতে উভয়পক্ষে মোকদ্দামা হয়, তাহাতে মুনসী এবং রায়দের দাবী না-মঞ্জুর হইয়া যায়, সন ১২০০ সালে এই মামলার রায় বাহির হয়।

ইহার পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত ৺কালীবাড়ীর আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ পূর্ব্ব ছাদ পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায় এবং পাকা দেওয়ালের উপর খড়ের চাল দেওয়া হয়।

মহেশ্বরপাশার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতা ৺বংশীবদন চক্রবর্ত্তী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি অনেক সময় ৺কালীবাড়ীতে তান্ত্রিক কার্য্যকলাপে রত থাকিতেন। তিনি বলিতেন, এখানে সিদ্ধ হওয়া কৃচ্ছ্র সাধ্য। মশা, পিপ্‌ড়ে এবং ডে'য়ে এই তিনটী ক্ষুদ্র জীব এমন উৎপাত আরম্ভ করে যে এখানে কিছুতেই বসা যায় না। তিনি আরও বলিতেন ইহা পঞ্চমুণ্ডের আসন, এখানে বীরাচার ব্যতীত ক্রিয়াকলাপ অসম্ভব।

অনুমান ১৩১০ সালে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার বহু অর্থব্যয়ে ৺কালীর পুরাতন জীর্ণ মন্দির ভাঙ্গিয়া সেস্থলে নূতন মন্দির করিয়া দেন। মন্দিরের মেঝে খুঁড়িবার সময় পূজারির আসনের নিম্নে

ন্তুটী সরা দিয়া ঢাকা একটী নরমুণ্ড পাওয়া যায়, ইহাতেই বংশীবদনের কথা সকলের প্রত্যয় হয়।

যাহা হউক কালীমন্দির নির্ম্মিত হইলে রায়সাহেব পুরাতন মূর্ত্তিস্থলে নূতন পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক হইলে ৺জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রজনীকান্ত ন্যায়রত্ন প্রভৃতি গ্রামের তদানীন্তন সমাজপতিগণ তাঁহার এই সাধুসঙ্কল্পে সম্মতিপ্রদান করেন। এজন্য গ্রামের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক লইয়া একটী সভা হয়। ঘাটভোগের সর্ব্ববিদ্যা বংশীয় ৺কৈলাসচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিও ইহাতে মত দেন, কিন্তু তদানীন্তন সেবাইত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে এই অনুষ্ঠানে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। যাহা হউক এই সভার মন্তব্য অনুসারে ৺কাশীধামে বহু অর্থব্যয়ে এক প্রসিদ্ধ ভাস্কর কর্তৃক ৺কালীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি গঠিত হয়, কিন্তু পুরাতন মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে কেহই স্বীকৃত হইলেন না। এই সময়ে রায়সাহেবের পরিবারে নানাবিধ অমঙ্গলের সূচনা দেখা যাইতে লাগিল, তিনি হস্তী হইতে পতিত হইয়া আহত হইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হন। জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যাহারা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, তাঁহারা এক এক করিয়া দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং নূতন মূর্ত্তি এস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইল না, রায়সাহেব বাধ্য হইয়া তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণে, বড় রাস্তার উত্তরে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ১৩১২ সালের কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে, ৺কাশী, দ্রাবিড়, মিথিলা, নবদ্বীপ ইত্যাদি ভারতের নানাপ্রদেশের বহু পণ্ডিতের সাহায্যে যথেষ্ট অর্থব্যয়ে ৺আনন্দময়ী নামে পাষাণময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রায় ২৫ বৎসর পরে পুরাতন ৺কালী মন্দির সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করা যায়। এই সময়ে ১৩৩৫ সালের প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত

শিবনাথ কাব্যতর্কতীর্থ প্রমুখ কতিপয় উৎসাহী যুবক মহেশ্বরপাশার অধিবাসীবৃন্দের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন, এজন্য গ্রাম হইতে প্রায় এক সহস্র মুদ্রা আদায় হয়। অনেক বিদেশী ভদ্রলোক এবং দৌলতপুরের ব্যবসায়ীগণও স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়াছেন। এই অর্থ ব্যয়ে ৺কালীবাড়ী আজ নূতন মূর্ত্তি ধারন করিয়াছে। এই কার্য্যে শ্রীযুক্ত হেমদাকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। শোলগাতিনিবাসী শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র কর যিনি বর্ত্তমানে মহেশ্বরপাশায় বাড়ী করিয়াছেন, পাঁচশতাধিক মুদ্রাব্যয়ে প্রাচীর করিয়া দিয়া সমগ্র গ্রামবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। *

---

* সেবাইত বংশে প্রাপ্ত কয়েকখানি পুরাতন দলিল দৃষ্টে ৺কালীবাড়ীর ইতিহাস লিখিত হইল——গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বংশ পরিচয়।

মহেশ্বর ঘোষের বংশ।

ঘোষ বংশের বীজ পুরুষ মকরন্দ ঘোষ হইতে মহেশ্বর ১৫শ পর্য্যায়। মহেশ্বরের কন্যাকে চণ্ডীদাস গুহ বিবাহ করিয়া এখানেই বাস করেন, মহেশ্বরের পুত্র নীলকমল। নীলকমলের পৌত্র রামসুন্দর ঘোষের দুই পুত্র রামগোপাল, রাজেন্দ্র। রামগোপালের তিন পুত্র—রামরাম, নন্দরাম, কৃষ্ণরাম। রামরামের দুই পুত্র, সাতুলাল এবং রামকিঙ্কর, সাতুলালের পুত্র গোলোকচন্দ্র তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যশোহরে ওকালতী করিতেন। পশ্চিম পাড়ার বিলের ধারে তাঁহার এক নীলকুঠি ছিল, এখনও কুঠির ঘাট বর্ত্তমান। গোলোকচন্দ্রের বংশ নাই। রামরামের অন্যতর পুত্র রামকিঙ্করের পুত্র কনকচন্দ্র। কনকচন্দ্রের তিন পুত্র, রাম, লক্ষণ এবং ভরত।

রাম এবং লক্ষণের পুত্রসন্তান নাই। রামের তিন কন্যা; লক্ষণের কন্যা শিশিরকুমারীকে সেনহাটী গ্রামের চন্দ্রকান্ত দত্ত বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। তাহার দুই পুত্র ধীরেন্দ্র এবং রমেশ বর্ত্তমান। ভরতের চারি পুত্র—রাজেন্দ্র, সুরেন্দ্র, খগেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র। প্রথমোক্ত দুই জন রেলবিভাগে কাজ করিতেছেন।

রামগোপালের মধ্যম পুত্র নন্দরামের দুই পুত্র—কাশীনাথ, গোবিন্দপ্রসাদ। কাশীনাথের চারি পুত্রের মধ্যে তিন জন নিঃসন্তান; অন্য পুত্র শম্ভুচন্দ্রের দুই পুত্র, পার্ব্বতী ও মধুসূদন; পার্ব্বতী নিঃসন্তান।

CamScanner

মধুসূদনের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

গোবিন্দপ্রসাদের চারি পুত্রের মধ্যে তিন জন নিঃসন্তান। কনিষ্ঠ শিবচন্দ্রেরও পুত্রসন্তান নাই। কন্যা মুক্তকেশীকে রামচাঁদ আদিত্য বিবাহ করেন। রামচাঁদের দুই পুত্র রজনীকান্ত এবং বরদাকান্ত। রজনীকান্তের দুই পুত্র ইন্দু ও প্রমথ রেলবিভাগে কাজ করেন। বরদাকান্তের এক পুত্র চন্দ্র বর্ত্তমান। বরদাকান্তের ভাগিনেয় খুলনা নলধা নিবাসী শশিভূষণ মিত্র মাতুলের আশ্রয়ে আসিয়া এখানে বাড়ী করিয়াছেন।

কৃষ্ণরামের দুই পুত্র বিনোদরাম এবং রামপ্রসাদ। বিনোদ রামের পুত্র রামজয়, তাহার পুত্র হারানন্দ; হারানন্দের দুই পুত্র উমেশ এবং হীরালাল; এখন দুই ভ্রাতার দুই পুত্র বর্ত্তমান।

রামপ্রসাদের দুই পুত্র, গোপী এবং গঙ্গাধর। গোপীর পুত্র সদাশিব। সদাশিবের দুই পুত্র মহেশ ও পার্ব্বতী। মহেশের দুই পুত্র চিরঞ্জীব ও প্রিয়। চিরঞ্জীব নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ করিয়াছিলেন; তিনি সাধক ছিলেন, সাধনার বলে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা বলিতে পারিতেন। নিজের মৃত্যু সময় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অতুল বাঁশগায় (যশোহরে) মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন; পার্ব্বতীর তিন পুত্র হৃদয়, চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে শেষোক্ত বর্ত্তমান। তিনি ই, বি, রেলে গার্ডের কাজ করিতেছেন। হৃদয় নাথের পুত্র বিনোদ বি, এ, পাশ করিয়া আইন পড়িতেছেন।

রামপ্রসাদের অন্যতর পুত্র গঙ্গাধরের পৌত্র দেবনাথের তিন পুত্র হরিচরণ, রামগোবিন্দ ও কালীবর। হরিচরণ নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ করিয়া বহুস্থলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত দৌলতপুর স্কুলে ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যবশতঃ

১১



শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র ঘোষ

[পৃষ্ঠা ২৩।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য)

কর্ম্মত্যাগ করেন। ১৩৩৩ সালের কার্ত্তিকমাসে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র নেপাল ও প্রমথ। নেপাল লাহোর এন্, ডব্লু রেলের সাবষ্টোরকিপার, বর্ত্তমানে ৩০০৲ টাকা বেতন পাইতেছেন।

রামগোবিন্দ এবং কালীবর অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। রামগোবিন্দের পুত্র সন্তান নাই, কালীবরের একমাত্র পুত্র জগন্নাথ ইং ১৯২৮ সালে বি, এ, পাশ করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের বংশধরগণ বসুমিত্র পাড়ায় মহেশ্বর ঘোষের সাবেক বাড়ীতে বাস করিতেছেন কিন্তু অন্যান্য সকলে পশ্চিম পাড়ায় আছেন।

পূর্ব্বোক্ত ১৮ পর্য্যায়ের রামসুন্দরের দুই পুত্র রামগোপাল এবং রাজেন্দ্র ঘোষ। রাজেন্দ্রের পুত্র রামদাস। রামদাসের ৩ পুত্র রামগোবিন্দ, রামরাম, যুগলকিশোর; শেষোক্তের বংশ নাই। রামগোবিন্দের পুত্র রামসন্তোষ। তাঁহার ৪ পুত্র রাধানাথ, কালী, রামচাঁদ ও জগমোহন। কালী ও জগমোহনের বংশ নাই। রাধানাথের পুত্র দ্বারিক। তাঁহার ৩ পুত্র কুঞ্জ, বঙ্ক, কৃষ্ণ। কৃষ্ণলাল, বহুদিন হইতে রেলবিভাগে চাকরী করিতেছেন। রামচাঁদের বংশে অঘোর, সুধীর বর্ত্তমান।

২৩ পর্য্যায়ে পদ্মলোচনের নাম পাওয়া যায় কিন্তু ইনি কাহার পুত্র কেহ বলিতে পারেন না। গৃহদাহে বংশাবলী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পদ্মলোচনের পুত্র নীলমণি, রাজচন্দ্র, দীননাথ। দীননাথের বংশ নাই। নীলমণির ৪ পুত্রের মধ্যে শ্যামের পুত্র বিজয় ও যদুর পুত্রগণ বর্ত্তমান। যদু রেলবিভাগে চাকরী করিতেন। তাঁহার দুই সংসার। সরজিৎ, হরষিত প্রভৃতি মাতুলালয় রাণাঘাটে বাস করেন। সুধীর ও যতীন মহেশ্বরপাশার বাড়ীতেই আছেন।

রামদাসের অন্যতম পুত্র রামরামের দুই পুত্র, বৃন্দাবন ও সভারাম। বৃন্দাবনের তিন পুত্র,গৌরমোহন, পঞ্চানন ও ভরত। শেষোক্ত দুজনের বংশ

নাই। ভরত খুলনায় উকিল ছিলেন। গৌরমোহনের দুই পুত্র তারক ও শশী। শশীর পুত্র সন্তান নাই। তিনি বর্ত্তমানে গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি। তারকের দুই পুত্র বসন্তকুমার ও অক্ষয়কুমার। বসন্ত কুমার ধীর, বিনয়ী ও সাধুচরিত্র। তিনি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া অনেক দিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। কিন্তু স্কুলের সামান্য আয়ে সংসার প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া রেলবিভাগে প্রবেশ করেন। তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রকুমার বি, এ, পাশ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের দুই পুত্রের মধ্যে অনিলকুমার বি, এস্‌সি, পাশ করিয়াছেন।

রামরামের অন্যতর পুত্র সভারামের দুই পুত্র রাজচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র। মহেশচন্দ্র নিঃসন্তান। রাজচন্দ্রের দুই পুত্র, চন্দ্র ও মথুর। মথুর নিঃসন্তান। চন্দ্রের পুত্র হৃদয় রেলবিভাগে চাকরী করিতেছেন। হৃদয়ের অজিত প্রভৃতি তিনপুত্র বর্ত্তমান।

আগমবাগীশের বংশ।

এই বংশ মহেশ্বর ঘোষের গুরুবংশ। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ফরিদ-পুরের অন্তর্গত হরিদাসপুর গ্রামে ছিল। রামগোবিন্দ আগমবাগীশ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই-তেন। এইরূপ কথিত আছে মহেশ্বর ঘোষ এখানে আসিবার পরে একবার ৺কাশীধামে যাইয়া রামগোবিন্দ আগমবাগীশকে দশাশ্বমেধঘাটে দেখিতে পান; ৺কাশীধামেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসেন এবং স্বীয় আবাস বাটীর নিকটে (অর্থাৎ বর্ত্তমান বসুমিত্র পাড়ায়) গুরুদেবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আগমবাগীশের অধস্তন



শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ।

পৃষ্ঠা ২৪

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বর পাশা পরিচয়ের" জন্য)

৯ম পুরুষ এইক্ষণে বর্ত্তমান, ইহাতে মনে হয় মহেশ্বর ঘোষ এখানে বসতি স্থাপন করিবার অনেক পরে অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে ৺কাশীধাম হইতে গুরুদেবকে লইয়া আসেন।

তন্ত্রশাস্ত্রকে আগম বলে. (শিব যে শাস্ত্রের বক্তা এবং পার্ব্বতী যাহার শ্রোত্রী ও বাসুদেব কর্তৃক যাহা অনুমোদিত তাহাই আগম)। আগম-শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করায় রামগোবিন্দ আগমবাগীশ হয়েন। কিন্তু তিনি কোথায় কোন্ সময় এই উপাধি প্রাপ্ত হন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি অনেক সময় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা চাঁচ্ড়ার রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে অষ্টপ্রহর ব্যাপী গীতাপাঠ হইতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন দেশে অনাবৃষ্টিহেতু শস্য উৎপন্ন হইতেছে না, দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, পানীয় জলের অভাবে যাবতীয় জীবজন্তুর প্রাণ কণ্ঠাগত, চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল চিহ্ন দেখা যাইতেছে। অবিলম্বে যাহাতে বর্ষণ হয় সেইজন্যই এইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। আগমবাগীশ বলিলেন, ইহাতে বর্ষণ হইবে না, বরুণযাগ করিতে হইবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পারিবেন? আগমবাগীশ উত্তর করিলেন—হাঁ, আমি পারিব, কিন্তু একটী কথা—মাঠের মধ্যে বসিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। যজ্ঞ করিতে করিতে এত বৃষ্টি নামিবে যে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। বর্ষণ হইতে হইতে জল যখন আমার বুক সমান হইবে, তখন আমাকে উঠাইয়া লইয়া আসিবেন। রাজা ইহাতে সম্মত হইলেন এবং বরুণযাগের সমস্ত আয়োজনের হুকুম করিয়া দিলেন। আগমবাগীশের বরুণযাগে ধরণী প্লাবিত হইল, সৃষ্টি রক্ষা পাইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আগমবাগীশকে ৫৬ বিঘা নিষ্কর জমি দান করিলেন।

আগমবাগীশ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। মীরেরডাঙ্গার মধ্যে ভৈরবকূলে

বটতলায় পূর্ব্বে যেখানে দারোগার হাট বসিত, আগমবাগীশ সেইখানে বসিয়া ৺কালী সাধনা করিতেন ; এখনও সেই ঘাটকে ৺কালীতলার ঘাট বলে।

আগমবাগীশের চারিপুত্র রঘুদেব,রামভদ্র, মহাদেব এবং কালীচরণ। রঘুদেবের বংশ (গ্রন্থকারের গুরুবংশ) বর্ত্তমান খুলনার অপর পার নৈহাটীগ্রামে বাস করিতেছেন। রামভদ্রের বংশ এখন বিলুপ্ত। মহাদেবের বংশীয়েরা পশ্চিম পাড়ায় চাটুয্যে বাবুদের বাড়ীর নিকটে বাস করিতেছেন। পরিতাপের বিষয়, এ বংশও এখন বিলুপ্ত প্রায়।

মহাদেব শ্মশানে ৺কালী সাধনা করিবার বহু চেষ্টা করেন কিন্তু সমর্থ হন নাই। তিনি সর্ব্বদাই নানারূপ বিভীষিকা দেখিতে পাইতেন কিন্তু তবুও তিনি নিরস্ত হইতেন না। একবার প্রত্যাদেশ হয়, "আমাকে এখন পাইবে না, ৭।৮ পুরুষ পরে দেখা দিব, এখন এ কঠোর সাধনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও"। মহাদেব এই প্রত্যাদেশে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পরদিন মধ্যরাত্রে একটী শব লইয়া তাহার পরে উপবেশন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু সময় পরে শ্মশান হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে কোন এক বিরাট পুরুষ যেন তাঁহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেই অবধি আর শব সাধনায় মনোযোগী হন নাই।

কালীচরণের পৌত্র গোপীনাথ। গোপীনাথের ৭ পুত্রের মধ্যে ৬ জন নিঃসন্তান। ঈশ্বরের দুই পুত্র কালীনাথ ও হরিনাথ। কালীনাথের দুই পুত্র হীরালাল ও রামলাল অকালে মৃত। হরিনাথের পুত্র বাণীকান্ত বর্ত্তমান।

মহেশ্বর ঘোষের পুরোহিত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তীর বংশ।

ইহাদের আদিবাস ভাগীরথীর অপর পার আড়বালি নামক গ্রামে। মহেশ্বরপাশায় ইহারা "মল্কী" খেতাবে পরিচিত। "মল্কী" কোন নবাব অথবা রাজ সরকারের প্রদত্ত উপাধি বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ প্রবাদ আড়বালি থাকিতে ইহাঁদের কৌলীন্য মর্য্যাদা ছিল। ইহাঁদের পূর্ব্বতন পদবী মিশ্র পরে আচার্য্য হয়। দামোদর নামক ইহাঁদের কোন পূর্ব্ব পুরুষের ৭ কন্যা জন্মগ্রহণ করে, দামোদর ৭ জনকেই কুলীনের সহিত বিবাহ দেন কিন্তু ইহাতে তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এমন এরূপ অবস্থা হয় যে গৃহে এক কণা তণ্ডুল ছিল না, তিনি সস্ত্রীক তিন দিন পর্য্যন্ত নাড়ুর মল্কো খাইয়া থাকেন। এই ঘটনা হইতেই গ্রামের সকলে তাঁহাকে মল্কী বলিয়া ডাকিত, এবং সেই গ্রামবাসী প্রদত্ত খেতাব এখনও চলিয়া আসিতেছে।

দামোদরের বংশধর জনার্দ্দন আচার্য্য পাণ্ডিত্য হেতু চক্রবর্ত্তী উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি মহেশ্বর ঘোষের পুরোহিত হইয়া তাঁহার সহিত প্রথম মহেশ্বরপাশায় আগমন করেন।

জনার্দ্দনের পুত্র নরসিংহ। তাঁহার দুই পুত্র বনমালী এবং শুকদেব। শুকদেবের বংশধরগণ কপালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। বনমালীর এক পুত্রের বংশধর হাজরাপাড়ায় অবস্থিত, অন্যপুত্র রামবল্লভের বংশধরগণ এই স্থানে বাস করিতেছেন।

রামবল্লভের পুত্র বিশ্বেশ্বরের কন্যাকে কাঁড়াগাছি গ্রামের কৃষ্ণজীবন বিদ্যালঙ্কার বিবাহ করিয়া শ্বশুরবাড়ীর সন্নিকটে শ্বশুর প্রদত্ত জমীতে বাস করেন, তাঁহার বংশধর যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্রগণ বর্ত্তমান।

বিশ্বেশ্বরের পুত্র রামরাম। তাঁহার চারি পুত্র রামদুলাল, কৃষ্ণপ্রসাদ, রামকিশোর ও বিদ্যাধর। রামদুলাল জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন,

তাঁহার হস্তলিখিত বইগুলি অদ্যাপি গৃহে বর্ত্তমান। রামদুলালের তিনপুত্রের মধ্যে জগমোহনের বংশ বর্ত্তমান।

কৃষ্ণ প্রসাদের পুত্র রাজনারায়ণ। তাঁহার দেল এ গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে হারাণ, কৈলাসের বংশ নাই, ঈশ্বরের পুত্র অবিনাশ বহুদিন হইতে নিরুদ্দেশ। তাঁহার পুত্র সতীশ অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার দুই কন্যা বর্ত্তমান।

রামকিশোরের তিন পুত্রের কাহারও বংশ নাই, অন্যতম লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ত্রিবেদীয় কর্ম্মে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বহুস্থানে তাঁহার কৃত পদ্ধতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

বিদ্যাধরের কালীনাথ, হরিনাথ প্রভৃতি কয়েক পুত্র হয়, কিন্তু কাহারও বংশ নাই।

জগমোহনের তিনপুত্র বৈদ্যনাথ, দীননাথ ও জানকীনাথ। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ নাই। জানকীনাথ আলিপুরে মোক্তার ছিলেন; দীননাথের তিন পুত্র; প্রিয়নাথ,গোপাল, নেপাল। প্রিয়নাথ বনকর বিভাগে চাকরী করিতেন। তিনি সুন্দরবনের প্রথম রেঞ্জার ছিলেন। তিনি এই গ্রামের অনেক ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। তাঁহার আয়ের অনেকাংশ দানে ব্যয় হইত। তিনি ১৩২৬ সালের আষাঢ় মাসে দেহ ত্যাগ করেন; তিনি নিঃসন্তান। নেপালের ও বংশ নাই। নেপাল কাবুলে ৩০০৲ টাকা বেতনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। দীননাথের মধ্যম পুত্র গোপাল চন্দ্র তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। রাজনারায়ণ মল্লীর দেউল কালক্রমে লোপ পায়, সেজন্য কালীবাড়ীতে সরকারী দেউলের বামপার্শ্বে তাঁহাদের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা অপরের অধিকৃত হয়। গোপালচন্দ্র ১৩০২ সালে পুনরায় দেউল আরম্ভ করেন কিন্তু পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হন না। তৎকালে গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ ৺বিশ্বম্ভর মুন্সী মহাশয় গোপালচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও

গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, অথচ ৺মহেশ্বর ঘোষের পুরোহিত বংশ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকের বাসে যাইতে নীচতা বোধ করেন, এজন্য গোপাল চন্দ্র নিজ বাড়ীর দক্ষিণে দেউল মণ্ডপ স্থাপন করেন এবং বাজার মিলাইয়া যান। ৺দোলপূজায় আজ ও বাজার মিলিয়া থাকে কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বাজারের সে শ্রী এখন আর নাই।

এই বংশে ৫২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রতি অমাবস্যায় ৺কালীবাড়ীতে ৺কালীপূজা হইত। ইঁহারা বীরাচারী উপাসক সেজন্য রাত্রে পূজা হইত, সেবাইতগণ উপস্থিত থাকিতেন না, পরন্তু ৺বংশীবদন চক্রবর্ত্তী পূজা করিতেন। পূর্ব্ব হইতে সেবাইতগণের সঙ্গে মনোমালিন্য থাকায় তাহাদের কেহ এমন কার্য্য করেন যাহাতে গোপাল চন্দ্রের মনে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মে এবং তিনি বাড়ীতেই এক আসন প্রস্তত করাইয়া পূর্ব্বমত ৺কালীপূজা করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র এক বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এখন প্রতি অমাবস্যায় আর পূজা হয় না, মাত্র ৺কালীপূজার দিন হইয়া থাকে। গোপালচন্দ্র ১৩১৮ সালের কার্ত্তিকমাসে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র জীবনকৃষ্ণ দশকর্ম্মে অভিজ্ঞ। তিনি স্মৃতির মধ্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) উপাধির জন্য প্রস্তত হন। তিনি নির্ভীক এবং সত্যনিষ্ঠ। অধ্যাপকের এক অন্যায় ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দেন।

গুহ মজুমদার বংশ।

মহেশ্বরপাশার গুহ মজুমদার বংশ বহু গোষ্ঠী হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা বর্ত্তমান সময়ে ধনে, মানে, জ্ঞানার্জ্জনে গ্রামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিরাট গুহ সম্ভূত। বিরাটের অধস্তন ১৫ পর্য্যায়ের হরিদাস গুহ রায়ের পুত্র চণ্ডীদাস গুহ রায় সর্ব্ব প্রথম মহেশ্বরপাশায় আসেন। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস বরাট গ্রাম, হুগলীজেলার অন্তর্গত মহানদের নিকটে।

পশ্চিম বঙ্গে (রাঢ়দেশে) যেমন ঘোষ, বসু ও মিত্র দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলের অধিকারী হইয়াছেন, গুহবংশীয়েরাও সেইরূপ পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গজ কুলীন বলিয়া পরিচিত। বিরাট গুহের বংশধরগণ সকলেই পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সময়ে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গঙ্গাহীন দেশে বাস করা হিন্দুর অকর্ত্তব্য মনে করিয়া গঙ্গাতীরে হুগলীর অন্তর্গত মহানদ ও বরাট গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তৎকালে ইঁহাদের কুলীনের ন্যায় নববিধ আচার ব্যবহার থাকিলেও পশ্চিম বঙ্গের নিয়মানুসারে ইঁহারা গোষ্ঠীপতি অত্যন্ত সম্মানী মৌলিক বলিয়া পরিচিত হন। সম্ভবতঃ এই সময়ে ইহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ ভুক্ত হইয়া যান। ইহাঁরা কাশ্যপ গোত্রীয় এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশীয়।

চণ্ডীদাস আমিন ছিলেন। মহেশ্বর ঘোষ আবাদের জঙ্গল কাটিয়া কত জমী বাসের উপযুক্ত করিয়াছেন, তাহা জরিপ করিবার জন্য চণ্ডীদাসকে এখানে আনয়ন করেন। চণ্ডীদাস জমি মাপিতে আসিয়া মহেশ্বর ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে থাকেন।

চণ্ডীদাসের চারিপুত্রের মধ্যে একজন অতি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অপর তিন জন রাজীবলোচন, কমললোচন এবং শ্রীমুখ

হইতে সমগ্র মজুমদার পরিবারের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজীব লোচনের প্রপৌত্র নন্দরাম (২০ পর্য্যায়), তাঁহার ১১ পুত্রের মধ্যে ৪ জন অকালে কাল প্রাপ্ত হন। বাকী ৭ জন—প্রভুরাম, শুকদেব, রামদুলাল, রামনিধি, কৃষ্ণচন্দ্র, ইন্দ্রনারায়ণ এবং রামলোচন হইতে "সাতঘ'রে" নাম হইয়াছে।

প্রভুরামের প্রপৌত্র ৩ জন—রামলাল, শ্যামলাল এবং হরলাল। রামলালের পুত্র উপেন্দ্র পুরুলিয়া ব্যাঙ্কের খাজাঞ্জি ছিলেন। তিনি নির্ম্মল স্বভাব ও সাধু চরিত্র ছিলেন। তিনি মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন এবং সম্পুর্ণ নির্লোভ হইয়া ব্যাঙ্কের চাকরী করিয়া গিয়াছেন। শ্যামলালের পুত্র সন্তান নাই, একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান। হরলালের দুই পুত্র ব্রজেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র। ব্রজেন্দ্র এম্ এ, বি, এল্, পুরুলিয়ার একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল, তিনি গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র।

প্রভুরামের পৌত্র রাধামোহন মজুমদারের ভাগিনেয় বিদ্যানন্দ কাটীর পিয়ারীমোহন বসু শৈশবাবস্থায় পিতৃহীন হইয়া মাতার সহিত এখানে আসেন এবং মাতুলের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

শুকদেবের ৬ পুত্রের মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবনের বংশ বর্ত্তমান। বৃন্দাবনের ৫ পুত্রের মধ্যে মাত্র দুই জনের বংশ আছে।

পার্ব্বতীর পুত্র অন্নদা এবং অন্নদার পুত্র শচীন্দ্র মিরাটে গবর্ণমেণ্ট আফিসে কাজ করেন। শ্যামাচরণের দুই পুত্র দুর্গাচরণ এবং হীরালাল। দুর্গাচরণের পুত্র মনোমোহন কালেক্টরীতে কাজ করেন।

রামদুলালের বংশে বর্ত্তমান কেহ নাই, বঙ্ক নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

রামনিধির পুত্র ভগীরথ, অবিবাহিত অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। রামনিধির দুইটী কন্যা ক্ষেমঙ্করী এবং পদ্মা। নলতা গ্রামে

ক্ষেমঙ্করীর বিবাহ হয়। ক্ষেমঙ্করীর পুত্র পার্ব্বতীচরণ বসু সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া এইখানে বাস করেন। তিনি কড়োরা মিত্রবংশে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফল তাঁহাদের একমাত্র কন্যা শশীমুখী। কাটা'ল তলার হর চন্দ্র গুহের সহিত শশীমুখীর বিবাহ হয়। ইহাঁদের দুই পুত্র সাতুলাল এবং বিপিন বিহারী। ইহাদের শিশুকালেই হরচন্দ্র এবং শশীমুখী উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন দুটী বালক অত্যন্ত নিরুপায় এবং নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। গিরিশ চন্দ্র মজুমদারের কথা ইহার পরেই বলিব; তাঁহার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত দয়াবতী রমনী ছিলেন; তিনি নিঃসন্তান; অভয়দাত্রীরূপে এই নিরাশ্রয় বালক দুটিকে তিনি স্বীয় ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, এবং পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন।

সাতুলাল নিজ চেষ্টায় এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়া ই, বি, রেলে প্রবেশ করেন, পরে স্বীয় প্রতিভায় যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত বনগাঁ ষ্টেসনে ছিলেন। খুলনা যশোহরের অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, তিনি বহু লোককে অন্নদান করিয়াছেন, তাঁহার বনগাঁর বাসা অন্নসত্ররূপে উচ্চ নীচ, মহৎ ক্ষুদ্র, সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার সহায়তায় অনেকে রেলে চাকরী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন। তিনি ইং ১৯১৬ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ মণীন্দ্র ষ্টেসন মাষ্টার; মধ্যম সুধীরেন্দ্র বি, এ পাশ করিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন, ৩য় ভূপেন্দ্র ভেটারনারী সার্জন হইয়া সরকারী চাকরী করিতেছেন, কনিষ্ঠ জীবন কৃষ্ণ বর্ত্তমানে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র।

সাতুলালের কনিষ্ঠ বিপিনবিহারী উড়িষ্যার পিঃ ডব্‌লু ডিতে ওভারসিয়ার ছিলেন, এইক্ষণে পেনসান্‌ ভোগ করিতেছেন, তাঁহার পুত্রসন্তান নাই, ৩ কন্যা বর্ত্তমান।

CamScanner

কৃষ্ণচন্দ্রের বংশে কেহ নাই। তাঁহার দৌহিত্র বসুমিত্র পাড়ার হরিচরণ ঘোষ মহাশয়ের পিতামহ গৌরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন।

ইন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র ভোলানাথ এবং শম্ভুনাথ। ভোলানাথের পুত্র গিরিশ চন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন এবং সমাজের নেতৃত্ব করিতেন।

শম্ভুনাথের দুই পুত্র পিয়ারীমোহন এবং যাদবচন্দ্র। যাদবের বংশ নাই। পিয়ারীমোহন ভুরিভোজী ছিলেন, তিনি একাই একটি বড় পাঁঠা খাইতে পারিতেন। এইরূপ ভুরিভোজী এবং বলবান ব্যক্তিদের পরিচয় আমরা বহুস্থলেই পাইব, আজ ইহা নিশার স্বপনের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু ইহা বেশী দিনের কথা নহে। পিয়ারীমোহন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। পিয়ারীমোহনের ৪ পুত্র। জ্যেষ্ঠ উমেশচন্দ্র ডাকবিভাগে চাকরী করিতেন। তিনি অপরিণত বয়সে এক কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। মধ্যম কেদারনাথ কুচবিহার ষ্টেটের পাবলিক ওয়ার্কসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় নলিনীনাথ মজুমদার বাহাদুর বেঙ্গল পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। পিয়ারিমোহনের তৃতীয় পুত্র রায় সাহেব বঙ্কিমচন্দ্র কালাহাণ্ডি ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার, তিনি নিঃসন্তান। পিয়ারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র মজুমদার এম্, এ, নিউ পাটনা কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ। ইঁহারা সকলেই কৃতী, ইঁহাদের জীবনী পৃথক আলোচিত হইবে। শরৎচন্দ্রের ৪ পুত্র, জ্যেষ্ঠ সুবোধচন্দ্র এম্, এস্‌সি, বি, এল্, খুলনা জজকোর্টের উকিল। মধ্যম সুধীর মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছেন।

"সাতঘ'রের" অন্যতম রামলোচনের দুই পুত্র যশোবন্ত এবং হলধর। যশোবন্তের পুত্র মহিমের বংশ নাই। হলধরের ৪ পুত্র, সীতানাথ, রজনীকান্ত, কুঞ্জবিহারী এবং প্রসন্নকুমার। কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার বালক বয়সে দেহত্যাগ

করেন। সীতানাথ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এষ্টেটে চাকরী করিতেন। অনুমান ইং ১৮৬৬ সালে তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। খুলনার সন্নিকটস্থ শিববাড়ীতে খৃষ্টানদিগের আড্ডা ছিল। ঢাকা নিবাসী গগনচন্দ্র দত্ত সেখানকার পাদরী ছিলেন, লোকে তাঁহাকে গগনভ্যাট্ বলিয়া ডাকিত। তিনি সীতানাথকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

রজনীকান্ত সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেন, মহেশ্বরপাশা গ্রামে তিনি সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথি প্রচার করেন। তিনি জ্ঞান পিপাসু এবং শাস্ত্রেও তাঁহার দখল আছে। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে চারু এবং ক্ষণদা বর্ত্তমান। তাহারা রেলবিভাগে চাকরী করিতেছেন। কনিষ্ঠ জ্যোতিষচন্দ্র দৌলতপুর কলেজে বি, এ, পাঠকালে ইং ১৯২০ সালে দুর্জ্জয় বসন্তরোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি সাহিত্যামোদী ছিলেন এবং গ্রন্থকারের সহিত সর্ব্বদা সাহিত্যালোচনা করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি ইংরাজী ও বাংলা অনেক সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান গুণ ছিল, তাঁহার অকাল মৃত্যু গ্রামের দুর্ভাগ্য।

হলধরের তৃতীয় পুত্র কুঞ্জবিহারীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার জীবনী পৃথকভাবে আলোচিত হইবে।

কুঞ্জবিহারীর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সতীশচন্দ্র অকালে কালপ্রাপ্ত হন। মধ্যম প্রতাপচন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়া ঠাকুর গাঁ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। কনিষ্ঠ গোপালচন্দ্র গ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। তিনি এম, এ, পড়িতেছেন। জ্ঞানার্জ্জনে, ধর্ম্মচর্চ্চায়, চরিত্রের পবিত্রতায় গ্রামের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ পাওয়া দুর্ল্ভ। ইং ১৯২৮ সালে তিনি দৌলতপুর কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার

করিয়াছেন। ম্যাট্রিকুলেশন এবং আই, এতে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বাংলা এবং ইংরাজী প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব আছে। দৌলতপুর কলেজের ত্রৈমাসিক পত্র "দেবায়তনে" তাঁহার বহু ইংরাজী প্রবন্ধ শোভা পাইতেছে।

চণ্ডীদাসের পুত্র রাজীবলোচনের বংশ "সাতঘরে"কে লইয়া শেষ হইল!

*　　　*　　　*　　　*

চণ্ডীদাসের অন্যতম পুত্র কমললোচনের দুই পুত্র রামলাল এবং রামজীবন। রামলালের ৬ পুত্রের মধ্যে জয়রাম এবং রামগোপালের বংশ বর্ত্তমান। জয়রাম নবাব সরকারে চাকরী করিয়া সরকার উপাধি প্রাপ্ত হন।* গ্রামের মধ্যে একসময়ে ইহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তালপুকুরের পাড়ে ইহাদের প্রকাণ্ড হস্তী এবং অশ্বশালার গল্প এখনও বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে কিছুই নাই। জয়রামের প্রপৌত্র উমাচরণের দুই পুত্র হীরালাল ও মণীন্দ্র বর্ত্তমান।

রামগোপালের ৫ পুত্রের মধ্যে ৩ জনের বংশ নাই। রামগোবিন্দের ৩ পুত্র। বাঞ্ছারাম, রামরুদ্র এবং বনমালী। বাঞ্ছারাম নিঃসন্তান। রামরুদ্রের ৭ পুত্রের মধ্যে অন্যতম জন্মেজয়ের কন্যা বিনোদিনীকে খাজুরা গহেরপুরের কালীকান্ত ঘোষ বিবাহ করিয়া এখানেই বাস করেন। তাঁহার জ্ঞানেন্দ্র, সুরেন্দ্রাদি ৩ পুত্র বর্ত্তমান। সুরেন্দ্র রেলবিভাগে কাজ করেন। বনমালীর ৩ পুত্রের মধ্যে ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র দুর্গাচরণ ও রাইচরণ। দুর্গাচরণের পুত্র কালিদাস ও রাখালদাস। রাখালদাস ই, বি, রেলের লোকো আফিসে কেরাণীগিরি করেন।

রাইচরণ রংপুর জেলায় পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। তাঁহার

---

* কিন্তু ঘটককারিকায় কমললোচনকে সরকার উপাধি ভূষিত দেখা যায়। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—গ্রন্থকার।

জীবনী আলোচনার যোগ্য। তিনি কবি ছিলেন। পার্থপ্রতিজ্ঞা, দরিদ্র যুবা, একটী ছবি, কুলীন কন্যা, জাগ্রত স্বপ্ন, প্রভৃতি কতকগুলি খণ্ড কবিতা তাঁহার "অবসর চিন্তা" পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের চিত্র অনেক স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি পিতৃহীন হন। এই সময় অন্নচিন্তায় তাহাকে দেশত্যাগী হইতে হয়। "অবসর চিন্তার" দরিদ্র যুবার বিলাপধ্বনিতে তাঁহার এই সময়ের মানসিক অবস্থা উজ্জলভাবে অঙ্কিত আছে। কিন্তু যুবক দরিদ্র হইলেও উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ নহেন, কঠোর আত্মাভিমানী, তাহার প্রমাণ—

যাবে প্রাণ অনশনে সহিব অম্লান মনে
তবু পর প্রত্যাশায় জীবন আমার
করিব না কলুষিত এ প্রতিজ্ঞা সার।
বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ, ত্যজিব না অভিমান ;
অভিমানে পরিপূর্ণ মানস আমার।

দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে তাহাকে গবর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করিতে হয়। তিনি পুলিশের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার হন, কিন্তু তিনি তাঁহার দেশকে ভুলিতে পারেন নাই। স্বদেশ প্রেম তাহার মনে সর্ব্বদাই জাগরুক ছিল—

তোরা না ভারতবাসী দুরন্ত যবনে
বলেছিলি একদিন গর্ব্বিত বচনে—
"ভারত শ্মশান হবে মরু হ'য়ে প'ড়ে রবে,
থাকিতে ভারতে এক বালিকা জীবন
পারিবে না স্বাধীনতা করিতে হরণ।"

বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হইলেও তাঁহার



স্বর্গীয় রাইচরণ মজুমদার। [পৃষ্ঠা ৩৬

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

উপলক্ষে রাখিবন্ধনে তাঁহার রচিত সঙ্গীত "ইংরাজের ভেদনীতি ভুলিয়ো না, বুঝ ভাই" তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রাইচরণ বীর ছিলেন। অশ্বারোহণে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং তিনি প্রত্যহ অশ্বারোহণ করিতে ভাল বাসিতেন। দানশীলতা তাঁহার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সমাজ সংস্কারেও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। তাঁহার রচিত কবিতায় এই সব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বালবিধবার ছবি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—

হায় হায় কি কঠিন মা বাপ হৃদয়হীন
দুবেলা আহার করে ষোড়শোপচারে,
হবিষ্যান্ন বিধি দিয়ে দুহিতার তরে।
হায় একাদশী দিনে বালিকা জীবন বিনে
শুষ্ক কণ্ঠা,—তবু হায়, একবিন্দু জল,
দিবে না জননী তার প্রতিজ্ঞা অটল।

রাইচরণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রামের অনেক সৎ কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহার চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব দেখিয়াছি অত্যন্ত সরলতা। তিনি সরল মনে সর্ব্বকার্য্যে ছেলেদের সঙ্গে মিশিতেন। তাঁহার ৩ পুত্র, জ্যেষ্ঠ বিভূতিভূষণ অনেকদিন পর্য্যন্ত মালয়দ্বীপে রবার গার্ডেনে চাকরী করিয়াছেন। মধ্যম মন্মথ বি, এ, পাশ করিয়া দিল্লীতে শিক্ষকতা করিতেছেন।

রামলালের অন্যতম পুত্র রামদেবের একমাত্র কন্যা ছিল। তাহাকে বিদ্যানন্দকাটীর মধুসুদন ঘোষের সহিত বিবাহ দিয়া রামদেব কন্যা-জামাতাকে এখানেই স্থিতি করান। কিন্তু কিছু দিন পরে কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রামদেব মধুসূদনের পুনরায় বিবাহ দেন। এই বংশে মতিলাল ঘোষ এবং তাঁহার পুত্র কিরণ বর্ত্তমান।

CamScanner

রামগোপালের পুত্র এবং রামগোবিন্দের অন্যতম ভ্রাতা রামানন্দের পুত্র মনোহরের ৪ পুত্রের মধ্যে একমাত্র গোলোকের বংশ বর্ত্তমান। গোলোকের পুত্র মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথের দুই পুত্র রজনীকান্ত ও বাণীকান্ত। রজনীকান্তের দুই পুত্র বিজয় ও কিরণ। কিরণ তালুকদার, ধর্ম্মে মতিমান। বাণীকান্তের পুত্র অক্ষয়কুমার বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করিতেছেন।

কমললোচনের অন্য পুত্র রামজীবনের ধারায় 'বাগান বাড়ীর' রুক্মিনীকান্ত ও মহিমাচন্দ্রের পুত্রগণ বর্ত্তমান। রুক্মিনীকান্তের পুত্র অমৃতলাল। মহিমাচন্দ্রের ৩ পুত্র অনন্তকুমার, নেপাল ও নিশিকান্ত। অনন্তকুমার পুলিশ বিভাগে চাকরী করেন।

চণ্ডীদাসের তৃতীয় পুত্র শ্রীমুখের ৪ পুত্র রাঘবেন্দ্র, রূপনারায়ণ, কালিদাস এবং বিদ্যানিধি; শেষোক্তের বংশ নাই। রাঘবেন্দ্রের বংশেও বর্ত্তমানে কেহ নাই। তাঁহার অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ ধনঞ্জয়ের বাড়ীতে রসিক লাল মজুমদারের ভাগিনেয় নটবর ও রামচন্দ্র বসুর পুত্রগণ বাস করিতেছেন। নটবরের একমাত্র পুত্র রবীন্দ্রনাথ এবং রামচন্দ্রের দুই পুত্র নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র রেলবিভাগে চাকরী করেন।

রূপনারায়ণের দুই পুত্র দুর্গারাম ও রামকান্ত; শেষোক্তের বংশ নাই। দুর্গারামের ৩ পুত্র, রামশরণ, রামহরি এবং জগন্নাথ। রামশরণের পুত্র হারানন্দ এবং হারানন্দের পুত্র নীলকমল ও মধুসূদন; ইহাদের বংশে কেহ নাই।

হারানন্দের দুই কন্যা ছিল, একজনের বিবাহ হয় পশ্চিমপাড়া শশিভূষণ ঘোষের বাড়ীতে, অপরা ব্রহ্মময়ীকে তারকচন্দ্র মিত্র বিবাহ করেন। ব্রহ্মময়ী তৎকালে একজন পরম দয়াবতী এবং অতিথি পরায়ণা রমণী ছিলেন। তাঁহার প্রশংসা পাড়ার বৃদ্ধদের মুখে আজও শুনা যায়। তারক চন্দ্রের বাড়ী কপোতাক্ষের তীরে ছিল। তিনি মধ্যাংশ

দ্বিতীয়পো কুলীন। তিনি কলিকাতায় চাকরী করিতেন কিন্তু উত্তরকালে ব্রহ্মময়ীকে লইয়া এইস্থানে বাস করেন। তারকের পুত্র শীতলচন্দ্র ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। প্রিয়নাথ মিত্র তারকের ভ্রাতুষ্পুত্র—তিনি শৈশবে মাতাপিতৃহীন হইয়া খুল্লতাতের আশ্রয়ে তাঁহারই যত্নে প্রতি-পালিত হন। প্রিয়নাথের এক পুত্র বর্ত্তমান। শীতলচন্দ্রের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রনাথ, আদর্শ চরিত্রের যুবক, বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া অসহো-যোগ আন্দোলনের দিনে দেশের অনেক কাজ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে তিনি বড়চাকিয়া চিনির কারখানায় কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেছেন। মধ্যম নলিনী রঞ্জন দৌলতপুর কলেজ হইতে ১৯২৬ সালে সসম্মানে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তাঁহার অধিকার আছে এবং সংবাদ পত্রাদিতে তিনি সমভাবে লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। গ্রামের এবং জেলার নানাবিধ সদনুষ্ঠানে তাঁহার যোগ আছে। গ্রামে খদ্দর আন্দোলনে তিনি প্রধান উদ্যোগী। তিনি মহেশ্বরপাশার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং যাবতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী।

রামহরির চারি পুত্রের মধ্যে একমাত্র নিমচাঁদের বংশ বর্ত্তমান। নিমচাঁদ নাজিরপুরে মুন্সী ছিলেন, তিনি বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া প্রকাশ, এজন্য সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার নাম প্রচারিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, পারস্যভাষাতেও তিনি তেমনি পারদর্শী ছিলেন। অধ্যাপক ও মৌলবীদের সহিত তিনি সমভাবে তর্কবিতর্ক করিতে পারিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। পাড়ায় কাহারও পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার শুভাশুভ গণিয়া ঠিক করিয়া রাখিতেন। শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তীর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্ত্তীর একটী কন্যা সন্তান হয়। তখনই শ্রীরাম নিমচাঁদের নিকট আসিয়া কন্যার শুভাশুভ গণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

নিমচাঁদ উত্তর করিলেন, তোমার কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র আমার গণনা হইয়া গিয়াছে, হয় ত তোমার কন্যা যাবে, না হয় তুমি যাবে কিম্বা তোমার ব্রাহ্মণী যাবেন, তিন জনের মধ্যে একজনকে যেতেই হবে। এই সময়ে শ্রীরামের বাড়ী হইতে একজন দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল নবপ্রসূতা কন্যাটিকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে। নিমচাঁদ শ্রীরামকে বলিলেন ঠাকুর তোমরা দুজনে বাঁচিয়া গেলে। নিমচাঁদ গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি বহুতীর্থ ভ্রমণ করেন।

নিমচাঁদের পুত্র দ্বারিকানাথ, দ্বারিকানাথের দুই পুত্র অম্বিকাচরণ ও কনকচন্দ্র; কনকচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র। অম্বিকাচরণের দুই পুত্র সতীশ ও জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বর্ত্তমান, বি, ডি, রেলে ষ্টেসন মাষ্টার। সতীশ গ্রামের অন্যতম সুসন্তান ছিলেন, তিনি এফে পাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় গুণে উচ্চ পদে উন্নীত হন। কিন্তু ইহার অল্প দিন পরেই ইং ১৯২৩ সালে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যান, তাঁহার অকালমৃত্যু গ্রামের দুর্ভাগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেন, প্রত্যহ নিয়মিত গীতাপাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন এজন্য তাঁহার একটী গৃহ লাইব্রেরী ছিল।

রামহরির অন্য ভ্রাতা এবং দুর্গারামের পুত্র জগন্নাথের পৌত্র রসিকলাল; তাঁহার পুত্র পূর্ণচন্দ্র বর্ত্তমান, তিনি নিঃসন্তান।

শ্রীমুখের দুই পুত্রের কথা বলা হইল, বাকী কালিদাস, কালিদাসের দুই পুত্র রামশঙ্কর এবং বেণীরাম।

রামশঙ্করের ৫ পুত্রের মধ্যে একমাত্র শিবপ্রসাদের বংশ বর্ত্তমান। রামশঙ্করের অন্যতম পুত্র রামমোহনের দৌহিত্র বারাণসী ঘোষ। ইহারা মহিষখোলার ঘোষ, মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো কুলীন। মাতামহ প্রদত্ত সামান্য জমী লইয়া তাঁহার আশ্রিত হইয়া এইস্থানেই বাস করেন।

বারাণসীর দুই পুত্র জাহ্নবীচরণ ও অন্নদাচরণ। অন্নদাচরণ প্রথমে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ওভারসিয়ার হন, পরে বি. এন্, ডব্‌লু রেলে ওভারসিয়ারী করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ভাগিনেয় উপেন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র বসু অন্নদাচরণের বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। ইহাদের পৈতৃক নিবাস বাহিরদিয়া গ্রামে। অন্নদাচরণ নিঃসন্তান। জাহ্নবী চরণের দুই পুত্র শশধর ও যতীন্দ্রনাথ শশধর খুলনা কালেক্‌টরীর এসিষ্টেণ্ট নাজীর এবং যতীন্দ্রনাথ রাঁচি সেক্রেটারিয়েটের কেরাণী।

শিবপ্রসাদের দুই পুত্র, নবকৃষ্ণ এবং সর্ব্বেশ্বর। সর্ব্বেশ্বরের পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার দুই কন্যা। এক জনকে বসুমিত্র পাড়ায় গুপ্ত রায়* বিবাহ করেন।

নবকৃষ্ণের দুই পুত্র, পার্ব্বতীচরণ এবং প্রাণহরি। পার্ব্বতীচরণের পুত্র হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমারের দুই পুত্র, জলধর ও হলধর। প্রাণহরির পুত্র ললিতমোহন।

প্রাণহরির এক ভগিনীর দৌহিত্র গিরিশচন্দ্র দাস ঘাটভোগ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের আরও দুই ভাই— যদু এবং কেশব। যদুর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ হরিপদ রেলে চাকরী করেন। কেশবচন্দ্রও প্রবীণ ষ্টেসন মাষ্টার, সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। গিরিশের পুত্র সন্তান নাই। কেশব নিঃসন্তান।

---

* গুপ্তরায় বেলফুলিয়ার রায় চৌধুরী বংশ সম্ভূত। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বাণীরায় সন ১২৩৪ সালের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তিনি তাহাদের বাড়ীর দক্ষিণে পুষ্করিণী খনন করেন। এই পুষ্করিণীতে একটী বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। উহা বর্ত্তমানে কোথায় আছে তাহার স্থিরতা নাই। উত্তরকালে এই পুষ্করিণী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুনরায় খনিত হইয়া সরকারী পুকুর নামে খ্যাত হয়।

কালিদাসের অন্যতর পুত্র বেণীরামের তিন পুত্র গোকুলরাম, কন্দর্প-রাম ও সুধারাম; শেষোক্ত দুজনের বংশ নাই। গোকুলরামের তিন পুত্র। রামতনু, গিরিধর এবং হরচন্দ্র।

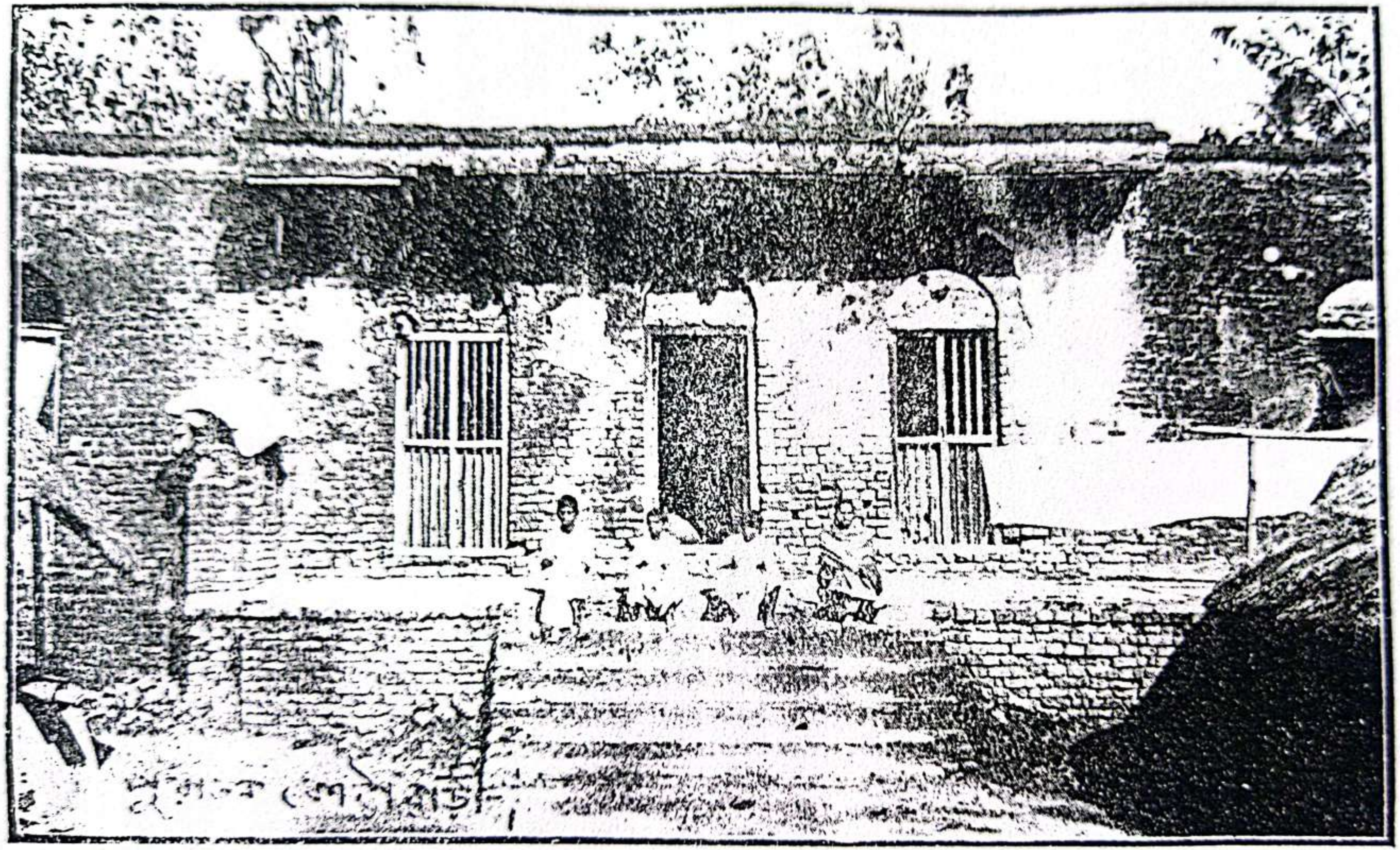
রামতনুর পুত্র যদুনাথ। যদুনাথের দুই পুত্র দুর্গাদাস এবং বিনোদ-লাল। দুর্গাদাস খুলনা কালেক্টরীর নাজীর ছিলেন। তিনি কালেক্টরের Head Assistant হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। কালেক্টরীতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁহার "Collector-maker" খ্যাতি ছিল। সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিনোদলাল গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র। বি, এ, পাশ করিয়া আজগড়া প্রভৃতি স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে বি, এল্, পাশ করিয়া খুলনা জজ্ কোর্টে ওকালিতী করিতে-ছেন। বক্তৃতায় এবং লেখনী চালনায় তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে।

গিরিধরের ৪ পুত্র। কৈলাসনাথ, সারদানাথ, ভবনাথ এবং প্রিয়নাথ। কৈলাসনাথ অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন, সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বহুপোষক ছিলেন। এরূপ আদর্শ পরিবার বর্ত্তমানে প্রায়ই দেখা যায় না। ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে কৈলাসনাথ ইহসংসার ত্যাগ করেন।

পুরাতন বাড়ীতে স্থানের সঙ্কুলান না হওয়াতে কৈলাসনাথ, ভবনাথ এবং প্রিয়নাথ উত্তরকালে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী করেন।

কৈলাসনাথের পিস্তুতো ভাই কেদারনাথ ঘোষ। ইহারা আকনা সমাজভুক্ত, মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো কুলীন। কেদারনাথ শৈশবে পিতৃহীন হইয়া মাতার সহিত পূর্ব্ব নিবাস লখপুর হইতে আসিয়া গিরিধরের পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পরিবারে থাকিয়াই কেদারনাথ প্রতিপালিত হন। উত্তর কালে রেল লাইনের ধারে একটী বাড়ী খরিদ করা হয়। কেদারনাথ সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। কেদার-নাথের দুই পুত্র। পূর্ণচন্দ্র এবং শিবনাথ। উভয়েই অপরিণত বয়সে

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)



৺রামতনু মজুমদারের কোঠাবাড়ী।

[পৃষ্ঠা ৪২

[মহেশ্বরপাশার আদি কোঠাবাড়ী।]

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

CamScanner

দেহত্যাগ করেন। পূর্ণচন্দ্রের এক পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও শিবনাথের এক পুত্র প্রফুল্ল বর্ত্তমান। জ্ঞানেন্দ্র খুলনা আদালতে কাজ করেন।

গিরিধরের মধ্যম পুত্র সারদানাথ গ্রামের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তৎকালে মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। অস্ত্রচিকিৎসায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রেও অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়াই তিনি প্রথমে ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাস্‌পাতালে চাকরী প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি নানাস্থানে কার্য্য করার পরে শ্রীহট্ট হাস্‌পাতালে প্রেরিত হন। এখানে তিনি ১৭ বৎসর ছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহার মানসিক শক্তি পূর্ণভাবে বিকসিত হয়। চিকিৎসায় বিশেষতঃ অস্ত্রবিদ্যায় তিনি সাহেব মহলেও বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল প্রতিভার নিকট সিভিল সার্জনের বিদ্যাও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। অনেকে সিভিল সার্জনকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেই গৌরব অনুভব করিতেন। একবার একটী কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া জনৈক সাহেবের নিকট হইতে সোণার দোয়াত কলম উপহার প্রাপ্ত হন।

ইং ১৮৮০ সালের জুন মাসে তিনি শ্রীহট্ট হইতে সপরিবারে নৌকাযোগে বাড়ী আসিতেছিলেন। মেঘনা বক্ষে নৌকাডুবি হয়। তরুণ বর্ষার গর্ব্ব স্ফীত মেঘনা এই মহাপুরুষকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বাহুডোর ছিন্ন করিয়া আপনার অগাধ সলিল শয্যায় শায়িত করিয়াছে। জানিনা ভগবানের কি উদ্দেশ্য এবং কাহার পরিণতি তিনি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন! এই সময়ে সারদানাথের বয়ঃক্রম অনুমান ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। সারদানাথ শ্রীহট্টে ইংরাজ, বাঙ্গালী সকলেরই সমভাবে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট

CamScanner

পাতালে তাঁহার এইরূপ স্মৃতিফলক প্রোথিত থাকিয়া তাঁহার তত্ত্বের পরিচয় দিতেছে—In memory of Babu Saradanath Guha for seventeen years in charge of this dispensary. He was accidentally drowned in the Megna near Kouria Adampur on 7th June 1880. He enjoyed the confidence and the respect alike of the European and native residents of the town of Sylhet.

সারদানাথের পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁহার দুই কন্যা। এক কন্যার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু এই স্থানেই বাড়ী করিয়াছেন। তিনি রেলবিভাগে কাজ করেন। তাঁহার ৪ পুত্র।

কৈলাসনাথের তিন পুত্র, বিপিনবিহারী, ইন্দুভূষণ এবং ভুবনমোহন। বিপিনবিহারী শিলং একাউণ্টাণ্ট আফিসে চাকরী করিতেন। বর্ত্তমানে পেন্‌সান ভোগ করিতেছেন। বিপিনবিহারীর ৪ পুত্র, শৈলেন্দ্র, নীতীন্দ্র, অনুপম, নিরুপম। শৈলেন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়া পুলিশবিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি এখন কলিকাতা পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টার।

কৈলাসনাথের মধ্যম পুত্র ইন্দুভূষণ ইং ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ সালে বি, এল্, পাশ করিয়া খুলনা জজকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতীতে তাঁহার ভাল পশার ছিল না কিন্তু বিশেষ আইনজ্ঞ এবং বিদ্বান বলিয়া জেলার মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। জেলার লোকহিতকর সকল আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগ ছিল এবং তিনি খুলনার অন্যতম নেতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিরূপ হন এবং জামীন দাবী করিয়া তাঁহার গতিবিধির স্বাধীনতা হ্রাস করিতে তৎপর হয়েন। সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের তথাকথিত রাজদ্রোহমূলক যতগুলি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার প্রায় সকলগুলিতেই তিনি আসামীর পক্ষে ওকালতী

করিয়াছিলেন। অন্যায় উৎপীড়নের কথা জানিতে পারিলেই তিনি পীড়িতের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওকালতীতে তাঁহার তেমন পশার ছিল না, কারণ তিনি আইনের ব্যবসায় করিলেও ইহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ইংরাজি সাহিত্যে এবং দর্শনে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সুবক্তা এবং সুলেখক ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দোষ ইংরাজী উচ্চারণ এবং সুললিত রচনাকৌশল অনেক উচ্চশিক্ষিত ইংরাজকেও বিস্মিত করিয়াছিল। বাইবেল শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। অনেক ইংরাজ পাদ্রীকে ছাত্রের ন্যায় জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার সহিত খৃষ্টধর্ম্মের আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে। তিনি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বালকের ন্যায় সরল অথচ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া দেশপূজ্য চিত্তরঞ্জনও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সার সুরেন্দ্রনাথের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। বর্ত্তমান কালের রাজনৈতিক নেতাদের সহিত তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। ইং ১৯২২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দুভূষণের পাঁচ পুত্রের মধ্যে মধ্যম মণীন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়া কিছুদিন ব্যাঙ্কে চাকরী করার পর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ নগেন্দ্রচন্দ্র (রামপ্রসাদ) অনেক দিন হইতে সংবাদ পত্র সেবায় নিয়োজিত আছেন। ভুবনমোহনের দুই পুত্র, হরিনাথ ও সুবোধরঞ্জন; সুবোধ ডাক বিভাগে কাজ করেন।

গিরিধরের ৩য় পুত্র ভবনাথ অত্যন্ত প্রিয়দর্শন এবং মিষ্টভাষী ছিলেন, তাঁহার শরীরে কেহ কখনও ক্রোধ দেখে নাই। তিনি পাড়ার ছেলে মেয়েদের অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারাও তাঁহার ভালবাসার প্রতিদান দিত। বাড়ীতে ৺পূজা হইত, ৺পূজার আমোদের জন্য তিনি যথেষ্ট টাকাই ব্যয় করিয়াছিলেন।

ভবনাথের ৫ পুত্র জ্যেষ্ঠ মহানন্দ বি, এল্, পাশ করিয়া প্রথম জীবনে মানীগঞ্জ এবং পরে খুলনায় ওকালতী করেন, কিছুদিন পরে তিনি ওকালতী ব্যবসা ত্যাগ করেন। ১৩৩৫ সালে ১৪ই ফাল্গুন তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

মহানন্দের ৪ পুত্র। জ্যেষ্ঠ মনোরঞ্জন গ্রামের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, মধ্যম রাধিকারঞ্জন গোবরডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন।

ভবনাথের মধ্যম পুত্র রায় বাহাদুর শশিভূষণ মজুমদার অবসর প্রাপ্ত একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তাঁহার জীবনী জীবনীসংগ্রহে প্রদত্ত হইল। তাঁহার এক পুত্র, দেবকুমার আই, এস্,সি পড়িতেছেন। চারি কন্যা, সকলেই শিক্ষিতা। কনিষ্ঠা রেণুকা বি. এ, পাশ করিয়াছেন।

ভবনাথের ৩য় পুত্র অশ্বিনী হোমিওপ্যাথি পাশ করিয়া গ্রামে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিতেন, ৪র্থ, মেঘনাদ ন্যায়রত্নের টোলে মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও দানশীল ছিলেন। কনিষ্ঠ, অটলের অভিনয়ে পারদর্শিতা ছিল।

গিরিধরের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের দুই পুত্র; কেশব-লাল ও বিজয়কুমার। রংপুর গ্রামে গোকুলরামের বংশধরগণের যে সম্পত্তি আছে তাহার তত্ত্বাবধারণের জন্য কেশবলাল জজ আদালত হইতে কমন্ ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে। তিনি হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়িয়া পাশ করিয়াছিলেন।

গোকুলরামের কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র যশোহরের অন্তর্গত মাগুরার প্রসিদ্ধ নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। তিনি অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—মথুরানাথ, বরদাকান্ত এবং কালীনাথ। বরদাকান্তর বংশ নাই। তৎকালে মথুরানাথের ন্যায় বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন

ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না। মালিমোকর্দ্দামা শলাপরামর্শে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কালীনাথ অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন।

মথুরানাথের ৩ পুত্র—বাণী, যোগেন্দ্র এবং দেবেন্দ্র। বাণী সারদানাথ মজুমদারের সহিত শ্রীহট্টে থাকিতেন এবং মিশন স্কুলে পড়িতেন। তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাঁহার যেরূপ অধিকার ছিল, সেরূপ আজকাল অনেক বি, এ, পাশেরও হয় না। তিনি ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। কেহ অভাব জানাইলে এক কপর্দ্দক নিকটে থাকিতে কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। তিনি প্রথম জীবনে চা বাগানে চাকরী করিয়াছেন পরে লাইনের ওভারসিয়ার হন। জীবনে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পানদোষ ছিল, কিছুই রাখিতে পারেন নাই। বাণীনাথের বংশ নাই।

মধ্যম যোগেন্দ্রনাথ; তিনিও শ্রীহট্টে থাকিতেন। মিশন স্কুল হইতে ১৮৬৮ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। তিনিই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এণ্ট্রান্স পাশ করেন। স্কুলে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এজন্য দুবার মেডাল পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি প্রথমে এখানে স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, পরে সৈদপুরে লোকো আফিসে প্রবেশ করেন। অবসর গ্রহণের সময় তিনি ট্রাফিক্ আফিসে ছিলেন। সৈদপুরে তাঁহার বাসা সকলের অবারিত দ্বার ছিল। সেকালে সৈদপুরে তাঁহার জন্য কেহ অভুক্ত থাকিত না।

যোগেন্দ্রনাথের তিন পুত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কানাইলাল এবং প্রমথনাথ দ্বিজেন্দ্র ই, বি, রেলে ডিভিসনাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আফিসের কেরাণী। প্রমথনাথ মিরাট মিলিটারী একাউণ্ট আফিসে কাজ করেন। কানাইলাল জলপাইগুড়ী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আফিসের একাউণ্টাণ্ট। কানাইলাল গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার গভীর

ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার ভবিষ্যৎ যেরূপ উজ্জ্বল হওয়া উচিত, সঙ্গদোষে তাহা হয় নাই। বি, এস্ সি পরীক্ষায় তিনি প্রথমবার প্রাকৃটিক্যালে অকৃতকার্য্য হন, দ্বিতীয়বার বি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭ম স্থান অধিকার করিয়া পাশ করেন।

মথুরানাথের কনিষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বাং ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন। দৌলতপুরে মাইনর স্কুল স্থাপিত হইলে তিনি সেইখানে পড়েন এবং যথাসময়ে সসম্মানে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অন্যান্য ভ্রাতার ন্যায় দেবেন্দ্রনাথও শ্রীহট্টে জ্যেষ্ঠতাত সারদানাথ মজুমদারের নিকটে থাকিয়া মিশন স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়েন। তিনি ১৮৭৫ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ন হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীহট্টে আসিয়া তিনি কুস্তীর আখড়ায় যোগদান করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া মেট্রপালটান কলেজে ভর্ত্তি হন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাশ এবং দেশপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু ছিলেন। এই ৩ জনে মিলিয়া ৺নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় যোগদান করেন। ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য দেবেন্দ্রনাথ গ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন।

তিন বন্ধু এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা করিতে থাকেন এবং অনেক ব্রাহ্মপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করেন। ব্রাহ্ম-প্রভাব সুন্দরী মোহন এবং বিপিনচন্দ্রকে স্বীয় সমাজে টানিয়া লইতে সক্ষম হয় কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দায় হইতে রক্ষা পান। ১৮৭৭ সালে তিনি এফে পরীক্ষা দেন কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ এক বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। আর তাঁহার পড়িবারও সুযোগ হয় নাই। ইহার পরে তিনি অনেক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ৫ বৎসর তিনি রেলবিভাগে চাকরীও করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ দৌলতপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন।

নিরঞ্জন, লালগোপাল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের ৫ পুত্র বর্ত্তমান।

কালীনাথের দুই পুত্র ছত্রধর এবং হরিনাথ; ছত্রধরের জ্যেষ্ঠপুত্র শরদিন্দু গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র। তিনি দৌলতপুর কলেজে বি, এ, পড়িতেছেন।

গোকুলরামের বংশে ১০৮ বৎসর ধরিয়া মহাসমারোহে ৺দুর্গাপূজা হইয়াছে। মহেশ্বরপাশার থিয়েটার এবং কনসার্ট পার্টি এক সময়ে দেশ বিদেশে সমাদর লাভ করিয়া ৺পূজার ৩ দিন বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য-জীবনকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। রংপুর গ্রাম হইতে ৺পূজার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে। আজ ৺পূজার সকল বন্দোবস্ত ঠিক আছে কিন্তু তত্বাবধানের অভাবে আজ কয়েক বৎসর ৺পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রায়চৌধুরী ও চট্টোপাধ্যায় বংশ।

রায়চৌধুরী মহেশ্বরপাশার অন্যতম আদিবংশ। ইহাঁরা রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ; এই বংশ জমিদার ছিলেন এবং ইহাঁদের বাড়ী বসু-মিত্র পাড়ায় ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাঁদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। রায় সাহেব বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদারের ঘরে এই বংশের যে পুরাতন তায়দাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় মাধব রায় চৌধুরী বলিতেছেন যে পূর্ব্বে তাঁহাদের জমিদারী ছিল। ঐ জমিদারী চাঁচ্ড়ার মনোহর রায় গ্রহণ করেন, মাধব উহা হইতে মাত্র ৬১৶০ বিঘা ব্রহ্মোত্তররূপে নিজ দখলে রাখেন। মাধবের পুত্র (বোধ হয়) রাজারাম এবং পৌত্র রাম-সন্তোষ রায়। রামসন্তোষ ১২০৯ সালের ১লা পৌষ তায়দাদ সহি করিয়া

গ্রহণ করিতেছেন, এই ৬১/০ বিঘার মধ্যে নিজবাটী ২০/০ বিঘা এবং অন্য জমি ৪১/০ বিঘা।

রামসন্তোষের পুত্র মধুসূদন রায়চৌধুরী (ওরফে মধু রায়) অবস্থা বৈগুণ্যে দায়গ্রস্ত হইয়া উক্ত ৬১/০ বিঘা জমি ৺শশিভূষণ সরকার মহাশয়ের নিকট বন্ধক রাখেন, বসতবাটী ভিন্ন ৪১/০ বিঘা জমি পুনরায় ৺পিয়ারীমোহন মজুমদার মহাশয়কে মৌরসী জমা দেন, এই সময়ে মধু রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার স্ত্রী ৺কাশীশ্বরী তাঁহার একমাত্র ওয়ারিশ হন। ৺শশিভূষণ সরকার তাঁহার প্রাপ্য টাকার জন্য আদালতের সাহায্যে ডিক্রী করেন, পিয়ারীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র কেদারনাথ ২২০০৲ টাকায় সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লয়েন।

মধুরায়ের পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার একমাত্র কন্যা রাজকুমারীকে নাগর ঘটকের পুত্র ৺কৃষ্ণহরি ঘটক বিবাহ করেন। কেদার নাথ এই উপরোক্ত নিষ্কর সম্পত্তি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ৺কালীমাতার বৃত্তি রূপে উৎসর্গ করিয়া (সন ১৩১৬ সাল) কৃষ্ণহরিকে দেবীর সেবাইত নিযুক্ত করেন; তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত ৺কালীর সেবা করিয়া এই সম্পত্তির উপসত্ব ভোগ করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুর দাসও সাত আট বৎসর সেবা করিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুর দাসের অকাল মৃত্যু হইলে সে বংশে আর কেহ উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় বর্ত্তমানে অন্য সেবাইত দ্বারা ৺কালীমাতার পূজা হইতেছে।

মধুরায়ের ভিটা চট্টোপাধ্যায়দর পুরাতন বাড়ীর দক্ষিণে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মহেশ্বরপাশার প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা মধু রায়ের পূর্ব্বপুরুষ কেহ হইবেন। মহেশ্বরপাশার চট্টোপাধ্যায় নৈকষ্য কুলীন, শ্রীকরের ধারা এবং সুলোচনের সন্তান, কিন্তু এই বংশে মহেশ চন্দ্র কৃতী হন বলিয়া ইহাঁরা মহেশচন্দ্রের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া

থাকেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত খনিয়া ইহাদের পূর্ব্বনিবাস। খনিয়া হইতে এক পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুর মহাকুমার গণকর গ্রামে বাস করেন; মহেশচন্দ্র এইস্থানেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাহার অন্যতম পুত্র রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহেশ্বরপাশার রায় বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানেই বাস করেন। রামগোপাল হইতে মহেশ্বরপাশা চট্টোপাধ্যায় বংশের উৎপত্তি।

রামগোপালের বিবাহ সম্বন্ধে 'নয় শ' 'পঞ্চাশের,' একটী সুন্দর উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য সেকালে রেল ষ্টীমার ছিল না, সকলে হাটিয়া বহুদূরদেশে যাতায়াত করিতেন। রায়বংশের কেহ এই রূপে পদব্রজে মুর্শিদাবাদ গঙ্গাস্নানে যান, তিনি গণকর মহেশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। মহেশচন্দ্রের ছয় পুত্র, ইহাদের একজনের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া নিজ গ্রামে কুলীন জামাতাকে স্থিতি করিতে ইচ্ছুক হন এবং মহেশচন্দ্রকে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। মহেশচন্দ্র প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই. রায় মহাশয় প্রচুর অর্থ দিবেন বলিলেন, কিন্তু মহেশচন্দ্র তাচ্ছীল্যভাবেই বলিয়া উঠিলেন "কি এমন ন শ' পঞ্চাশ দিবে যে তোমাকে একটী ছেলে দিতে হইবে?" তখন রায় মহাশয় বলিলেন, তাচ্ছা নয়শ পঞ্চাশ টাকাই দিব। মহেশচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না, বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"নয় শ পঞ্চাশ টাকা দিবে? আচ্ছা আমার যে ছেলেটী গরু রাখে, তাহাকে লইয়া যাও."; রায় মহাশয় মহাসন্তুষ্ট হইয়া মহেশচন্দ্রকে ৯৫০৲ টাকা দিয়া রামগোপালকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। কন্যা জামাতার বসতির জন্য বাটীর দক্ষিণে দুই বিঘা জমি দিলেন, ইহাই চাটুযোদের পুরাতন বাটী। রাম গোপাল উত্তরকালে হরিদাসপুরের কাঞ্জিলাল বংশে আর এক বিবাহ করেন। রায়দুহিতার গর্ভে ৪ পুত্র ১ কন্যা এবং হরিদাসপুরের স্ত্রীর গর্ভে

এক পুত্রের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন, হরিদাসপুরের বিবাহে তাঁহার ৫ পুত্র জন্মে, যাহা হৌক এখানে এক পুত্রের বংশই বর্ত্তমান। রায়দুহিতার গর্ভজাত ৪ পুত্রের মধ্যে রামদেব এবং কালীপ্রসাদের বংশ চলিতেছে। রামদেবের ৩ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠের বংশ নাই, মধ্যম নিমচাঁদের বংশে মল্লিকপাড়ার গোপাল ষ্টেশন মাষ্টার বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ রামশরণের চারি পুত্র—রামমোহন, নীলকণ্ঠ, রামলোচন এবং মুলুকচাঁদ। নীলকণ্ঠ নিঃসন্তান। তিনি বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নানাস্থানে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন, একদিনেই ১২টা পুষ্করিণী উৎসর্গ করেন। ইহার মধ্যে নিজ গ্রামের সরাণের পুষ্করিণী (দক্ষিণপাড়ায়), রঘুর পুষ্করিণী (বর্ত্তমানে আদিত্যদের দখলে),খালিস্পুরে একটী, লাউজানিতে একটী এবং বাজিত-পুরে একটী, এই কয়েকটী উল্লেখযোগ্য। খালিস্পুরে এখনও নীলকণ্ঠের নামে একটী মাঠ বিদ্যমান আছে। এক সময়ে তিনি পশ্চিম বিলের মধ্য দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। মধ্যাহ্নে বাজিতপুর গ্রামে এক ভদ্র-লোকের বাড়ীতে অতিথি হন, তৈল মাখিয়া গৃহস্থের প্রদর্শিত একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নান করিতে যাইয়া দেখিলেন সেখানে অবগাহন স্নান করা যায় না, নীলকণ্ঠ বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, স্নানও হইল না, গঙ্গা-স্নানে যাওয়াও হইল না, তিনি তখনই বাড়ী আসিয়া সেই স্থানে অবিলম্বে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি বহুস্থানেই পুষ্করিণী খনন করেন। তিনি ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করেন এবং ৺কাশীধামে যাইবার পথেও বহু পুষ্করিণী খনন করান। তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় কাম্যবৃষ করিয়া নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। রামমোহন এবং নীলকণ্ঠ, দুই ভ্রাতা মিলিয়া ব্যবসা করিতেন। উত্তরকালে তাঁহারা প্রচুর বিষয়সম্পত্তি করেন, রামমোহনের বংশধরগণ এখনও ঐ বিষয়ের কতকাংশ ভোগ করিতেছেন। সে পূর্ব্বদিন আর নাই, কিন্তু ইহাঁদের "বাবু" খেতাব এখনও বর্ত্তমান।

রামমোহনের মৃত্যু হইলে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সহমরণে গিয়াছিলেন, দম্পতীর দানসাগর শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।

রামমোহনের তিন পুত্র – রামকুমার, রামরতন এবং রামকানাই; রামকানাই তৎকালের প্রসিদ্ধ সালিস ছিলেন। রামকুমারের পুত্র জগত বাবু গ্রামের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সুপুরুষ ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃত্ব করিতেন। সমাজের পরে তাঁহার যথেষ্ট আধিপত্য ছিল, ইহা ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক সদ্‌গুণ ছিল। অতিথি সৎকারে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন। জগতবাবুর দুই পুত্র গোপাল এবং নেপাল।

নেপাল বাবু বহুকাল যাবৎ দৌলতপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের একটী লাইব্রেরী ছিল, তাঁহার ন্যায় জ্ঞানপিপাসু কচিৎ দৃষ্ট হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় চাকরী ছাড়িয়া তিনি সর্ব্বদা বাড়ীতে পুস্তক পাঠে রত থাকিতেন। সৌন্দর্য্যলিপ্সা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি বাড়ীতে একটী পুষ্পোদ্যান প্রস্তত করেন এবং সর্ব্বদা নিজ হস্তে ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। বহু টাকার ঋণগ্রস্ত হইয়াও তিনি সর্ব্বদা পুস্তক এবং ফুলের চারা ক্রয় করিতেন, বস্তুতঃ জ্ঞানচর্চ্চাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এ বিষয়ে এই পুস্তকের লেখকের সহিত তাঁহার অনেক আলাপ হইত, পুস্তকাদি রচনার জন্য তিনি গ্রন্থকারকে অনেক উপদেশ দিতেন এবং স্নেহ করিতেন, তিনি সর্ব্বদা গীতোক্ত শ্লোক বলিতেন, যথা—

যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একমনে অন্তকালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করে, সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

CamScanner

সেইজন্য তিনি দরিদ্র হইয়াও ঋণ করিয়া পুস্তকাদি ক্রয় করিতেন এবং সর্ব্বদা তাহার আলোচনায় রত থাকিতেন। ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে তিনি গয়াধামে পরলোক গমন করেন। গোপালবাবুর দুই ... নী এবং নরেন; নরেন বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া শিক্ষকতা ...ন। নেপালবাবুরও দুই পুত্র কুমুদ ও শচীশ। কুমুদ গয়ার ষ্টেশন মাষ্টার।

রামরতনের পুত্র দুর্গাচরণ। দুষ্টের দমনে দুর্গাচরণ গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালে বয়রা গ্রামের নয়ান মজুমদার দৌলতপুর কাছারীতে নায়েবী করিতেন। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী কর্ম্মচারী ছিলেন। ফলতঃ তাহার সর্ব্ববিধ অত্যাচারে গ্রামবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। দুর্গাচরণের আন্তরিক চেষ্টায় নয়ান মজুমদার চাকরী হইতে বরখাস্ত হয়েন এবং গ্রামে শান্তি ফিরিয়া আসে। নীলকর সাহেবের অত্যাচার দমনেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। দুর্গাচরণের পুত্র যজ্ঞেশ্বর বাবুর পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হীরালাল রেলে এবং তৃতীয় জ্ঞানেন্দ্র আবকারী পুলিশে চাকরী করিতেছেন। রামকানাইএর পৌত্র নিশিভূষণ বাবুর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ মন্মথনাথ রেলে চাকরী করিতেছেন। ইহারা সকলে (অর্থাৎ রামমোহনের বংশধরগণ) পশ্চিমপাড়ার নূতন বাড়ীতে বাস করিতেছেন।

রামলোচনের চারিপুত্র - গোরাচাঁদ, নিত্যানন্দ, চৈতন্য, শম্ভু। গোরাচাঁদের বংশ নাই, নিত্যানন্দের পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নের বংশে শিবনাথের একমাত্র শিশুপুত্র শশাঙ্ক বর্ত্তমান। চৈতন্যের সন্তান নাই, তাঁহার কন্যা রুক্মণির বিবাহ পিঙ্গালিয়ার লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দিয়া কন্যাজামাতাকে বাড়ীর জায়গা-জমি দিয়া রাখেন। ইহাদের পাঁচ পুত্র— বরদাকান্ত, পূর্ণচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র,

রামচন্দ্র এবং উমেশচন্দ্র। প্রথম দুইজন নিঃসন্তান, কৈলাসচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে নীলরতন অল্পদিন হইল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সতীশ কাশীবাসী। রামচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র আবকারীর দারোগা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র সুধাংশু, রণজিৎ, অজিৎ। সুধাংশু ১৯২৩ সালে বি, এ, পাশ করিয়া বর্ত্তমানে বারাসাত বসিরহাট লাইট রেলের এসিষ্ট্যাণ্ট ট্রাফিক ইন্‌সপেক্টারের কাজ করিতেছেন।

শম্ভুর পৌত্রগণের মধ্যে যদুনাথের এবং নিবারণচন্দ্রের বংশ বর্ত্তমান। সীতানাথ সাঁজিয়াড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। যদুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ পুলিশ বিভাগে চাকরী করিতেন, অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যদুনাথের অপর দুই পুত্র মণীন্দ্র এবং বিমল বর্ত্তমান। নিবারণচন্দ্রের পুত্র বিজয় বি, এ, পাশ করিয়া রেলে চাকরী করিতেছেন।

মুলুকচাঁদের প্রপৌত্র উমেশচন্দ্র পুরাতন বাড়ীতে থাকিয়া হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ক্ষীরোদ, নীরোদ প্রভৃতি তাঁহার চারি পুত্র। উমেশচন্দ্র ভঙ্গ কুলীন।

রামগোপালের অন্যতম পুত্র কালীপ্রসাদের পুত্র রামকিঙ্কর এবং ষষ্ঠীধর; ষষ্ঠীধরের প্রপৌত্র রজনী এবং প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ এক বিধবা বালিকাকে বিবাহ করিয়া গ্রামের মধ্যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশ নাই। রজনীর পুত্রগণ দেয়ানার রায়বাড়ী মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহারাও ভঙ্গ কুলীন।

রামকিঙ্করের দুই পুত্র। কনিষ্ঠ বাজুয়াডাঙ্গায় কাঞ্জিলাল বংশে বিবাহ করিয়া তথায় অবস্থিত, কিন্তু তাঁহার বংশ নাই। রামকিঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ গ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশের দুই কন্যা এবং মল্লিক বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন; মুখোপাধ্যায় দুহিতাদ্বয়ের মধ্যে একজন সন্তানহীনা, অপরার পুত্র মদনমোহন; তাঁহার দৌহিত্র অবিনাশ

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ইহার পূর্ব্ব নিবাস লখপুর) ; অবিনাশের ৪ পুত্র, জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ বি, এ, পাশ করিয়া বড়লাটের আফিসে (Imperial Record Department) চাকরী করিতেছেন।

কাশীনাথের তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে শ্রীনাথ, দেবনাথ এবং লোক-নাথের জন্ম হয়। শ্রীনাথ শৈশবকালে বিমাতাদত্ত বিষমিশ্রিত আহার্য্য খাইয়া গতাসু হন। লোকনাথের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ তান্ত্রিক সাধক। তাঁহার পুত্র সন্তান নাই। কয়েকটী কন্যার মধ্যে এখন কনিষ্ঠা বর্ত্তমান। দেবনাথের পুত্র গোপালচন্দ্র পূর্ব্বপাড়ায় লাইনের ধারে নূতন বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। গোপালের দুই পুত্র, তারানাথ কলিকাতায় পাটের কলের আফিসে চাকরী করেন, কনিষ্ঠ দুর্গানাথ বি, এল্. পাশ করিয়া খুলনায় ওকালতী করিতেছেন। গোপালের নেপাল ও ভূপাল (চণ্ডী) নামে আর দুই ভ্রাতা ছিলেন, ভূপালের দুইপুত্র, মধুসূদন ও দীনবন্ধু। মধুসূদন দৌলতপুর কলেজ হইতে আই, এ পরীক্ষায়, লজিকে প্রথম এবং মোটের উপর ইউনিভার্সিটিতে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন, অনার্স এ বি, এ, পরীক্ষা পাশ করেন, এখন তিনি বিহার গবর্ণমেণ্টের অডিটর। মাতুল সম্পত্তি পাইয়া লক্ষ্মীপাশা, কাশীপুর বাড়ী করিয়াছেন। দীনবন্ধু আই, এস্ সি, পাশ করিয়া মেডিক্যাল স্কুলে পড়িতেছেন।

কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পিতামহ; ইহারা নৈকষ্যকুলীন, কানুর সন্তান। ভারতের পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সৈদপুর ট্রাষ্ট এষ্টেটে নায়েবী করিতেন। ভারতচন্দ্রের দুই পুত্র শরৎচন্দ্র এবং বনমালী। বনমালী ষ্টেশন মাষ্টার, শরৎচন্দ্র পুলিশ বিভাগে চাকিরী করিতেন। বর্ত্তমান কালে অতিথি সৎকারে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বাসাবাড়ী সর্ব্বদা অতিথির অবারিত দ্বার ছিল।

* * * *

রামগোপালের হরিদাসপুরের বিবাহজাত পুত্রগণের মধ্যে এক-জনের ধারা এই স্থানে বর্ত্তমান। রামগোপালের পুত্র রামজীবনের দুই পুত্র ধনঞ্জয় এবং বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ ভুরিভোজী ছিলেন এবং এজন্য গ্রামের মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ধনঞ্জয়ের পুত্র কাশীনাথ এবং তাঁহার পুত্র গণেশচন্দ্র রেল লাইনের ধারে বাস করিতেছেন। ইহার ত্রৈলোক্য, মহেন্দ্রাদি চারি পুত্র। গণেশচন্দ্র পুরাতন বাটীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নহেন।

মহেশ্বরপাশায় বর্ত্তমানে রামগোপালের সন্তান ১২ ঘর, ইহার মধ্যে ৩ ঘর ভঙ্গ কুলীন।

পশ্চিমপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ।

(১)

ইহাঁদের আদি বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত বাজিৎপুর গ্রামে। ইহাঁদের খড়দহ মেল এবং শাণ্ডিল্য গোত্র। ইহাঁরা ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান। এই বংশের রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় মুখভারত বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস করেন। রাম-লোচনের দুই পুত্র মহিমাচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র। গৌরচন্দ্রের পুত্র ইস্‌লাম-কাটি গ্রামে বাস করেন। মহিমাচন্দ্রের পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ ও রামদাস। রামদাস অপরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৈকুণ্ঠনাথ এই বংশের কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি সুশ্রী, সুগায়ক ও সুবক্তা ছিলেন। খুলনা কালেকটারীতে প্রায় ৩৫ বৎসর কার্য্য করিয়া সন ১৩১৯ সালের পৌষ মাসে ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা। কমলাচরণ, সখিচরণ, হরিচরণ, অম্বিকা-চরণ ও রাধাচরণ। ২য় পক্ষের দুই পুত্রের মধ্যে প্রথম অল্প বয়সে

ইহসংসার পরিত্যাগ করে। ২য় বিমলাচরণ খুলনা কালেকটরীতে কার্য্য করিতেছেন। কমলাচরণের পুত্র সুরেশচন্দ্র ইং ১৯২০ সালে বি, এ, পাশ করিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন।

---

(২)

এই পাড়ায় আর এক ঘর বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, তাঁহারা বংশজ। যুগলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্র গঙ্গানারায়ণ এবং জগন্নাথ। গঙ্গানারায়ণ মহেশ্বরপাশায় আসেন, জগন্নাথ উত্তরপাড়ায় অবস্থিতি করেন। গঙ্গানারায়ণের পুত্র রামচাঁদ। তাঁহার দুই পুত্র ভগবানচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র। শেষোক্তের বংশ নাই। ভগবানের ৩ পুত্র, চন্দ্রকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ, রবিতচন্দ্র। চন্দ্রকান্তের ৩ পুত্র, মধ্যম বিজয় পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করেন। দেবেন্দ্রনাথের নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ৩ পুত্র। হরিতের ও ৩ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কিশোরী মোহন ১৯২৮ সালে দৌলতপুর কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করিয়াছেন।

মিত্র বংশ

(১)

বড়িশা সমাজ।

বসুমিত্র পাড়ার মিত্র বড়িশা সমাজভুক্ত। ইহারা মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো কুলীন, ঘটকমিত্র বলিয়া দেশবিদেশে ইহাদের খ্যাতি আছে। বড়িশায় ইহাদের আদিবাস, কিন্তু এখানে সভারাম মিত্র যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়া গ্রাম হইতে আসেন। বর্ত্তমানে সভারামের অধস্তন ৮ম পুরুষ চলিতেছে। উত্তরপাড়ার করাতিয়ার ঘোষবংশের রামগোবিন্দ ঘোষের

পুত্রগণ পাঁজিয়া হইতে সভারামকে আনিয়া তাঁহার সহিত এক কন্যার বিবাহ দেন এবং যায়গাজমি দিয়া কন্যাজামাতাকে স্থিতি করেন।

সভারামের পুত্র মুক্তারাম; তাঁহার চারিপুত্র—দুর্গারাম, জয়নারায়ণ, অযোধ্যারাম এবং রাজনারায়ণ। দুর্গারাম এবং রাজনারায়ণ ঘটক ছিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কনিষ্ঠ রাজনারায়ণে যথেষ্ট কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং তেজস্বিতা বর্ত্তমান ছিল। সমগ্র কুলীনের বংশতালিকা তাঁহার সংগ্রহ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় গৃহদাহে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ছিল এবং তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার তেজস্বিতা এদেশ প্রসিদ্ধ। তাঁহার সময়ে বিবাহ সভায় উপস্থিত সমাজের প্রধান ব্যক্তির কণ্ঠে মালা দেওয়ার প্রথা ছিল। সমাজে কে বড়, কে ছোট, কাহার কুলে কি দোষ সমস্তই সেকালের ঘটকগণ অবগত ছিলেন এবং সভায় তাঁহারাই বিচার করিতেন, কিন্তু রাজনারায়ণের ন্যায় তেজস্বী উচিতবক্তা ঘটক অতি অল্পই দেখা যাইত। নড়াইলের জমিদার বাড়ীতে বিবাহ, তখন রামরতন বাবু (যাহার নামে রতনগঞ্জ হইয়াছে) জীবিত। সভায় কড়োরার মিত্রগোষ্ঠীয় কেহ উপস্থিত ছিলেন। কড়োরার মিত্র গোষ্ঠীপতি মৌলিক। তখনকার দিনে ইহাঁদের সম্মান কুলীন অপেক্ষাও বেশী ছিল কারণ ইহাঁরা কৌলীন্য মর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়াই গোষ্ঠীপতি মৌলিক হইতেন। যাহা হউক রতনবাবুর বাড়ীতে বিবাহ, বহু ঘটকের সমাবেশ হইয়াছে। রাজনারায়ণও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন কিন্তু তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এদিকে অন্যান্য ঘটকগণ রতনবাবুকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হন নাই। তিনিই মালার উপযুক্ত এই মত ব্যক্ত করিলেন। বংশ মর্য্যাদা হিসাবে কড়োরার মিত্র থাকিতে রতন বাবু মালা পাইতে পারেন না। সভাস্থ অনেকেই বুঝিতে পারিলেন কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। এই সময় রাজনারায়ণ মিত্র সভায় উপস্থিত

হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনেকের আশা হইল এবার ন্যায় বিচার হইবে। তখন তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা হইল এবং অন্যান্য ঘটকগণের মতও ব্যক্ত করা হইল। তিনি ঘটকদের পক্ষপাতিতায় ক্রোধান্ধ হইয়া এবং সভায় দাঁতিয়ার মিত্র উপস্থিত থাকিতে রতনবাবুর গলে মালা দেওয়া দেখিয়া অশ্লীল ভাষায় স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দেন; তাহা শুনিয়া চারিদিকে হাততালি পড়িল, কিন্তু তাঁহার প্রাণে ভয় হইল, রতনবাবুর বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, এজন্য হয়ত তাহাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে। তিনি রাজদ্বারে তেজস্বী হইলেও এ সময়ে কি করা উচিত বুঝিতে না পারিয়া অন্যের অগোচরে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। রাত্রে তাহাকে অনেক খোঁজ করা হইল, কিন্তু কোথায়ও পাওয়া গেল না, পরদিন সকালে পাশের গ্রামের এক আত্মীয় বাড়ী হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া রতন বাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। রতন বাবু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই, আপনি উচিত কথাই বলিয়াছেন। আপনার পাণ্ডিত্য এবং তেজস্বিতায় আমি সন্তোষলাভ করিয়াছি এজন্য আপনাকে একশত টাকা পুরস্কার দিতেছি।

দুর্গারামের দুই পুত্র, মুনিরাম এবং গঙ্গানারায়ণ, গঙ্গানারায়ণের পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার এক মাত্র কন্যা। মাঠের বাড়ীর কৈলাসনাথ মজুমদার গঙ্গানারায়ণের দৌহিত্র।

মুনিরামের দুই পুত্র, কৃষ্ণহরি এবং চূড়ামণি। কৃষ্ণহরি কবিরাজ ছিলেন। ইঁহাদের কাহারও পুত্রসন্তান ছিল না, দুই ভ্রাতার কয়েকটী কন্যা ছিল মাত্র। কৃষ্ণহরির এক কন্যার বিবাহ হয় ডাক্তার যদুনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্ন কুমারের সহিত, কিন্তু কন্যা জামাতা উভয়েই অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বাড়ীতে ৺হরিনাথ বসু তাঁহার গুরুদেব শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত চক্রবর্ত্তীকে বসতি করাইয়াছেন।

জয়নারায়ণের পৌত্র গিরিধরের চারি পুত্র—রজনী, কেদার, অম্বিকা, কুঞ্জবিহারী। রজনীর পুত্রগণ মামাবাড়ী নড়াইলের অন্তর্গত কাসিয়াড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। রজনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রসময় মিত্র সৈদপুর D. T. S. আফিসের চিফ্ ক্লার্ক ছিলেন, বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কেদারনাথের তিন পুত্র। নগেন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথ রেল-বিভাগে চাকরী করিতেছেন, জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অম্বিকাচরণ প্রায় ১৫ বৎসর পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করেন। তাঁহার এক পুত্র বৈদ্যনাথ।

গিরিধরের কনিষ্ঠ পুত্র কুঞ্জবিহারী বর্ত্তমানে কাশীবাসী, ইহাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জীবনী সংগ্রহে দেওয়া হইল।

মুক্তারাম মিত্রের ৩য় পুত্র অযোধ্যারাম; অযোধ্যারামের পুত্র রামসুন্দর এবং কমলাকান্ত। রামসুন্দরের বংশধর ভুগিলহাট পাইক-পাড়ায় বাস করিতেছেন। কমলাকান্তের দুই পুত্র, স্বরূপ এবং তিলক। স্বরূপের দুই পুত্র গোবিন্দ ও উমাচরণ। গোবিন্দের পুত্র সতীশ রাংদিয়া গ্রামে মাতুল সম্পত্তি পাইয়া বাস করিতেছেন। উমাচরণের তিন পুত্রের মধ্যে অক্ষয় বর্ত্তমান; তিনি রেলবিভাগে কাজ করিতেছেন।

তিলকের পুত্র পিয়ারীমোহন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কায়স্থ সমাজের নেতৃত্ব করিতেন। তাঁহার চারিপুত্র—গোপাল, নেপাল, রাখাল, ভূপাল। জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম মৃত, গোপালের পুত্র সন্তান নাই, নেপালের পুত্র মাতুলালয়ে মৌভোগ গ্রামে বাস করিতেছেন, রাখাল ও ভূপাল জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেছেন।

ঘটক রাজনারায়ণের প্রপৌত্র বসন্তকুমার বহুকাল পর্য্যন্ত রেলবিভাগে কর্ম্ম করিয়া বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ীতেই আছেন। তিনি ইং ১৮৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন, শৈশবে পিতৃহীন হন, ইং ১৮৭৯ সালে দৌলতপুর স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পরে মোক্তারী পড়িয়া পাশ করেন কিন্তু অধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইবে বলিয়া কখনও সে ব্যবসা করেন নাই। ৺গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে সৈদপুর লোকোমোটিভ আফিসে সামান্য কেরাণীগিরির কার্য্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু দক্ষতাগুণে তিনি উত্তরকালে ষ্টোর কিপারের পদে উন্নীত হন, ইং ১৯১৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুশীল।

---

(২)

টেকা সমাজ।

বসুমিত্র পাড়ায় আর দুই ঘর মিত্র আছেন। ইহাঁরা কলিকাতার নিকটস্থ টেকা সমাজভুক্ত পালপাড়ার মিত্র, ইহারাও মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো কুলীন; উভয় বাড়ীর মিত্র জ্ঞাতি হইলেও ২ জনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এখানে আসেন। বোধ হয় রামেশ্বর মিত্র নামে এক ব্যক্তি প্রথম পালপাড়া হইতে এইগ্রামে আগমন করেন। তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ দুর্গাচরণ ও কুঞ্জবিহারী দুই ভ্রাতার মধ্যে কুঞ্জবিহারি বর্ত্তমান। দুর্গাচরণের পুত্র রাখাল ঢাকা জেনেরাল ফোরম্যান আফিসে কাজ করিতেছেন।

রামেশ্বরের অন্য ভ্রাতা হইতে মহেশ্বর ঘোষের বংশধরগণের প্রতিবেশী নবীন মিত্রের বংশ চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বংশের বৃদ্ধি নাই। নবীনের তিন পুত্র, মহিম, চন্দ্র এবং উমাচরণ; ইহাদের মধ্যে চন্দ্রের একমাত্র পুত্র তারক বর্ত্তমান।

মহেশ্বর ঘোষের জনৈক বংশধরের থোড়কুচ্‌কুচি এবং চঞ্চলবাহিনী নামে দুইকন্যা ছিল। নবীন মিত্রের পূর্ব্বপুরুষ কেহ পালপাড়া হইতে

আসিয়া থোড়্কুচ্কুচিকে বিবাহ করিয়া শ্বশুর প্রদত্ত জমীতে বসতি করেন। চঞ্চলবাহিনীর বিবাহ হয় গুস্তরায়ের বাড়ীতে। ঐ বাড়ী নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে উহা চৌধুরী বাড়ী নামে খ্যাত।

উক্ত মিত্র বাড়ীর এক কন্যাকে বিবাহ করেন জঙ্গল বাদাল নিবাসী শিবচন্দ্র ঘোষ। ইনি আকৃনা সমাজ ভুক্ত মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো কুলীন, নারায়ণের সন্তান। শিবচন্দ্রের এক পুত্র নীলকমল মিত্র বাড়ীর এক-অংশ লইয়া এখানে বাস করেন; নীলকমলের দুই পুত্র, মণিকান্ত এবং শ্রীকান্ত; মণিকান্তের তিন পুত্র, সতীশ, মতি ও ধীরেন্দ্র। শ্রীকান্তের পুত্র কৈলাস চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত।

পূর্ব্বপাড়ার কেদার নাথ ঘোষের পৌত্রগণ এই ঘোষ বংশের জ্ঞাতি, কিন্তু তাঁহারা মজুমদারদের আত্মীয় এবং তাহাদের আশ্রিত হইয়া এখানে আসেন।

মুন্সী বংশ।

রায় বংশই মহেশ্বরপাশার মুন্সী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুনসীদিগের পূর্ব্বনিবাস ফরিদপুরের অন্তর্গত বাগ্ঝাপ গ্রাম, ইহাঁরা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণকিঙ্কর মুন্সী রাজারাম রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের দত্ত জমীতে বাস করিতে থাকেন। মহেশ্বরপাশা চাঁচড়া রাজার হস্ত হইতে হুগলীর সেলামদ্দি খাঁর জমিদারী ভুক্ত হইলে কৃষ্ণকিঙ্কর খাঁ সাহেবের তরফে দেওয়ান নিযুক্ত হন; কৃষ্ণকিঙ্করের অনেক কথা কালীবাড়ীর ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। মহেশ্বরপাশার বড় রাস্তা ভৈরব হইতে পশ্চিম-পাড়ার বিল পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা কৃষ্ণ কিঙ্করের নির্ম্মিত, তিনি রাধাবল্লভ

বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, এখনও ছয় সরিকে উহার সেবা করিয়া আসিতেছেন।

কৃষ্ণকিঙ্করের ৬ পুত্র—চন্দ্রনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ, রামজয়, রামদুলাল, নন্দকিশোর এবং রামলোচন। বর্ত্তমানে শেষোক্ত দুজনের বংশ নাই; চন্দ্রনারায়ণের ৫ পুত্রের মধ্যে গৌরগোবিন্দ; গোপালগোবিন্দ এবং লক্ষ্মীকান্তের বংশ বর্ত্তমান। গৌরগোবিন্দের পুত্র বিশ্বম্ভর এবং তাঁহার পুত্র রাইচরণ; বিশ্বম্ভর দীর্ঘজীবি ছিলেন, প্রায় শত বর্ষ বয়সেও যুবকের ন্যায় শক্তি ধারণ করিয়া খুলনায় পদব্রজে যাতায়াত করিতে পারিতেন। রাইচরণের শশধর প্রভৃতি ৫ পুত্র, কনিষ্ঠ ভুবন রেলে চাকরী করিতেছেন; শশধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষও রেলে চাকরী করেন।

গোপালগোবিন্দের পুত্র কেদার নাথ, কেদারনাথের গোপীনাথ প্রভৃতি ৬ পুত্রের মধ্যে বর্ত্তমানে ৪ জন জীবিত আছেন। কেদারনাথের ৪র্থ পুত্র হরিনাথ মুন্সী বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠাশালী। গোপালগোবিন্দের দৌহিত্র রসিক লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদের আশ্রিত হইয়া এখানে বাস করিতেছেন।

প্রতাপনারায়ণের দুই পুত্র নরহরি, গৌরহরি এবং এক কন্যা যমুনা। পুত্রদ্বয়ের বংশ নাই; যমুনাকে রামকিশোর মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র কালাচাঁদ, কালাচাঁদের পুত্র শশিভূষণ। শশিভূষণের পুত্র নরেন্দ্র বর্ত্তমান।

রামজয়ের অপর নাম রাজমুন্সী, তিনি অত্যন্ত বলশালী এবং পালোয়ান ছিলেন, তিনি এক সময়ে এক তেতুল গাছের এক প্রকাণ্ড ডাল টানিয়া ধরিয়া ছাগলকে তাহার পাতা খাওয়াইতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার সহিত কুস্তী করিবার জন্য অন্য দেশ হইতে এক পালোয়ান আসে, এবং তাঁহার নিকট রাজমুন্সীর কথা জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলিলেন আমি তাঁহার চাকর তুমি এই ডাল খানি ধর আমি তাহাকে

ডাকিয়া দিতেছি, পালোয়ান ডাল ধরিলে রামজয় তাহা ছাড়িয়া দিলেন। পালোয়ানকে লইয়া ডাল বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গেল, তখন পালোয়ান লজ্জা পাইয়া পলায়ন করিল।

রাজমুন্সীর ব্রজকিশোর ইত্যাদি ৬ পুত্রের মধ্যে ব্রজকিশোরের বংশ বর্ত্তমান। ব্রজকিশোরের রাধাচরণ প্রভৃতি ৬ পুত্র, রাধাচরণের দুই পুত্র। শ্রীনাথের পুত্র কালিদাস বর্ত্তমান।

গৌরকিশোরের পুত্র নিত্যানন্দ ও চন্দ্র, তাহাদের বংশ নাই। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি ৬ কন্যার মধ্যে এক জনকে সেনহাটির রামপ্রাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করিয়া এখানে বাস করেন। রামপ্রাণের পুত্র বিহারীলাল, বিহারীলালের দুই পুত্র নীলমাধব ও বিজয়, বিজয় দারজিলিং পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে আড়াই শত টাকা বেতনে এষ্টিমেটরের কার্য্য করিতেছেন।

রামদুলালের পুত্র চৈতন্যহরি, তাঁহার পুত্র গঙ্গানারায়ণ; গঙ্গানারায়ণের তিন পুত্র—নীলমণি, রাসবিহারী, অমৃতলাল। নীলমণি নিঃসন্তান, রাসবিহারীর পুত্র গোপাল অল্পবয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। অমৃতলালের পুত্র হরিপদ মুক্তীশ্বরী মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছেন, আর কাহারও বংশ নাই।

কৃষ্ণকিঙ্কর প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ বিগ্রহের চাঁচড়া রাজপ্রদত্ত বহু দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, উহার পরিমাণ প্রায় ৫০০ বিঘা, সুতরাং এক সময়ে গ্রামে মুন্সীদের অবস্থা উন্নত ছিল, কিন্তু উপযুক্ত তায়দাদ দেখাইতে না পারায় সন ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট অধিকাংশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন। এই সময়ে অনেকের সম্পত্তি এইভাবে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।

৺কালীমাতার সেবাইত

পশ্চিমপাড়ার চক্রবর্ত্তী বংশ।

এই বংশের পূর্ব্বনিবাস গঙ্গাপার, ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ গোত্র। কামদেব অথবা তাঁহার পুত্র জনার্দ্দন এইখানে কে প্রথম আসেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইরূপ প্রবাদ জনার্দ্দন চাঁচড়া রাজবাড়ীতে থাকিতেন, রাজা শ্যামসুন্দর অনুমান ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মহেশ্বপাশার ৺কালীমাতার তত্ত্বাবধান করিতে জনার্দ্দনকে পাঠাইয়া দেন। জনার্দ্দন ৺কালীমাতার সেবাইত হন * কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাঁহার সেবা কাহার দ্বারা চলিত তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই বংশে জনার্দ্দনের অধস্তন ৮ম পুরুষ চলিতেছে।

জনার্দ্দনের পুত্র রামচন্দ্র; রামচন্দ্রের দুই পুত্র, রামহরি ও কৃষ্ণপ্রসাদ। কৃষ্ণপ্রসাদ ৺কালীবাড়ীর জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার বিবরণ ৺কালীবাড়ীর ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র দুর্গারাম এবং দুর্গারামের পুত্র হারানন্দ; হারানন্দের দুই পুত্র, যজ্ঞেশ্বর এবং শরৎ; যজ্ঞেশ্বরের পুত্র বৈদ্যনাথ মৃত, শরতের দুই পুত্র নিশিকান্ত এবং সত্যেন্দ্র বর্ত্তমান।

রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামহরির দুই পুত্র, গৌরমোহন ও মৃত্যুঞ্জয়; মৃত্যুঞ্জয় সাধক ছিলেন, তিনি ৺কালীমাতার পূজা করিতেন।

৺কালীমন্দিরে বেদীর সম্মুখে ঘটের ধারে একটী গর্ত্ত ছিল এবং এখনও আছে; তিনি প্রতিদিন মাটি দিয়া গর্ত্তটী বুঁজাইতেন, এবং পরদিন

* বাং ১১৯৯ সালে জনার্দ্দনের অন্যতর পৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী যশোহর কালেক্টরীতে যে দরখাস্ত করিতেছেন তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন, ৩ পুরুষ ধরিয়া ৺কালীমাতার সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার উক্তি অনুসারে জনার্দ্দনই প্রথম মহেশ্বরপাশায় আসিয়া ৺কালীমাতার সেবাইত নিযুক্ত হন।



কালীবাড়ীর দীঘি। পৃষ্ঠা ৬৭

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।

দেখিতেন, পূর্ব্ববৎ গর্ত্ত হইয়া আছে, একদিন গর্ত্তে হাত দিয়া উহা বুঁজাইবার সময় এক কালসর্প তাঁহার অঙ্গুলীতে দংশন করে, এই সংবাদ তীরবেগে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। গ্রামের সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া ওঝা ডাকার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ওঝা ডাকিতে দিলেন না। তিনি সর্ব্বদা ৬কালীমাতাকে 'হারামজাদি' 'গুখেগোর বেটি' ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং গালি দিতেন, আজও তিনি বলিলেন, 'হারামজাদি' আমাকে খাবি, আচ্ছা খা। আজ তোর উপবাসী থাক্‌তে হবে. দেখি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী নহিলে তোর ভোগ কে দেয়!" এই বলিয়া তিনি এক বাটী জলের মধ্যে অঙ্গুলী ডুবাইয়া বসিয়া রহিলেন। ইহা সকালবেলার ঘটনা, অপরাহ্ন ৩টার সময় আপনা হইতে তাঁহার বিষ সহ্য হইয়া গেল। তখন উঠিয়া তিনি ৬কালীমাতার পূজা করেন এবং ভোগ দেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল দক্ষিণা। এক সময়ে ৬কালীবাড়ীর দীঘির * উত্তরের রাস্তা দিয়া এক শাঁখারী যাইতেছিল, তখন একটী বালিকা আসিয়া বলিল, "আমার হাতে শাঁখা পরিয়ে দাও," শাঁখারী জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁখার দাম দেবে কে?" বালিকা উত্তর করিল "আমার বাবা মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী ৬কালীবাড়ীর পুরোহিত, কালীবাড়ী যাইয়া তাঁহার নিকট হইতে দাম চাহিয়া লও।"

---

* এই দীর্ঘিকা ৬কৃষ্ণকিঙ্কর মুন্সীর খনিত বলিয়া প্রকাশ। বহুকাল হাজিবন এবং শৈবালদামে অব্যবহার্য্য ছিল। ৬কালীবর ভট্টাচার্য্য এই দীর্ঘিকার পঙ্কোদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন। তৎপরে ৬কেদারনাথ মজুমদারেরও এইরূপ ইচ্ছা ছিল কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি ইহার দখল পান নাই। জ্যেষ্ঠের অভিলাষ স্মরণ করিয়া রায় সাহেব শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার বহু চেষ্টায় এবং অর্থ ব্যয়ে দখল লইয়া জেলা বোর্ডের হস্তে দেন। তৎপরে জেলা বোর্ড কর্তৃক ইহা পুনরায় খনিত হইয়াছে।

ইহাতে শাঁখারী একটু ইতস্ততঃ করিতেছে, তাহা দেখিয়া বালিকা পুনরায় বলিল—"৺কালীবাড়ীতে বাবার দেখা যদি না পাও,তবে পশ্চিম-পাড়ায় আমাদের বাড়ীতে যাইয়া বলিও, পশ্চিমের ঘরে শিকার উপর হাঁড়িতে আড়াইটা টাকা আছে সেই টাকা তোমাকে দিবেন," বালিকার এই কথায় শাঁখারীর মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না, কিন্তু সে ৺কালীবাড়ী যাইয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই, দরজা বন্ধ, তখন খুঁজিতে খুঁজিতে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তীর বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে শাঁখার দামের কথা বলিল। মৃত্যুঞ্জয় কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল 'আমি শাঁখা পরিতে যাব কেন, আর একলা ৺কালীবাড়ীতেই বা কখন গেলাম।' শাঁখারী হাঁড়ির ভিতর টাকার কথা বলিলে তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার যেরূপ স্বভাব ৺কালীকে গালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন "ওরে হারামজাদি ! আমি আজন্ম তোর সেবা ক'রে আসিতেছি, তুই আমাকে দেখা দিতে পারিলি না, দেখা দিলি কি না এক বেটা শাঁখারীকে !" শাঁখারীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'যা বেটা তোর জন্ম সার্থক্।' এই কথা শুনিয়া শাঁখারী 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'মা তোমার অসীম দয়া। তুমি আমায় দেখা দিলে কিন্তু আমি অধম পাতকী, দেখা পেয়েও তোমায় চিনিতে পারিলাম না।'

গৌরমোহনের ৭ পুত্রের মধ্যে ৬ জন অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। পার্ব্বতীর ৫ পুত্র রজনী, গোপাল, নেপাল, উপেন্দ্র ও চন্দ্র। রজনীকান্ত নানাবিধ ক্রিয়াকলাপে দক্ষ ছিলেন, তিনি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিতেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার অধিকার ছিল। তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রনাথ দৌলতপুর স্কুলে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন, তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ সাহসী ধর্ম্মভীরু এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়ায় লিটারেট কনষ্টেবলের পদ হইতে এসিষ্ট্যাণ্ট সাবইন্‌স্পেক্টারের পদে উন্নীত হন। গত ১৩২৬ সালের

ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তের সময় লক্ষ্মীপাশার থানায় অবস্থানকালে ভগবৎকৃপায় বহু বিপন্ন লোকের জীবনদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ঝটিকাবর্ত্তের সময় নদীগর্ভ হইতে নিমজ্জিত শিশু ও নারীকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যকলাপ কর্তৃপক্ষের গোচর হইলে পুরস্কারস্বরূপ পুলিশের মহাগৌরবের King's Medal পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। পুলিশ বিভাগে ১২ বৎসর চাকরী করিয়া শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

এই বংশের দৌহিত্র রামভদ্র সিদ্ধান্ত অধ্যাপক ছিলেন এবং এখানে এক চতুষ্পাঠী করেন। এই বংশে বিবাহ করিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে উগ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পুত্রগণ ভূপেন্দ্রাদি বর্ত্তমান।

করাতিয়ার ঘোষ বংশ।

এই বংশীয়গণ মহেশ্বরপাশার উত্তরপাড়ায় বাস করিতেছেন। ইঁহারা গোষ্ঠীপতি মৌলিক, ইহাদের কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের জ্ঞাতিগণ কুলীন বলিয়া পরিচিত। এই বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ সমগ্র কায়স্থের একজাই এর সময় কৌলীন্য ত্যাগ করিয়া গোষ্ঠীপতি মৌলিক হন, সেজন্য এক সময়ে ইঁহারা কুলীন অপেক্ষাও অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস হুগলীর অন্তর্গত করাতিয়া গ্রাম।

এই বংশের রূপরাম ঘোষ প্রথম এইখানে আসেন, বর্ত্তমানে তাঁহার অধস্তন ৯ম পুরুষ চলিতেছে।

রূপরাম কোন্‌সূত্রে এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, এইরূপ প্রবাদ গ্রাম বাসের উপযুক্ত হইলে মহেশ্বর

ঘোষ বা তাঁহার পুত্র নীলকমল প্রজাস্থাপনের জন্য দেশ হইতে রূপরামকে লইয়া আসেন।

রূপরামের পুত্র রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র রামানন্দ এবং রামকিশোর। রামানন্দের পুত্র রামবিষ্ণু, রামবিষ্ণুর দুই পুত্র রামজয় এবং কৃষ্ণচন্দ্র ; রামজয়ের তিন পুত্র—সদানন্দ, গৌর এবং রঘুমণি।

সদানন্দের পুত্র পরেশ নাথ বাল্যকাল হইতে স্ত্রীর মাতুলালয় ২৪ পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে বাস করেন এবং সেখানকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তিনি মাঝে মাঝে মহেশ্বরপাশায় আসিতেন। পরেশনাথের ৪ পুত্র—হরিচরণ, অতুল চন্দ্র, কিরণ চন্দ্র এবং হৃদয় নাথ, ইহাঁরা সকলেই কৃতী, দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে মহেশ্বরপাশার সহিত ইহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। হরিচরণ পাঠ সমাপনান্তে শ্যামনগর চট্‌কলে প্রবেশ করেন, অধ্যবসায় গুণে তিনি শীঘ্রই কলের ম্যানেজার হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন, উত্তরকালে তিনি নিজেও একটী কলের প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিছু জমিদারীও ক্রয় করেন। চট্‌কলের কার্য্যে তাঁহার এমনই দক্ষতা যে বৃদ্ধ বয়সেও যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে কয়েকটী কলের অধ্যক্ষতা করিতে হয়, কলের ইউরোপীয় ম্যানেজারগণ তাঁহার পরামর্শের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হরিচরণ শ্যামনগর ন'পাড়ায় বাড়ী করিয়াছেন। দারোগার দীঘি নামে তাঁহাদের যে প্রকাণ্ড জলাশয় হাজিবন এবং শৈবাল দামে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহার পঙ্কোদ্ধার মানসে তিনি গত ১৩৩৩ সালে ৪৮ বৎসর পরে মহেশ্বরপাশা গ্রামে পদার্পণ করেন, এবং পর বৎসর খনন করাইবেন এই আশায় প্রায় দুই হাজার টাকা ব্যয়ে ইহা পরিষ্কার করেন। জলের উপর প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ঘাসে বহুস্থান আবৃত ছিল এবং অনেক স্থান হাজিবনে আচ্ছাদিত ছিল, ইহার উপর দিয়া গাভীগণ অনায়াসে বিচরণ করিত। হরিচরণের এই সদুদ্দেশ্যের মূলে শ্রীযুত কালিদাস ঘোষের নামোল্লেখ

করা যাইতে পারে। প্রদীপের পলিতা উস্কাইবার ন্যায় তিনি কলিকাতা হইতে প্রায়ই হরিচরণের নিকট যাইয়া তাঁহার সদিচ্ছাকে জাগরূক রাখিয়াছিলেন, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘিকা সংস্কারের কার্য্য আর অগ্রসর হয় নাই। হরিচরণ নিজে অসুস্থ এবং তাহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা অকালে সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

অতুলচন্দ্র কলিকাতায় কন্‌ট্রাক্‌টরী করিয়া যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হইয়াছেন, বর্ত্তমানে তিনি ৺কাশীবাসী হইয়াছেন। কিরণচন্দ্র এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন, কলিকাতাতেই প্রাক্‌টিস্ করিতেছেন। হৃদয়নাথ পাটকলের আফিসে বড় কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁরা কলিকাতার বাসিন্দা হইয়া বাস করিতেছেন।

রামজয়ের মধ্যমপুত্র গৌর স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি দারোগা ছিলেন, তাঁহার প্রবল প্রতাপ ছিল এবং তিনি গ্রামে বহু কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, দারোগা ঘোষের বাড়ী, দারোগার দীঘি, শ্যামগঞ্জ পল্লীতে দারোগার হাট ইত্যাদি তাঁহার প্রসিদ্ধ নামে চলিয়া আসিতেছে।

তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটস্থ দীর্ঘিকা, যাহার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইল, দশ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, কিন্তু এই দীর্ঘিকা কত কালের এবং কাহার দ্বারা খনিত তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ইহা গৌর দারোগার অধিকারে ছিল এবং হরিচরণের ন্যায় বোধ হয় তিনি ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন, সেজন্য লোকে ইহাকে দারোগার দীঘি বলে, অন্যান্য অনেক স্থানের ন্যায় এই দীর্ঘিকা খানজাহান আলির কীর্ত্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

গৌর ঘোষ শ্যামগঞ্জে একটী হাট মিলাইয়াছিলেন, সেজন্য ইহাকে লোকে দারোগার হাট বলিয়া থাকে, প্রতি রবি এবং বৃহস্পতিবারে এই হাট বসে। কথিত আছে পূর্ব্বে এই হাট মীরেরডাঙ্গার রাস্তার মোড়ে ভৈরবের কুলে কালিকাতলায় (যেখানে আগমবাগীশ সিদ্ধ হন) ছিল,

এই হাটের স্থাপয়িতা মুন্‌সী বংশের প্রতাপনারায়ণ মুন্‌সীর পুত্র নরহরি মুন্‌সী।

দারোগার দুই পুত্র ছিলেন—শ্রীনাথ এবং অম্বিকানাথ, কিন্তু তাঁহারা অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রামজয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রঘুমণির পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তাঁহার দুই পুত্র, কেশব ও গোপাল। কেশব চট্‌কলের বড় কর্ম্মচারী।

রামবিষ্ণুর অপর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের চারি পুত্রের মধ্যে উমাকান্তের দুই পুত্র ত্রৈলোক্য এবং রাজেন্দ্র বর্ত্তমান।

রামগোবিন্দের অপর পুত্র রামকিশোরের ৩ পুত্র রামকিঙ্কর, রামপ্রসাদ এবং রামমোহন। রামমোহনের পুত্র রাজচন্দ্র, তাঁহার বংশ নাই। রামকিঙ্করের বংশে শশধর এবং রামপ্রসাদের বংশে বঙ্ক ও সতীশ বর্ত্তমান।

বসু বংশ
(১)
মজুমদারপাড়া।

মজুমদার বংশের "সাতঘরের" কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, "সাতঘরের অন্যতম প্রভুরামের পৌত্র রাধামোহন। রাধামোহনের এক ভগ্নীর বিবাহ হয় বিদ্যানন্দকাটির ভরতচন্দ্র বসুর সহিত। ইহাঁরা বিদ্যানন্দ-কাটীর সম্ভ্রান্ত পরিবার তেওজ ২য় পো কুলীন। পিয়ারীমোহন নামে ভরতচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করার পরে তিনি অল্প বয়সেই দেহ-ত্যাগ করেন। তাঁহার বিধবা সহধর্ম্মিণী শিশু পুত্রকে লইয়া অকুল পাথারে পড়েন, বিশেষতঃ তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল, তিনি পুত্রকে লইয়া

মহেশ্বরপাশায় আসিয়া ভ্রাতা রাধামোহনের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। পিয়ারীমোহন বালককালে লেখাপড়া শিখেন নাই পরন্তু মামার গরু চরাইতেন, এই সমস্ত গরু নীলচাষের ক্ষতি করিত। পিয়ারীমোহন একদিন গরু সহ নীলকর গোলডক্ সাহেবের নিকট নীত হন। সাহেব ভদ্রলোকের ছেলে দেখিয়া তাঁহাকে মুহুরীর জিম্মা করিয়া দেন। সেইখানে পিয়ারীমোহন লেখাপড়া এবং নীলকুঠীর কাজকর্ম্ম শিখেন এবং পরে তহশিলদার হন। সাহেব তাহাকে ভালবাসিতেন এবং সাহেবের অনুগ্রহে তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতি করেন।

পিয়ারীমোহনের ৪ বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী শান্তমণীর গর্ভে রাইমণি নাম্নী একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী অন্নপূর্ণার একমাত্র পুত্র প্রসন্নমোহন বসুমিত্রপাড়ার কৃষ্ণহরি মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করার পরেই কালগ্রাসে পতিত হন। তৃতীয়া রাইকিশোরীর গর্ভজাত সন্তান যদুনাথ, হরিনাথ। চতুর্থা স্ত্রী প্রসন্নকুমারীর গর্ভে প্রিয়নাথ এবং অধরনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

সোলমারী সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পিয়ারীমোহনের সময়েই অর্জ্জিত হয়। সন ১২৮৭ সালের ৬ই কার্ত্তিক তারিখে পিয়ারী মোহন ইহ সংসার ত্যাগ করেন।

পিয়ারীমোহনের বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাথ ইং ১৮৫৬ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

স্কুলের পাঠ সমাপনান্তে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ তিনি মেডিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সসম্মানে পাশ করিয়া বাহির হন। তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচন অনুসারে Medical jurisprudenceএ স্পেসাল ট্রেণিং লাভ করেন সেজন্য মহকুমা ডাক্তার খানার ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি ১৪ বৎসর কাল বাগেরহাটে বিশেষ গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়াছেন।

CamScanner

ইং ১৯১৮ সালে পেনসান লইয়া তিনি বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ চিকিৎসা ব্যবসা চালাইতে পারেন না বটে কিন্তু এখনও তিনি যুবকের ন্যায় উত্তম লইয়া গ্রামের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। তিনি নিজ বাড়ীতে ১৯২১ সালে যদুনাথ হরিনাথ দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠান ম্যালেরিয়া নিবারণী ও স্বাস্থ্য সমবায় সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে।

যদুনাথের তিন পুত্রের মধ্যে এইক্ষণে দুইজন, বিজয় ও কিরণ বর্ত্তমান, সুশীল অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যদুনাথের অনুজ হরিনাথ বাবু গ্রামের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার জীবনী জীবনীসংগ্রহে আলোচিত হইবে। হরিনাথের দুই পুত্র, শৈলেন্দ্র নাথ বি, এ, পাশ করিয়া বি, এল, পড়িতেছেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ বি, এ, পাশ করিয়া এম্, এ, পড়িতেছেন। ইহাঁরা খুলনার বাড়ীতে বাস করেন।

পিয়ারী মোহনের চতুর্থা স্ত্রী প্রসন্নকুমারীর গর্ভজাত সন্তান প্রিয়নাথ এবং অধরনাথ। অধরনাথ পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর ছিলেন। তিনি ১৩১৪ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় পুরীধামে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী পতিবিয়োগে অধীরা হইয়া সেই সময়েই অহিফেন সেবনে স্বামীর অনুগমন করেন।

প্রিয়নাথ ইং ১৯২০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে দেহত্যাগ করেন। প্রিয়নাথের দুই পুত্র রমেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র অকালে পিতার অনুগমন করিয়াছেন। রমেন্দ্রের পুত্রকন্যাগণও এক এক করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; ধীরেন্দ্রর দুই পুত্র, এক কন্যা বর্ত্তমান।

———



ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদু নাথ বসু এল্, এম্, পি।
(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

(২)

বসুমিত্র পাড়া।

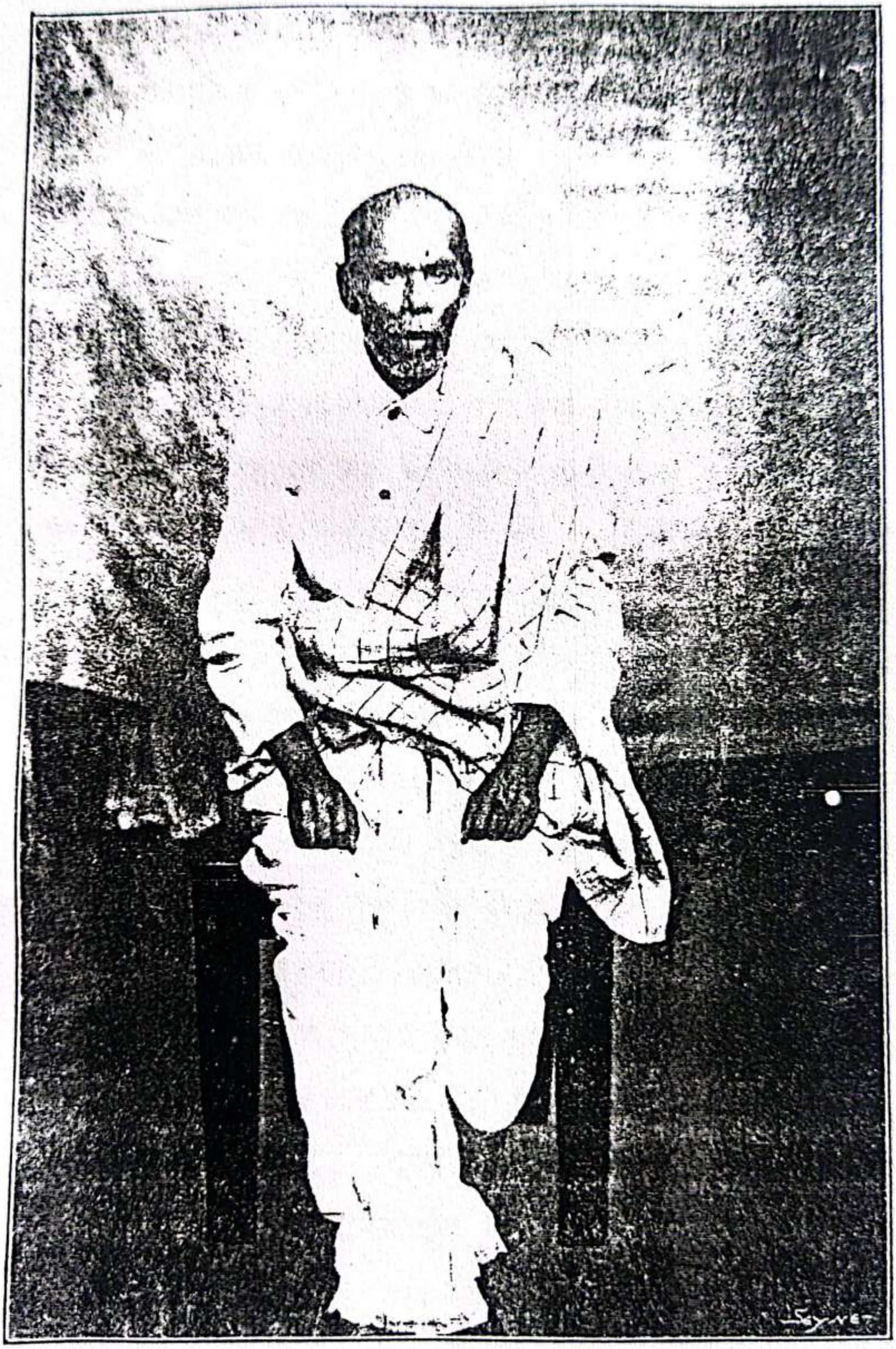
বসুমিত্রপাড়ার বসুবংশ মাহীনগর সমাজভুক্ত। ইঁহারা মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো কুলীন, ৺বাঁশীরাম বসুর সন্তান। কায়স্থ কুলীনের ৬টী প্রধান সমাজের মধ্যে মাহীনগর অন্যতম (অপর - বাগণ্ডা, আকনা, বালী, টেকা এবং বড়িশা)। এক সময় মাহীনগর সামাজিকগণের নিকট তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ এখানে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের তিনবার একজাই হয়। মাহীনগরের পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গার স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেলে এক সময়ে জ্বররোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়. তখন বসুবংশীয়দের মধ্যে অনেকেই স্থানত্যাগ করেন, কেহ কেহ যশোহরের অন্তর্গত ডোঙ্গাঘাটায় আসিয়া বাস করেন। বসুমিত্রপাড়ার বসু এই ডোঙ্গাঘাটা হইতে মহেশ্বরপাশায় আনীত হন, সেজন্য ইঁহারা ডোঙ্গাঘাটার বসু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু এখানে কে প্রথম আসেন তাহা জানা যায় না, সম্ভবতঃ সহস্ররাম বসু করাতিয়া ঘোষবংশের রামগোবিন্দ ঘোষের পুত্রগণ কর্ত্তৃক এই স্থানে আনীত হন, বর্ত্তমানে সহস্ররামের অধস্তন ৭ম পুরুষ চলিতেছে।

সহস্ররামের তিন পুত্র—গুরুপ্রসাদ, রঘুনাথ, মনোহর ; মনোহরের বংশ নাই, গুরুপ্রসাদের দুই পুত্র - ভবানীপ্রসাদ এবং গঙ্গাপ্রসাদ। গঙ্গাপ্রসাদের বংশ যশোহরের অন্তর্গত বাশগাঁ গ্রামে বাস করিতেছেন। ভবানীপ্রসাদের পুত্র দেবীপ্রসাদ এবং তাঁহার পুত্র উমেশচন্দ্র, তিনি অত্যন্ত পরোপকারী, বিনয়ী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। উমেশচন্দ্রের ৭ পুত্র— ইন্দুভূষণ, শশিভূষণ, বঙ্কবিহারী, শরৎচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, জিতেন্দ্রনাথ, মধ্যম এবং ৬ষ্ঠ অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহারা অনেকেই রেলবিভাগে চাকরী করিতেছেন। ইন্দুভূষণের ৩ পুত্রের

মধ্যে জ্যেষ্ঠ কালিদাস দৌলতপুর কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

রঘুনাথের পুত্র নীলমণি; নীলমণির দুই পুত্র—শীতলচন্দ্র ও নিবারণ চন্দ্র। শীতল ঠাকুর বাবুদের মধ্যে পাতলিয়াদহ পরগণায় চাকরী করিতেন, তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় অপরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিবারণ চন্দ্রের প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি সত্ত্বেও নানাকারণে তিনি সামান্য ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভিন্ন লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, তাঁহার মাতা দয়াদাক্ষিণ্যাদি নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিতা ছিলেন এবং এজন্য পল্লী মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। মাতার সদ্‌গুণে পুত্রের জীবন উত্তরকালে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাঁহার জীবনী আলোচনার যোগ্য।

নিবারণচন্দ্র প্রথম জীবনে সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেটের দৌলতপুর কাছারীতে নায়েবী করেন। এসময়ে তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল কিন্তু তিনি কখনও ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেন না। দান, পরোপকার, অতিথি-সৎকার, লৌকিকতা ইত্যাদিতে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, এজন্য পরবর্ত্তীকালে তাহাকে যথেষ্ট অর্থকষ্ট পাইতে হইয়াছে। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের দুরভিসন্ধির ফলে নিবারণচন্দ্রের চাকরী যায়, এবং বাস্তবিক এখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে কিন্তু তিনি ঈশ্বরে অত্যন্ত বিশ্বাস পরায়ণ ছিলেন; এই নিদারুণ অর্থকষ্টের জন্য তাঁহাকে কোনদিন কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত, দুঃখিত বা বিরক্ত হইতে দেখা যায় নাই। দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি বহুপোষক ছিলেন এবং বহু স্কুল কলেজের ছাত্রকে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইয়া অন্নদান করিতেন। এস্থলে নিবারণচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী বসন্তকুমারীর সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তেমন আদর্শ গৃহিণী বর্ত্তমানে মহেশ্বরপাশা গ্রামে বোধ হয় একজনও পাওয়া যাইবে না। সংসারে আর দ্বিতীয় লোক ছিল না, সংসারের সমস্ত কার্য্য তাহাকে একাকী করিতে



স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র বসু।

(গ্রন্থকারের "প্রভাবতী কাব্য" হইতে গৃহীত)

হইত। ভোর হইতে রাত্রি ১০/১১টা পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত কার্য্য সম্প করিয়া যখন দেহ স্বভাবতই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন গৃহে পাঁচজ অতিথি উপস্থিত হইলে বিরক্তিশূন্য চিত্তে তাহাদের সেবা করিয়াছেন তিনি জানিতেন অতিথি যে কোন সময়ে গৃহে উপস্থিত হউন না কেন তাহার সেবা করা স্বামীর অভিপ্রেত এবং সেই জন্য দ্বিধাশূন্য চিত্তে তিনি স্বামীর অনুগমন করিতেন. তাঁহার আর একটী গুণ ছিল ; রন্ধনকার্যে দক্ষতায় স্ত্রীলোকের কৃতিত্ব কিছু নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাতে আমরা যাহ দেখিয়াছি তাহা সেকালে বিরল না হইলেও বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় না কায়স্থ সমাজে বহুলোকের নিমন্ত্রণের ভোজ্য রন্ধন করিতে পাড়ার মধে তাঁহার ন্যায় আর কেহই পারিতেন না, তাঁহাকে যখন জরায় আক্রম করিয়াছে, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার বিশেষ সামর্থ্য নাই তখনও তিনি যথাস্থানে বসিয়া এরূপ বৃহৎ কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু শুধু ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব নহে, তাঁহার আদ্যন্ত সমস্ত ব্যঞ্জনে এমন এক স্বতার সমভাবে বিরাজ করিত, যাহা অন্যত্র দুর্লভ, তাই ১৩০৪ সনের ২১শে চৈত্র যখন তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করেন, তখন তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন নাই এরূপ লোক পাড়ায় কেহই ছিলেন না।

সময় মন্দ হইলে আপনার জনও শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ইহা অত্যন্ত সত্য কথা এবং ইহা নিবারণচন্দ্রের জীবনে বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। সেজন্য নিবারণচন্দ্রের জীবনীতে শিক্ষার যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায়। এক সময়ে তিনি জনৈক গ্রামবাসীর নিকট হইতে দলিল দিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ করিতে যায়েন। খুলনায় রেজেষ্টরী হইয়া গেলে দলিল উত্তমর্ণকে দেন, কথা হইল তিনি বাড়ী যাইয়া টাকা দিবেন। নিবারণচন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। ইত্যবসরে এক গ্রামবাসী উক্ত উত্তমর্ণকে পরামর্শ দিয়া নিবারণচন্দ্রকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন অথচ এই

ব্যক্তি নিবারণচন্দ্রের শত্রু ছিলেন না এবং বৈষয়িক ব্যাপারে নিবারণচন্দ্র-হইতে জীবনে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হৌক দলিল রেজেষ্টরী করিয়া দিয়াও নিবারণচন্দ্র টাকা পাইলেন না, পরন্ত দলিল সরলান্তঃকরণ নির্দ্দোষীকে পীড়ন করিবার জন্য উত্তমর্ণের নিকটই রহিয়া গেল। কিন্তু তিনি ইহাতেও বিচলিত হইলেন না অথবা ইহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করিলেন না। তিনি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি বৈষয়িক কর্ম্মে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। বৈষয়িক কার্য্যে তাঁহার নিকট মহেশ্বরপাশা এবং খালিস্পুর পরগণার প্রত্যেক বৈষয়িক লোকের পরামর্শ লইতে হইত। বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে উক্ত উত্তমর্ণ এক সময়ে বিপদাপন্ন হইয়া নিবারণচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়, কাহার পরামর্শ মত সে এইরূপ কার্য্য করিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া বলে এবং দলিল ফিরাইয়া দেয়। যাহা হৌক নিবারণ চন্দ্র তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

খুলনার অনেক প্রতিপত্তিশালী উকিল একসময়ে নিবারণ চন্দ্রের নিকট হইতে পরামর্শ লইতেন এবং তাঁহার জন্য উত্তরকালে অনেকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, নিবারণচন্দ্রের এইরূপ প্রখর বিষয় বুদ্ধি ছিল। গ্রামের মধ্যে সমাজ করিতে, বিবাদ ও মামলা মিটাইতে, সালিসী করিতে তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং গ্রামের ইতর ভদ্র অনেকেই তাহাকে এই সমস্ত কার্য্যে ডাকিতেন এবং বিশেষ সম্মান করিতেন।

নিবারণচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল এবং তিনি দলিলাদির মুসাবিদা করিতে তৎকালে এতদ্দেশে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেণী সাহেবের সম্পত্তি যখন নড়াইলের বাবুরা কবলা করিয়া লয়েন, তখন ইংরাজী দলিলের সহিত একখানি বাংলা দলিলও গাঁথিয়া দিতে হইয়াছিল, সে বাংলা দলিলখানি নিবারণচন্দ্র লিখিয়াছিলেন। সে বহুমূল্যবান দলিলে রেখাপাত করিতে অনেকেই সাহসী হয়েন নাই।

দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল, তিনি সকালে শিবপূজা না করিয়া অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি প্রতিদিন সকালে শিবপূজা করিতে বসিতেন, পূজা সমাপনান্তে উঠিয়া দেখিতেন তাঁহার বৈঠকখানা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। কেহ মোকদ্দমার তদ্বির করিতে আসিয়াছে, কেহ কোন জটিল বিষয়ের পরামর্শ লইতে আসিয়াছে, কেহ তাহার বিপক্ষকে লইয়া বিবাদ মিটাইতে আসিয়াছে, এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান নিবারণচন্দ্রের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল।

নিবারণ চন্দ্রের মধ্যে কবিত্বশক্তিও ছিল, তিনি একখানি শনির পাঁচালী প্রণয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

নিবারণচন্দ্রের দুই বিবাহ, বসন্তকুমারী তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী, সেনহাটীর সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশের কন্যা। এই স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতেই তিনি পুনরায় অনিচ্ছাসত্ত্বে মাতার অভিপ্রায়ানুসারে হিদাবাসুয়াড়ীর বিখ্যাত মিত্রবংশে উত্তমকুমারীকে বিবাহ করেন। উত্তমকুমারীর গর্ভে দুই পুত্র এবং ৩ কন্যা জন্মগ্রহণের পর তিনি কলেরা রোগে অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। যতদিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন বসন্তকুমারীকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মান্য করিয়াছেন এবং দুইজনের মধ্যে একদিনের জন্যও কখনও মনোমালিন্য উপস্থিত হয় নাই। দুই সপত্নী দুই সহোদরার ন্যায় নিবারণচন্দ্রের সংসারকে শান্তির আগার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৩১৭ সালের চৈত্রমাসে নিবারণচন্দ্র অন্ত্রাবরোধ রোগে (Intestinal obstruction) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাস্পাতালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছয় পুত্র এবং দুই কন্যা রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব লাল মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের এষ্টেটে মহাফেসের (Record keeper) কার্য্য করিতেছেন; মধ্যম উপেন্দ্রচন্দ্র বি, এন্, রেলে ষ্টেশন মাষ্টার্ তাঁহার জেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্র ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন,

মধ্যম সুধীর রেলবিভাগে কাজ করেন, ৩য় শ্রীশচন্দ্র ডাক বিভাগে কার্য্য করিতেন, গত ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অকালে দেহত্যাগ করেন; ৪র্থ সতীশ-চন্দ্র গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র, ভারত গবর্ণমেণ্টের রেকর্ডস্ আফিসে ২৬০৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেছেন; ৫ম অশ্বিনীকুমার ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন কিন্তু দুর্জ্জয় অজীর্ণরোগ তাঁহার পাঠ্যজীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, তিনি বর্ত্তমানে পূর্ণিয়ার মহকুমা আরারিয়ায় ওকালতী করিতেছেন; ৬ষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ নিবারণচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ছিলেন কিন্তু তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই কালকবলিত হইয়াছেন। নিবারণ চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র এই পুস্তকের গ্রন্থকার।

মঙ্গলপেতে ঘোষ বংশ।

এই ঘোষবংশ বসুমিত্র পাড়ায় বাস করিতেছেন। ইঁহারা আ—না সমাজভুক্ত তেওজ ২য় পো কুলীন। এক সময়ে ইহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাদের দৈন্যাবস্থা।

মঙ্গলপেতে যশোহর ঝিনাইদহ লাইনের একটি ষ্টেশন; নিকটেই মঙ্গলপেতে গ্রাম। সেখানে ইহাদের বহু গোষ্ঠীর বাস। কাশীনাথ নামক এই বংশের এক ব্যক্তি কার্য্যোপলক্ষে মহেশ্বরপাশায় আসিয়া ৺রাইচরণ মজুমদারের কোন পূর্ব্ব পুরুষের কন্যাকে বিবাহ করেন। স্ত্রীকে লইয়া কাশীনাথ বাড়ী গমন করেন কিন্তু তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, অজ্ঞাত মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া বাড়ী হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। কাশীনাথ পুনরায় স্ত্রীকে লইয়া মহেশ্বরপাশায় আসিয়া এই পাড়াতে বাস করিতে থাকেন, কাশীনাথের পুত্র বা পৌত্র কে এবং ক' পুরুষ চলিতেছে, তাহা জানিবার কোন উপায়

নাই। কিন্তু আমরা কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষের নাম জানিতে পারি। কৃষ্ণকিঙ্কর হইতে ৮ম পুরুষ চলিতেছে।

কৃষ্ণকিঙ্করের পুত্র টেকুরাম, টেকুরামের দুই পুত্র বাবুরাম ও রামানন্দ; বাবুরামের ৩ পুত্র, রঘুনাথ, রতন ও কালী। ইহার মধ্যে রঘুনাথের বংশ বর্ত্তমান। রতনের পুত্র দিগম্বর ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমাজের নেতৃত্ব করিতেন। রঘুনাথের পুত্র হরমোহন, তাঁহার পুত্র রাসবিহারী, রাসবিহারীর দুই পুত্র কিরণ ও ক্ষীরোদ বর্ত্তমান।

টেকুরামের অপর পুত্র রামানন্দের পুত্র বৈকুণ্ঠ। তাঁহার পুত্র শিবনাথ। শিবনাথের পুত্র পিতাম্বর, পিতাম্বরের ৫ পুত্রের মধ্যে একমাত্র অভয়াচরণের দুই পুত্র কিরণ ও ঠাকুরদাস বর্ত্তমান; আর কাহারও বংশ নাই।

মল্লিক বংশ।

মল্লিকবংশের আদি নিবাস বাঁকুড়া জেলায়। ইহাঁরা ঈশান বাঁড়ুয্যের সন্তান, এই বংশের নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম মহেশ্বরপাশায় আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমানে নারায়ণের অধস্তন দশম পুরুষ চলিতেছে, সুতরাং ইহারাও মহেশ্বরপাশার অন্যতম পুরাতন বংশ, ইহাঁরা বংশজ।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব সরকার হইতে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপ কথিত আছে নারায়ণের তপঃ প্রভাবে এক হিংস্র ব্যাঘ্র তাঁহার নিকটে আসিয়াও কিছু না বলিয়া চলিয়া যায়, দূর হইতে নবাব এই ঘটনা দেখিয়া মনে করিলেন ঠাকুর অতি বড় মল্ল (পালোয়ান) বলিয়া ব্যাঘ্র ভয় পাইয়া চলিয়া গেল। নবাব ঠাকুরকে মল্লিক উপাধি দিলেন।

নারায়ণের দুই পুত্র, রামকৃষ্ণ এবং প্রাণকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের ৩ পুত্রের মধ্যে নিধিরাম এবং রামরাম নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন অপর

পুত্র রামসন্তোষের দুই পুত্র, রামশঙ্কর এবং নন্দরাম। নন্দরামের পৌত্র শীতল ও ঈশ্বর; কাহারও বংশ নাই। রামশঙ্করের পুত্র রাধাকৃষ্ণ ও কামদেব। কামদেবের পুত্র ভগবান; তাঁহার বংশ নাই। রাধাকৃষ্ণের ৪ পুত্রের মধ্যে গোবিন্দের প্রসন্ন, শশিভূষণ প্রভৃতি ৫ পুত্র এবং মধুসূদনের যদুনাথ প্রভৃতি ৩ পুত্র। রাধাকৃষ্ণের অপর দুই পুত্র মদনমোহন এবং চন্দ্রকান্তের বংশ নাই। প্রসন্ন পুলিস-সাবইন্‌স্‌পেক্‌টার ছিলেন, তাঁহার শরৎ প্রভৃতি ৩ পুত্র।

শশিভূষণের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ রামায়ণ গান গাহিয়া দেশেবিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন।

নারায়ণের অন্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণের পৌত্র গোপীনাথ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহুকারুকার্য্যখচিত যোড়বাংলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। লতাবাসী "রাজ" পদবীধারী নমঃশূদ্র মিস্ত্রী দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। এইরূপ কারুকার্য্যখচিত যোড়বাংলা এদিকে আর দেখা যায় না। মন্দিরের সম্মুখভাগে দেওয়াল-গাত্রে রথ, হস্তী, অশ্বারোহী, পদাতিকসৈন্য সমন্বিত রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধাদি খোদিত আছে। বহু দেবদেবীর ছবি এবং পুষ্পাদিখোদিত সমচতুষ্কোণ ইষ্টকরাজি মন্দিরগাত্রে প্রোথিত থাকিয়া সেকালের উচ্চাঙ্গের স্থাপত্যশিল্পের সাক্ষ্য দিতেছে। গোপীনাথ চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়ের প্রপৌত্র রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা নীলকণ্ঠ প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে এই যোড়বাংলা নির্ম্মিত হয়। গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজা গোপীনাথকে ১০০/ বিঘা দেবত্র দেন।*

* মন্দির সংলগ্ন ইষ্টকলিপির অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে যাহা আছে তাহার শেষ চরণ এইরূপ—"প্রশস্তি। শ্রীগোপীনাথোনামা ক্ষিতিসুর সুতকে বৃক্ষিরাশৌ দিনেশে॥ শ্রীহরিঃ"

এই যোড়বাংলা বহুকাল অসংস্কৃত অবস্থায় থাকায় ছাদের উপর বড় বড় গাছ জন্মিয়া ছাদকে নষ্ট করিয়া দেয়। সন ১৩০২ সালে ৺রাখালরাজ মল্লিক চারিটি ছাদকে একেবারে ফেলিয়া দিয়া ফরিদপুরের রাজমিস্ত্রী দ্বারা নূতন করিয়া ছাদ দেন। কিন্তু তিনি ১৩০৮ সালে ইহলোক ত্যাগ করায় একার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই, কেবলমাত্র চারটি ছাদ তৈয়ার হয়। ১৩২৪ সালে রাখালরাজের ভ্রাতা ঠাকুররাজ কর্ত্তৃক ইহার কার্ণিশ হয়। তিনি ১৩২৭ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৩৩১ সালে রসরাজের পুত্র মনোরঞ্জন কর্ত্তৃক ছাদে জমাট ধরান হয় কিন্তু তিনিও কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া ১৩৩২ সালে অপরিণত বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পুনরায় ইহার সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে. যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই সংস্কার কার্য্যের অগ্রণী। মল্লিকবংশের বহু শিষ্য এজন্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন। আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এই মন্দির দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

গোপীনাথ সাধক ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ এক সময় তিনি এক গোলা চাউল সংগ্রহ করিয়া অন্নসত্র খুলিয়া দেন। সপ্তাহ ধরিয়া দিন রাত্রি অসংখ্য লোকজনের আহারের পর তিনি দেখিলেন গোলার ধান ফুরাইয়া গিয়াছে, অথচ তখনও বাড়ীতে অনেক অতিথি উপস্থিত। তিনি রাধাবল্লভের সম্মুখে হত্যা দিলেন—"ঠাকুর! আমার কি জাতি যাইবে?" ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হইল, তিনি গোলার দরজা খুলিয়া দেখিলেন, গোলা পূর্ব্ববৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

তাঁহার এক চাকর ছিল, তাহার নাম গোবিন্দ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরও গোবিন্দ। তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে কার্য্যান্তরে পরিশ্রান্ত হইয়া গোবিন্দের নিকট তামাক চাহিলেন, কিন্তু চাকর তখন সেখানে

উপস্থিত ছিল না। এইরূপ প্রবাদ ভক্তের শ্রম অপনোদন জন্য গোবিন্দ বিগ্রহই নিজে চাকরের মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দেন।

গোপীনাথের দুই পুত্র, চৈতন্যপ্রসাদ বা ফকিরচাঁদ এবং কালাচাঁদ। চৈতন্যপ্রসাদের পুত্র দীননাথ। দীননাথের ৩ পুত্র, রজনীকান্ত, রমণীকান্ত এবং নবকান্ত। ইহাদের সকলেরই বংশধর বর্ত্তমান। চৈতন্যপ্রসাদ আড়িয়াদহ নিবাসী মহেশচন্দ্র ঘোষালের সহিত এক কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যা জামাতাকে এই স্থানেই রাখেন।

মহেশচন্দ্রের ৩ পুত্র, গোপাল, বিপিন ও বঙ্ক! গোপালের দুই কন্যা কুললক্ষ্মী ও স্বর্ণময়ী। গোপালের এক জামাতা অখিল মুখোপাধ্যায় এই স্থানে বাস করিতেছেন। বিপিনের পুত্রগণ পৈতৃক বাটীতে আছেন। বঙ্কর দুই পুত্র ক্ষীরোদ ও দেবেন্দ্র এইস্থানে বাস করিতেছেন।

কালাচাঁদ মল্লিকের পুত্র হরিমোহন। হরিমোহনের ৩ পুত্র, রসরাজ, রাখালরাজ এবং ঠাকুররাজ। শেষোক্তের বংশ নাই, রসরাজের পুত্র মনোরঞ্জন অপরিণত বয়সে গতায়ু হইয়াছেন, রাখালরাজের ৩ পুত্রের মধ্যে ভবনাথ ও যোগেশ বর্ত্তমান।

* * * * *

মল্লিকপাড়ার উত্তরে খালের পূর্ব্বপাড়ে তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য এবং গোলোক ভট্টাচার্য্য নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। ইহাঁদের কাহারও পুত্রসন্তান ছিল না কিন্তু উভয়েরই কয়েকটী কন্যা ছিল। তারাচাঁদের ৪ কন্যার মধ্যে বিমলা অন্যতমা। তাঁহার কন্যা দাক্ষায়ণীকে চন্দনীমহলের গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। মতিলাল দাক্ষায়ণীর একমাত্র সন্তান। ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চন্দনীমহলেই বাস করিতেছেন, মতিলাল বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া বিধবা মাতার সহিত দুরবস্থায় পতিত হন। বর্ত্তমানে তিনি রেলবিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং আফিসে কার্য্য করিয়া অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

CamScanner

মল্লিক পাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ।

ইঁহারা কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, ফুলে মেল ; ভরদ্বাজ গোত্র। ইঁহাদের আদিম নিবাস যশোহর জেলার কেশবপুর থানার অন্তর্গত আলতাপোল গ্রাম। এই গ্রামের পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জগৎরাম ৪ বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম তিন স্ত্রী নিঃসন্তানা ছিলেন। তিনি চতুর্থ পক্ষে মহেশ্বরপাশার খ্যাতনামা পণ্ডিত রূপরাম তর্কপঞ্চানন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা দিগম্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। সার্ব্বভৌম দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং মহেশ্বরপাশার প্রসিদ্ধ "মুখ ভারত" ভট্টাচার্য্য বংশসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য বহু ব্রহ্মোত্তর এবং তৎসঙ্গে সার্ব্বভৌম উপাধি প্রাপ্ত হন। সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠা কন্যা বালবিধবা ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া জগৎরামের পুত্র চন্দ্রকান্ত মাতামহ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে বাস করেন। কিন্তু জগৎরাম কখনও নিজবাস আলতাপোল ত্যাগ করেন নাই। চন্দ্রকান্তের অন্নপ্রাশনের সময় জগৎরাম সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নৌকাযোগে মহেশ্বরপাশায় আসিতেছিলেন পথিমধ্যে নৌকাডুবি হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই অবধি এই বংশ হইতে অন্নপ্রাশন উঠিয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্ত শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া বিধবা মাসী ও মাতার যত্নে লালিত পালিত হন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় মাতামহের বিপুল সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়া যায়, তাহা তিনি আর জীবনে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

চন্দ্রকান্তের ৬ পুত্র এবং ৪ কন্যা। প্রথম পুত্রের আয়ুষ্কাল মাত্র ৬ মাস, কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমার অপ্রাপ্ত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে। ২য় পুত্র এবং জীবিতের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বহুদিন পর্য্যন্ত দৌলতপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তিনি বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, বক্তৃতায় এবং রচনায় তাঁহার শক্তিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া

যাইত। তিনি ইং ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে মহাষ্টমীর দিনে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কানাইলাল বি, এ, পাশ করিয়া দৌলতপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন।

চন্দ্রকান্তের ৩য় পুত্র অবিনাশচন্দ্র গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র। তিনি ১৮৮৫ সালে নিম্নছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এবং ১৮৮৭ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পান। ১৮৯২ সালে দৌলতপুর স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি পান। ১৮৯৪ সালে ডাফ্ কলেজ হইতে এফ্.এ, ২য় বিভাগে ও ১৮৯৬ সালে বি, এ, ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স সহ পাশ করেন। কিছুকাল কুচবিহার জেন্‌কিন্‌স্ স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ১৯০১ সালে বি এল্ পাশ করিয়া খুলনায় ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ওকালতী করেন। প্রতিকূল অবস্থা এবং উপযুক্ত শক্তির অভাবে ওকালতীতে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। মহাত্মার অসহযোগনীতি প্রচারের পরেই তিনি আদালতের সংস্রব ত্যাগ করিয়া টাকীর শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের তরফে ম্যানেজারের কার্য্য করিতেছেন। অবিনাশচন্দ্র প্রসিদ্ধ বাগ্মী, তাঁহার বিশুদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় যিনি বক্তৃতা শুনিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু মহেশ্বরপাশার দুর্ভাগ্যে আজ কঠোর জীবন সংগ্রামে তাঁহার সে প্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত!

তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় বগুড়ার সিভিল সার্জ্জন। পাঠ্যাবস্থায় তিনিও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কার্য্যোপলক্ষে বহুদিন পোর্টব্লেয়ারে অবস্থিতি করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানের কনিষ্ঠ বিজয়কুমার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিউড়ী জিলা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন।



৺ শশী ভূষণ সরকার।



শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক নাথ সরকার, বি এ, বি টি।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।) (পৃষ্ঠা ৮৭)

চন্দ্রকান্তের ৬ষ্ঠ সন্তান কুমুদিনী দেবীর পুত্রগণ এই স্থানেই বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পোর্টব্লেয়ারে চাকরী করেন।

সরকার বংশ।

মহেশ্বরপাশার সরকার ভরদ্বাজ গোত্রজ দে উপাধিধারী মৌলিক কায়স্থ। ইহাদের পূর্ব্বনিবাস পাঁজিয়া গ্রাম। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ নবাব দরবার হইতে সরকার উপাধি প্রাপ্ত হন। শিবনাথ দের পুত্র কালীচরণ প্রথমে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি কি অবস্থায় কোন্ সূত্রে আসিয়াছিলেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কালীচরণের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের তিন পুত্র, গঙ্গাধর, দেবীচরণ, অভয়াচরণ। অভয়াচরণ নিঃসন্তান। দেবীচরণের দুই পুত্র, জ্যোতির্ম্ময়, মতিলাল। জ্যোতির্ম্ময় নিঃসন্তান। মতিলাল খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করেন। গঙ্গাধরের দুই পুত্র, শশিভূষণ, সতীন্দ্রনাথ। সতীন্দ্রনাথ স্কুল সব্ ইন্‌স্পেক্টার, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক। তাঁহার জীবনী পৃথক আলোচিত হইবে। শশিভূষণ দারোগা ছিলেন, দেশে বিদেশে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। যশোহরে নীলবিদ্রোহে (Indigo Disturbance) তিনি সরকার হইতে Special officer নিযুক্ত হইয়া কোটচাঁদপুরে প্রেরিত হইয়া উভয় পক্ষ সামঞ্জস্য করিয়া সুন্দররূপে বিদ্রোহ দমন করেন এজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৫০০৲টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি গদখালির নিকট সারসামাঠের ডাকাত দমন করিয়াও কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। তিনি ইং ১৯০২ সালে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ৪ পুত্র, নগেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র

নৃপেন্দ্র, হরিগোপাল। নগেন্দ্রভূষণ রেলবিভাগে ট্রাভেলিং টিকেট ইনস্পেক্টারের কার্য্য করিতেছেন। জ্ঞানেন্দ্র ষ্টেসন মাষ্টার।

মুন্সী ও মধ্যপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ।

এই বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলে মেল কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান। রসিক স্বভাব কুলীন কিন্তু চারু ভঙ্গ। ইঁহাদের আদিনিবাস ধানপুড়া, পরে ইহাদের কেহ প্রতাপকাটিতে যাইয়া বাস করেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২ পুত্র, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। ইহার এক পুত্র নীলমণি গোপালগোবিন্দ মুন্সীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই থাকেন। রাজকৃষ্ণই বোধ হয় প্রতাপকাটি হইতে সেনহাটী যাইয়া বাস করেন। রাজকৃষ্ণের অন্য এক পুত্র গোলোকের বংশধরগণ সেনহাটিতেই বাস করিতেছেন। রাজকৃষ্ণের অন্য এক পুত্র তিলক, তিলকের পুত্র চন্দ্রকান্ত এখানে আসিয়া নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী কৃষ্ণমণির তহশীলদার হন। কৃষ্ণমণি সাগর ঘটকের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে এই স্থানে স্থাপিত করেন, তিনি পুনঃ এবং পরে লখপুর বিবাহ করেন। অপর দুই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নেপাল এবং হরিচরণ। নেপাল ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নীপতি। তাঁহার পুত্রগণ অমরেন্দ্র (নন্দ) প্রভৃতি এই স্থানেই বাস করিতেছেন, হরিচরণ মাতুলালয় লখপুরেই বাস করেন।

চন্দ্রকান্তকে কৃষ্ণমণি ঠাকুরাণী কিছু সম্পত্তি দিয়া যান। চন্দ্রকান্তের অন্যতম পুত্র নবকান্তও রেলে চাকরী করিয়া যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছেন. সুতরাং এক সময়ে ইহাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। শরৎ ৺দুর্গোৎসব এবং ৺কালীপূজা করিতেন। ৺পূজার সময় তিনি গ্রামস্থ

সকল জাতিকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। কিন্তু এই পরিবারের উপর ঈশ্বরের কি অভিসম্পাত জানি না, অনুমান ১৩০৮ সালে শরতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। বাড়ী ঘরে সে লক্ষ্মী শ্রী আর নাই। নবকান্তের পুত্র একমুষ্টি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দেশত্যাগী, শরতের পুত্রগণ অতি দৈন্যাবস্থায় পিতৃপুরুষের ভিটার পরে কোনরূপে দিন যাপন করিতেছেন। মুন্সী পাড়ায় ইহাদেরই জ্ঞাতি আর এক ঘর বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, তাঁহারাও কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া পরিচিত। মধুরায়ের পূর্ব্বপুরুষ রামসন্তোষ রায় ঢাকুরিয়া প্রতাপকাটি হইতে কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনিয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে জমী দিয়া স্থাপিত করেন। কমলাকান্তের পুত্র রামরতন এবং রামরতনের পুত্র গোপীমোহন। গোপীমোহন একজন ভক্ত সাধু ছিলেন, তাঁহার জীবনী পৃথক আলোচিত হইবে।

মধ্যপাড়ার বল্লভীমেলের বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বংশের আদিম নিবাস কোথায় অথবা কে এখানে প্রথম আসেন তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না। ইহাদের জ্ঞাতি এখন নকীপুরে বর্ত্তমান। জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র তারাচাঁদের দুই পুত্র, ফকীরচাঁদ এবং রজনীকান্ত গ্রামের খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। দুই ভ্রাতায় যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। ইদানীং সেরূপ ভ্রাতৃপ্রণয় প্রায়ই দেখা যায় না। তাঁহারা দেশের অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন এবং যখন যাহা করিয়াছেন, দুই ভ্রাতা মিলিয়াই করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ফকীরচাঁদের আহার পরিচ্ছদে কোনরূপ পারিপাট্য ছিল না। তিনি বাড়ীতে সর্ব্বদা একখানি ছোট কাপড় পরিয়া থাকিতেন এজন্য অনেকে তাঁহাকে

কার্পণ্যদোষে দোষী করিত কিন্তু এরূপ কার্পণ্য মানব মাত্রেরই কাম্য, কারণ তিনি নিঃস্বার্থভাবে যেরূপ লোকের উপকার করিয়াছেন এবং দেশের বহু সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা অনেকেই পারেন নাই। নিজের আহারে পারিপাট্য ছিল না বটে কিন্তু কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যখন সকলকে ভুরি ভোজনে পরিতুষ্ট করিতেন এবং যুক্তকরে সকলের নিকট অতি বিনীতভাবে বলিতেন—"আমি 'ফকীর' মানুষ, পেট ভরিয়া খাওয়াইবার সাধ্য আমার নাই," তখন তাহার সে সরলতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। অপরকে খাওয়াইয়া যে তৃপ্তি তাহা তিনি উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এইগুণ তাঁহার বংশধরগণও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফকীরচাঁদ নিজব্যয়ে গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশন এবং উপনয়ন ও পুরোহিতের পুত্রের বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। পুরোহিতকে পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়াছেন।

দৌলতপুর স্কুলের ছাত্রদের পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। পূর্ব্বে উক্ত স্কুলের নিকটে কোন ভাল পুষ্করিণী ছিল না, নদীর জল অনেক সময় পানের অযোগ্য থাকিত। দৌলতপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীবৃন্দের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া স্কুলের জন্য পুষ্করিণী খনন করিবার অভিপ্রায়ে তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট খালিষপুর গ্রামে একটী সভা আহ্বান করেন। তখন শ্রীধরপুর নিবাসী ৺যতীন্দ্রনাথ বসু সৈদপুর ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের ইঙ্গিত ক্রমে তিনি ফকীরচাঁদকে ৫০৲ টাকা চাঁদা দিতে অনুরোধ করেন। ফকীরচাঁদ দেখিলেন রায় সাহেবের ন্যায় ধনী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও ৫০৲ টাকা চাঁদা দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট ফকীরচাঁদ ফকীর তুল্য বলিয়াই মনে করেন। এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, ফকীর-

চাঁদ ৫০৲ টাকা চাঁদা দিতে পারে না, দিবেও না। স্কুলের ছাত্রদের পানীয় জলের জন্য নিজব্যয়ে পুকুর কাটাইয়া দিবে। যাহা হোক তাঁহার এই প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। যে সমস্যার জন্য তিন গ্রামের লোককে একত্র করিয়া নানাভাবে সকলকে অনুরোধ করা হইতেছিল, তাহার মীমাংসা এত শীঘ্র হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। এদিকে ফকীরচাঁদ বাড়ী আসিয়া প্রিয়তম অনুজ রজনীকান্তকে সকল বিষয় বলিলেন, রজনীকান্ত জ্যেষ্ঠের সৎপ্রস্তাবে আহ্লাদিত হইলেন। স্কুলের উত্তরে জমি কিনিয়া একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করিয়া দুটী ঘাট বাঁধাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রায় চারি হাজার টাকা খরচ পড়ে।

পূর্ব্বে মহেশ্বর পাশার শ্মশান ঘাট বহু জঙ্গলাকীর্ণ অতি কদর্য্য স্থান ছিল, রাত্রে দূরের কথা দিনের বেলায়ও সেখানে শবের অনুগমন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। ফকীর চাঁদ সময়ে অসময়ে শববাহকগণের আশ্রয়ের জন্য একটী পাকা ঘর করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু পোতা পর্য্যন্ত গাথা হইবার পরে তিনি ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসে ইহসংসার ত্যাগ করেন, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অনেক দিন পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল, সম্প্রতি তাঁহার বংশধরগণ তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্মশানে পূর্ব্বের সে বিভীষিকা নাই, ইহা এক রম্যস্থানে পরিণত হইয়াছে।

অতিথিসেবা ফকীর চাঁদের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল, অতিথি সেবার জন্য তিনি প্রত্যহ তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিতেন।

ফকির চাঁদের পুত্রসন্তান নাই, কয়েকটী কন্যা বর্ত্তমান, দৌহিত্রগণ শ্রীযুত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এই স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় দৌলতপুরে বাড়ী করিয়াছেন।

ফকীরচাঁদের কনিষ্ঠ রজনীকান্ত প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন,

তিনি পিলজঙ্গ, বিছালী এবং পূর্ব্বস্থলীর চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন, পূর্ব্বস্থলীর অধ্যাপক লালমোহন বিদ্যাবাগীশের নিকট হইতে ন্যায়রত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন, বাড়ীতে চতুষ্পাঠী করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি অনেক বিদেশী ছাত্রকে আহার বাসস্থান এবং বিদ্যাদান করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন, দেশের অনেক হিতকর কার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইং ১৯০৮ সালে ৺কালীবাড়ীতে মহাসমারোহে যে 'মাতৃপূজা' অনুষ্ঠিত হয় তাহা প্রধানতঃ ন্যায়রত্নের সম্পাদকতায় হইয়াছিল, এজন্য তাঁহাকে বহু অর্থব্যয় এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৩২৬ সালের প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের (Cyclone) পরে দেশের দীনদরিদ্রের অবস্থা যখন চরমে পরিণত হয় তখন তিনি বহুলোককে চাউল, ডাইল, তৈল, লবণ ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্য বিতরণ করেন। ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ন্যায়রত্নের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

ন্যায়রত্নের একমাত্র পুত্র শিবনাথ কাব্যতীর্থ, তর্কতীর্থ উপাধিধারী। তিনি ইং ১৯১০ সালে কাব্যতীর্থ ও ১৯১৮ সালে তর্কতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হন, পিতার ন্যায় তিনিও অনেক ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেছেন। শিবনাথের ভাগিনেয় বরিশাল, চলিশানিবাসী শ্রীযুত নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই স্থানে বাস করেন। তিনি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর মধ্যে চাকরী করিতেছেন।

শিবনাথের বাড়ীর দক্ষিণে তাহাদের একঘর জ্ঞাতি আছেন কিন্তু ইহারা অপেক্ষাকৃত দূর সম্পর্কীয়, এই বংশে সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ই. বি. রেল বিভাগে ট্রাভেলিং টিকেট ইন্‌সপেক্‌টারের কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বতন হীন অবস্থার উন্নতি সাধন করেন, কয়েক বৎসর হইল তিনি অকালে বসন্তরোগে কাল কবলিত হইয়াছেন; সতীশ চন্দ্র পরোপকারী, দানশীল এবং অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন।

বিদ্যানন্দকাটির ঘোষ বংশ।

মজুমদার বংশের মধ্যে মধুসূদন ঘোষের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি রামদেব মজুমদারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই বাস করিতে থাকেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয় এবং তিনিও পৈতৃক বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করেন, কিন্তু রামদেব অন্যত্র কন্যা ঠিক করিয়া তাহার সহিত জামাতার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রদত্ত জমীতেই স্থাপিত করেন। মধুসূদনের বংশধর সেই বাড়ীতেই বাস করিতেছেন, বর্ত্তমানে মধুসূদনের অধস্তন ৭ম পুরুষ চলিতেছে। মধুসূদনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মতিলাল পুরুষ-সিংহ, বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শরীরে সিংহের ন্যায় বল ধারণ করেন।

এখানে আরও দুই ঘর বিদ্যানন্দকাটির ঘোষ আছেন, ইহার এক ঘর মধুসূদনের বংশ সম্ভূত অথবা তাঁহার সময়েই বিদ্যানন্দকাটী হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। ১২২৪ সালের সরকারী জরিপী চিঠায় পাঁচু এবং ছকু নামে দুই ভ্রাতার নাম উল্লেখ আছে ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে উহার বহু পূর্ব্ব হইতে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এখানে বসতি করিতে থাকেন পাঁচুর বংশধর কালিদাস এবং ছকুর বংশধর উপেন্দ্র, ভুবন প্রভৃতি বর্ত্তমান। পাঁচুর ভাল নাম রাম কিঙ্কর, তাঁহার পুত্র রামনিধি, রামনিধির পুত্র শিবচন্দ্র ঠাকুরবাবুদের মধ্যে পাতলিয়াদহ পরগণায় চাকরী করিতেন, তাঁহার পুত্র মহিমাচন্দ্র।

সারদানাথ মজুমদার বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহিমাচন্দ্র ঘোষ এই তিন জন সেকালে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েন, এবং এই তিনজন সমসাময়িক ছিলেন। মহিমাচন্দ্র রাজসাহীতে মামার বাসায় থাকিয়া পড়িতেন। তিনি জুনিয়ার স্কলারশিপ পাশ করিয়া

বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং সিনিয়ার স্কলারশিপ পড়িবার জন্য ঢাকায় যাইতে আদিষ্ট হন কিন্তু তিনি তথায় যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন এবং এইস্থানে তাঁহার পাঠও শেষ হয়। অতঃপর তিনি রাজসাহীতে গবর্ণমেণ্টের নায়েব নাজীরের পদে বহাল হন কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি এই চাকরী ছাড়িয়া দিয়া মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে ক্লার্কের পদ গ্রহণ করিয়া পুলিসবিভাগে প্রবেশ করেন। স্বীয় কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি এই বিভাগে যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে তিনি ফার্ষ্ট গ্রেড্ পুলিস-ইনস্পেকটার হন এবং মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে কিছুদিন অস্থায়ীভাবে ডেপুটী পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টএর কার্য্যও করেন। সেই সময় তিনি গ্রামের বহু লোককে পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিয়া দেন। সেকালে লালবাগ মহকুমায় মহরমের সময় প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত। অনুমান ১২৮৪ সালে মহরমের সময় তাঁহাকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল ঘোড়ার উপর থাকিতে হইয়াছিল, ২৪ ঘণ্টা পরে তিনি ঘোড়া হইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান এবং এই পতন হইতে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। ইহার ৭ বৎসর পরে ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে প্রায় ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

মহিম চন্দ্র অসমসাহসিক ছিলেন এবং এই জন্যই তিনি পুলিস জীবনে সামান্য ৫৲ টাকা মাহিনার কেরাণী হইতে ৩০০৲ টাকা মাহিনার অস্থায়ী ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে সক্ষম হন। ছাত্রজীবনে রাজসাহীতে অবস্থানকালে একদিন তাঁহার মামার সহিত কোন সামান্য বিষয়ে মনান্তর উপস্থিত হয়। তিনি রাজসাহী হইতে হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন, পথে সুভীষণা বেগবতী পদ্মা তাঁহার গতিরোধ করে। তিনি কি ভাবে পদ্মা পার হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে একটী পয়সাও নাই, কিন্তু কিশোর বালক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না

করিয়া সুপ্রশস্তা খরস্রোতা পদ্মার বক্ষে ঝাঁপ দিলেন, সন্তরণে পদ্মা পার হইবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। সাঁতার কাটিয়া মধ্যনদীতে পৌছিবার পূর্ব্বেই বালক শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, হাত পা ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, এমন সময়ে সম্মুখে দেখিলেন একটী বেতের তোরঙ্গ (বাক্স) ভাসিয়া যাইতেছে, বালক সেইটীকে ধরিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া লইলেন এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে সেই তোরঙ্গটীকে মাথায় করিয়া তিনি বাড়ী চলিয়া আসেন। ইং ১৮৯৮ সালের গৃহদাহে উহা পুড়িয়া গিয়াছে।

মহিম চন্দ্রের একমাত্র পুত্র কালিদাস বর্ত্তমানে গ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী এবং সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানে অগ্রণী। তিনি ইং ১৯১৩ সালে বি, এল, পাশ করিয়া খুলনায় ওকালতী আরম্ভ করেন এবং ৭ বৎসরের পরে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইলে উক্ত ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। তিনি আর বিবাহ করেন নাই, বর্ত্তমানে কলিকাতায় কনট্রাক্‌টরী করিতেছেন।

খুলনা কায়স্থ ব্যাঙ্ক ধীরে ধীরে আজ উন্নতির পথে চলিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় কালিদাস সর্ব্বপ্রধান অগ্রণী। ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান ডিরেক্‌টার শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বসু দুস্থ কায়স্থগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটী চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার খুলিবার প্রস্তাব করেন, চাঁদা আদায় করিয়া এবং মুষ্টি-ভিক্ষা দ্বারা ভাণ্ডার চালাইতে হইবে। কিন্তু কালিদাস বলেন ভিক্ষায় কোন কাজ হয় না এবং ইহাতে কোন স্থায়ী ফল হইবে না। যাহাতে অর্থাগম হয় জাতির নামে এরূপ কোন ব্যবসা করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তদনুসারে ইং ১৯১৭ সালে কায়স্থ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কালিদাস এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন, ৺হরিনাথ বসু ইহার বিশেষ সহায় হন।

ইং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্যগ্রহণের নূতন উদ্দীপনা বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে সর্ব্বত্রই সমভাবে

দৃষ্ট হয়। লাঠিখেলা, কুস্তী প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চাও ঐ সঙ্গে অনেকস্থলে অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রেও কালিদাসকে প্রধান উদ্যোগী দেখা গিয়াছে। তিনি গ্রামের কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবককে সৎপরামর্শ এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সৎপথে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উৎসাহী যুবকদের লইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া এক সময়ে তিনি এবং শ্রীযুত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহেশ্বরপাশা সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে গ্রামে যে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি আছে তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং রেজেষ্টারীকৃত হইয়াছে। বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারীরূপে তিনি তাহার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

ছকুর পৌত্র ধনঞ্জয়ের ৪ পুত্র—সারদা, বলরাম, রজনী এবং নেপাল। সারদা নিঃসন্তান, বলরামের পুত্র হৃদয়নাথের জীবনী পৃথক আলোচিত হইবে। রজনীর পুত্র উপেন্দ্র এবং নেপালের পুত্র ভুবন প্রভৃতি বর্ত্তমান। নেপালচন্দ্র ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সিঙ্গাশোলপুরে বিশেষ যশের সহিত চিকিৎসা ব্যবসা করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন উড়িষ্যা বিভাগে পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের সাবডিভিসনাল অফিসার।

ইঁহাদের আর এক ঘর জ্ঞাতি আছেন, তাঁহারা পরবর্ত্তীকালে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

রজনীকান্ত, বাণীকান্ত মজুমদারের পিতামহ গোলোকচন্দ্র মজুমদার রাংদিয়া মসিদপুর হইতে তাঁহার ভাগিনেয় রাধানাথ ঘোষকে এখানে আনিয়া বাড়ী করিয়া দেন। রাধানাথের কোন পূর্ব্বপুরুষ বিত্তান্দকাটী হইতে রাংদিয়া গ্রামে যাইয়া বাস করেন। রাধানাথের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, কোনরূপ কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে হইত।

রাধানাথের দুইপুত্র রামচাঁদ, গোরাচাঁদ। রামচাঁদের পুত্র চন্দ্রকান্ত।

CamScanner

চন্দ্রকান্তের পুত্র সন্তান ছিল না, চারি কন্যা হয়। এক কন্যাকে ৺কেদার নাথ মজুমদার বিবাহ করেন।

গোরাচাঁদ নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত অমায়িক এবং সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মহেশ্বরপাশার তামাকের আড্ডায় তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া আছে। তিনি লোকের সংসর্গ এবং গল্পগুজব করিতে ভালবাসিতেন। তামাক, হুকা কলিকা এবং আগুনের মালসা লইয়া বারান্দায় বসিতেন এবং রাস্তা দিয়া যে যাইত তাহাকে ডাকিয়া তামাক খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। যিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিতেন, তিনি এক প্রহরের মধ্যে আর উঠিতে পারিতেন না, কারণ গোরাচাঁদ তামাক খাওয়াইবার জন্য নারিকেল খোসার নুড়ী পাকাইয়া মালসার যেখানে আগুণ না থাকিত সেইখানে ঠাসিয়া রাখিতেন। এইভাবে তিনি লোক আটকাইয়া তাহার সহিত গল্পগুজব করিতে ভালবাসিতেন। "গোরাই ঘোষের তামাক খাওয়ান" এই প্রবাদ আজও বর্ত্তমান। গোরাচাঁদের ৩ পুত্র। জ্যেষ্ঠ তারকনাথ পাতলিয়াদহ পরগণায় জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করিয়া পূর্ব্ব দৈন্যাবস্থার উন্নতি সাধন করেন। মধ্যম মথুরানাথের ৪ পুত্র। জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ ৺কেদারনাথ মজুমদারের চেষ্টায় এবং অনুগ্রহে কুচবিহার মহারাজার খাস অফিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন, বর্ত্তমানে তিনি ১৬৫৲ টাকা বেতনে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এর কার্য্য করিতেছেন। খালিস্পুরের শ্রীযুত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় এবং অধিনায়কত্বে মহেশ্বরপাশায় কিছুদিনের জন্য একসময়ে সার্কাস পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পার্টিতে যতীন্দ্রনাথ একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের ন্যায় মহোপকারী ব্যক্তি বর্ত্তমানে মহেশ্বর-পাশায় বিরল। কুচবিহারে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন না এরূপ লোক খুব বেশী নাই। গোরাচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র গোপালের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দুই কন্যা রাখিয়া অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

পশ্চিমপাড়ার দত্তবংশ।

পশ্চিমপাড়ার দত্তবংশ বালি সমাজের, ভরদ্বাজগোত্রীয়। এখানেই হাদের অনেক পুরুষ বাস হইয়াছে। কিন্তু কে প্রথম আসেন তাহার ঠিকানা নাই। সম্ভবতঃ মহেশ্বর ঘোষ অথবা তাঁহার পুত্র নীলকমল কর্তৃক এই বংশের কাহাকেও বালি হইতে এখানে আনা হয়। 'বাদাবন' উঠাইয়া বসতি স্থাপনের সময় মহেশ্বর ঘোষ নিজ দেশ হইতে বহুবংশ আনাইয়া এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বংশে বাবুরাম দত্ত একজন কৃতীপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বংশধর কেহ নাই। তিনি অতিথি-সৎকারে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় একবার তাঁহার ধানের নৌকা ডুবিয়া যায়; অতিথিসেবার বৎসরের ধান সেই নৌকায় ছিল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মান ইজ্জৎ বুঝি এবার সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। কেমন করিয়া অতিথিসেবা হইবে এই চিন্তা করিতে করিতে রাত্রে শয়ন করিলেন। গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, এক সন্ন্যাসী আসিয়া বলিতেছেন "তোর নৌকা কি ডুবিতে পারে, তা হ'লে যে ধর্ম্ম থাকে না। দেখ্‌গে তোর নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে।" ভোরে উঠিয়া তিনি ঘাটে যাইয়া দেখিলেন, বাস্তবিক তাঁহার নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে।

এস্থলে রামলোচন দত্তের নাম পাওয়া যায়। রামলোচনের অধস্তন ৫ম পুরুষ রঘুনাথ দত্তের দুই পুত্র—তারকনাথ ও শ্রীনাথ। তারকনাথের তিন পুত্র ভারত, বিজয় ও অতুল এবং শ্রীনাথের এক পুত্র হরিদাস বর্ত্তমান।

মজুমদার পাড়ার চক্রবর্ত্তী বংশ।

দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঘুটিয়া গ্রামের রামভদ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামদেব মহেশ্বরপাশার তদানীন্তন এক অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে পড়িতেন। সেই সময়ে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি মজুমদারদের পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া মহেশ্বরপাশাতেই বাস করিতে থাকেন।

রামদেবের চারি পুত্র—রামবল্লভ, শুকদেব, রামকেশব এবং রামশঙ্কর। শেষোক্তের বংশ নাই। অপর তিন পুত্রের বংশধর তিন বাড়ীতে বাস করিতেছেন।

রামবল্লভের চারি পুত্র—রাধানাথ, গোপীনাথ, রমানাথ এবং রঘুনাথ।

রাধানাথের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পার্ব্বতীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে একমাত্র কৈলাসের বিবাহ হইয়াছিল। তাহার দুই পুত্র যশোহরের অন্তর্গত দীঘালিয়া গ্রামে কৈলাসের মামাবাড়ীতে বাস করিতেছেন। উপযুক্ত কন্যাপণ দিতে না পারায় অন্য কাহারও বিবাহ হয় নাই। পার্ব্বতীর মধ্যম ভ্রাতা দীননাথের পুত্র অমৃতলালও অবিবাহিত অবস্থায় ৺কাশী-প্রাপ্ত হন। অমৃতলাল অত্যন্ত হাস্যরসিক ছিলেন। তিনি যখন যে আসরে উপস্থিত থাকিতেন, তখন সে আসরকে মাতাইয়া তুলিতে পারিতেন। চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নবকান্তর বিবাহের বরযাত্রী হইয়া ঢাকুরিয়া প্রতাপকাটি গিয়াছিলেন। বিবাহের পরদিন সকলেই মজ্‌লিস্ করিয়া বসিয়া আছেন, ইতোমধ্যে দেখিলেন এক অধ্যাপক একটী জলশূন্য গাড়ু লইয়া প্রস্রাব ফিরিয়া আসিলেন। অমৃতলাল বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহাতে একবিন্দুও জল নাই এবং থাকাও সম্ভব ছিল না। ইহা দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি হুকার বৈঠক লইয়া মূত্রত্যাগ করিতে বসিলেন, সকলে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তিনি

ফিরিয়া আসিলে সকলে জিজ্ঞাসা করিল, একি কাণ্ড। তাহাতে অমৃতলাল উত্তর করিলেন, ধাতুপাত্র হইলেই যথেষ্ট হইল। অধ্যাপক জলশূন্য গাড়ু লইয়া যদি প্রস্রাব ফিরিতে পারেন, আমি মূর্খ ব্রাহ্মণ, শুধু বৈঠক লইয়া কেন পারিব না। অধ্যাপক লজ্জিত হইলেন, সভা মধ্যে হাসির উচ্চরোল পড়িয়া গেল।

মহেশ্বরপাশা থিয়েটারে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত হাস্যরস অভিনয় করিতেন। বালিকা স্কুলের পণ্ডিত ৺যদুনাথ ঘটক 'কন্যাবিক্রয়' নামে একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, উহা মহেশ্বরপাশা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। অমৃতলাল অশীতিপর বৃদ্ধ জামাতার ভূমিকা অভিনয় করিতেন। টাকার লোভে কন্যার পিতা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এক বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই কন্যা বিধবা হয়। কনিষ্ঠাকেও পুনরায় সেইরূপ বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিতেছেন। বিবাহ সভা হইতে বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রিয়তমা কনিষ্ঠাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, বৃদ্ধ বর পিছনে পিছনে যাইতেছে এবং বলিতেছে— "ও খিষ্টেনী দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে যাব, ও খিষ্টেনী দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে যাব।" বৃদ্ধ বরবেশী অমৃতলাল এই অভিনয় অতি সুন্দর ভাবে করিতেন, সে গল্প আজও বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায়।

গ্রামের মধ্যে অমৃতলালের বিবাহ স্থির হয়। গাত্র হরিদ্রাও হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় পণের টাকার গোলমালে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে তাঁহার নিকট কেহ দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের বংশে ইহাই যথেষ্ট, আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর কেহ এতদূরও আসিতে পারেন নাই।" ইহার কিছু দিন পরে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ৺কাশীযাত্রা করেন, সেইখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

রাধানাথের কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ পার্ব্বতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিয়ারীর

পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা রমণী ঠাকুরাণীকে সেন-হাটীর বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। (বিহারীলালের অপর স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নীলমাধব এবং বিজয়কুমার মুনসীপাড়ায় বাস করেন)। রমণী ঠাকুরাণীর পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার দৌহিত্র গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী এই বাড়ীর এক অংশে বাস করিতেছেন।

রামবল্লভের মধ্যম পুত্র গোপীনাথের ৩ পুত্র। নিত্যানন্দ, নীলাম্বর, (নিঃসন্তান) দিগম্বর। নিত্যানন্দের পুত্র ক্ষেত্রগোপাল বি, এ, বি, টি, পাশ করিয়া স্কুলের সাব ইন্‌সপেক্টারের কার্য্য করিতেছেন। গ্রামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিতে তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। দিগম্বরের পুত্র ফণী ও নকুল ডাক বিভাগে কাজ করেন।

রামবল্লভের অপর দুই পুত্র রামনারায়ণ এবং রঘুনাথের বংশ নাই। রামনারায়ণের পুত্র কালাচাঁদ এবং রঘুনাথের পুত্র পীতাম্বর নিঃসন্তান অবস্থায় ইহ সংসার ত্যাগ করেন।

রামদেবের মধ্যম পুত্র শুকদেবের প্রপৌত্র নীলকমলের ৩ পুত্র—বাণীকান্ত, হরষিতচন্দ্র এবং অন্নদাচরণ। হরষিতচন্দ্র বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত ছিলেন। বাণীকান্তের পুত্র বিধুভূষণ। হরষিতের পুত্র নকুলেশ্বর বি, এ, পাশ করিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন। অন্নদার পুত্র হিরণ্ময়, কিরণময়, হরিচরণ।

রামদেবের তৃতীয় পুত্র রামকেশরের ৫ পুত্র—কাশীনাথ, শিবচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শম্ভূ এবং রামসুন্দর, ইহাদের মধ্যে একমাত্র শিবচন্দ্রের পুত্র বৈদ্যনাথের বংশ বর্ত্তমান।

কাশীনাথের দুই পুত্র, রামধন এবং মাধব। কাহারও বংশ নাই। মাধব অতি বলবান ছিলেন। তিনি ভুরিভোজীও ছিলেন। এক এক বারে এক হাড়ি করিয়া ভাত খাইতে পরিতেন। একদিন সকালে বারান্দায় বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় উত্তরের বাড়ীর

সহিত মল্লিকদের সীমানা লইয়া গোল বাধে, এবং মারামারি হয়। ঐ গোলমাল শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবধূ তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"হারে মাধো, তুই ব'সে ব'সে কি কর্‌ছিস্, মল্লিকরা উত্তরের বাড়ীদের মেরে ফেল্লে।" এই তিরস্কার বাণীতে মাধবের চৈতন্য হইল। হুকা রাখিয়া তিনি তখনই উঠিলেন এবং জ্ঞানহারা হইয়া উত্তরের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। বর্ত্তমানে,সারদানাথ মজুমদারের দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ বসু যেখানে বাড়ী করিয়াছেন, সেখানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল দিয়া যাইতে যাইতে এক কাটাগাছে তাঁহার কাপড় বাধিয়া যায়; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তিনি উলঙ্গ হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং দাঙ্গাকারীদের দুই পক্ষের দুইজনকে দুই বগলে পুরিয়া ভ্রাতৃবধুর সম্মুখে আনিয়া হাজির করিলেন, অথচ তিনি উলঙ্গ, তখন তাঁহার জ্ঞান হয়। লজ্জা পাইয়া একখানি ছোট কাপড় পরিধান করিয়া পরণের কাপড়ের সন্ধানে জঙ্গলে যাইয়া দেখেন তাহা এক কাটাগাছে ঝুলিতেছে।

বৈদ্যনাথের পুত্র বংশীবদন এবং উমেশ। উমেশের শরৎ প্রভৃতি তিন পুত্র বর্ত্তমান। বংশীবদন সাধক ছিলেন। তিনি অনেক সময় ৺কালী বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি যখন ৺কালী বাড়ীতে বসিয়া অথবা শ্মশানে শ্মশানকালী পূজা করিতে বসিয়া উদাত্ত স্বরে তারা মা বলিয়া ডাকিতেন, সে ডাক এই প্রকাণ্ড গ্রামের অপর প্রান্ত হইতে শুনা যাইত, কেমন করিয়া যে এই ডাক একজন শীর্ণ ব্রাহ্মণের কণ্ঠনিঃসৃত হইয়া গ্রামস্থ সাধারণের হৃদয়ে পৌছিত, তাহা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন, যাহাকে এই তাপস তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া ডাকিতেন। বংশীবদনের দুই পুত্র বসন্তকুমার এবং কেশবলাল, বসন্তকুমার বর্ত্তমানে গ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার জীবনী পৃথক আলোচিত হইবে। কেশব রেল আফিসে চাকরী করেন।

রামকেশবের অন্যতম পুত্র শম্ভুর দৌহিত্রী বিধবা হইলে শ্রীধরপুরে

তাহার পুনরায় বিবাহ হয়। শশুর জামাতা রাজকুমার ন্যায়ভূষণ-ন্যায়-শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। কন্যার অকাল বৈধব্য তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত করে, তিনি সমাজকে উপেক্ষা করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দেন, কিন্তু এই হঠকারিতার জন্য সমাজ তাহাকে ক্ষমা করে নাই, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাকে সমাজচ্যুত থাকিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বপাড়ার চক্রবর্ত্তী বংশ।

পূর্ব্বপাড়ায় এক ঘর প্রতিপত্তিশালী চক্রবর্ত্তী ছিলেন, ইহাদের বংশে এখন কেহ নাই কিন্তু ইহাদের আশ্রিত হইয়া অনেকে এখানে বাস করেন। এই বংশের শেষ সন্তান ৺গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। শুকদেব চক্রবর্ত্তী ইহাদেরই আশ্রিত হইয়া সেনহাটী হইতে এইস্থানে প্রথম আগমন করেন; ইহাদের আদিম নিবাস সারল। শুকদেবের পুত্র রামকিঙ্কর। রামকিঙ্করের দুই পুত্র ভৈরব এবং রামরতন। ভৈরবের দুই পুত্র শ্রীরাম এবং দুর্গাচরণ। শ্রীরামের পুত্র হরিচরণ (৺নিবারণচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পরে) বর্ত্তমানে গ্রামের শ্রেষ্ঠ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার পুত্র নিশিকান্ত।

দুর্গাচরণের পুত্র নিত্যগোপাল; তাঁহার প্রভাত, প্রকাশ, অনন্ত প্রভৃতি ছয় পুত্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাকরী করিতেছেন।

রামকিঙ্করের অন্যতর পুত্র রামরতনের পুত্র পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর দুই পুত্র উমেশ ও গিরিশ। উমেশের পুত্র প্রিয়নাথ নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। গিরিশের কালীপদ প্রভৃতি ৪ পুত্র বর্ত্তমান।

CamScanner

মধ্যপাড়ার ভট্টাচার্য্য এবং মুখোপাধ্যায় বংশ।

দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণনাথ বিদ্যালঙ্কার নামক এক অধ্যাপক পণ্ডিত খালিস্পুর হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণনাথ শাণ্ডিল্যগোত্র সম্ভূত, তাঁহার বংশগত পদবী ভট্টাচার্য্য। কৃষ্ণনাথের দুই পুত্র, রামসন্তোষ ন্যায়বাগীশ এবং গোবিন্দরাম রায়। গোবিন্দরাম সম্ভবতঃ নবাবসরকারে চাকরী করিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। গোবিন্দরামের অধস্তন কয়েকপুরুষের নাম পাওয়া যায় না। এই বংশে শ্যামানাথ রায় বহুদিন পর্য্যন্ত বালিকাবিদ্যালয়ে পণ্ডিত ছিলেন। মহেশ্বর-পাশা থিয়েটারে অভিনয় করিয়া একসময়ে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার পুত্র ক্ষীরোদ।

রামসন্তোষ ন্যায়বাগীশের দুই পুত্র, রামসুন্দর এবং জগন্নাথ; রাম-সুন্দরের পাঁচ পুত্র—রামধন, রামমোহন, রাধামোহন, মহেশ ন্যায়ালঙ্কার এবং কৃষ্ণমোহন। শেষোক্ত তিন জনের বংশ নাই। রামধনের পুত্র দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথের ৩ পুত্র—প্রিয়নাথ, কেশব, রামলাল। দৌলতপুরে যখন প্রথম মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়, তখন প্রিয়নাথ সেই স্কুলে পড়িয়া মাইনর পাশ করেন। প্রিয়নাথের ললিত, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ৪ পুত্র; কেশবের পুত্র হীরালাল রেলে চাকরী করেন। প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলাল ও রেলবিভাগে চাকরী করেন।

রামধনের মধ্যম ভ্রাতা রামমোহনের পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁহার কন্যা, দয়াময়ীকে লখপুরের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন। পঞ্চাননের পিতা ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লখপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রাম-বিষ্ণু রায় চৌধুরীর * কন্যাকে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। ভৈরব যোগেশ্বর

* রামবিষ্ণু রায় চৌধুরীর অক্ষয় কীর্ত্তি যোগীপোলের দীঘি কোম্পানীর রাস্তার পার্শ্বে.

পণ্ডিতের সন্তান, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের ধারা, খড়দহ মেল, ভরদ্বাজ গোত্র সম্ভুত।

পঞ্চাননের অপর পক্ষীয় পুত্রগণ লখপুরেই বাস করেন, কিন্তু দয়াময়ীর গর্ভজাত ৩ পুত্র কালীপ্রসন্ন, রসিকলাল এবং চন্দ্রকান্ত মাতামহ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া মহেশ্বরপাশাতেই অবস্থিতি করেন। রসিকলাল নিঃসন্তান। তিনি সেকালের মাইনর পাশ ছিলেন এবং এণ্ট্রান্সও পড়িয়াছিলেন, উত্তম ইংরাজী লেখাপড়া জানিতেন। তিনি কবিগানের ওস্তাদি করিতেন এবং মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কালী-প্রসন্নের পুত্র সারদা। সারদার এক পুত্র। চন্দ্রকান্ত পুরাতন বাড়ী ছাড়িয়া ভিন্ন বাড়ী করেন। তাঁহার ৩ পুত্র। জ্যেষ্ঠ নিশিকান্ত ভাঙ্গা স্কুলে ৬ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া ইং ১৯১৮ সালে বি, এ, পাশ করেন, পর বৎসর আর্য্য সাহিত্য সমাজে বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষা দিয়া বিদ্যারত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা পোর্ট কমিশনার আফিসে চাকরী করিতেছেন। সারদাপ্রসন্নের এক ভাগিনেয় খালের চট্টোপাধ্যায় বংশ সম্ভুত কাশীপুরের বাণীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হেমদাকণ্ঠ চট্টো-পাধ্যায় এই স্থানে মামাবাড়ীর এক অংশে বাস করিতেছেন। গ্রামের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন।

রামসন্তোষ ন্যায়বাগীশের অন্যতর পুত্র এবং রামসুন্দরের ভ্রাতা জগন্নাথের দুই পুত্র, হরনাথ এবং হারানন্দ। হারানন্দের বংশ নাই।

অবস্থিত। কথিত আছে তিনি গুরু পুরোহিত এবং বহুলোক জন সঙ্গে লইয়া পদব্রজে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। পিপাসার্ত্ত হইয়া যোগীপোলের মধ্যে এক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জল চাহিলে সে বাড়ীতে জল পাওয়া যায় নাই। গৃহস্থ এক মাইল দূরে নদীতে জল আনিতে গিয়াছিলেন। রামবিষ্ণু গুরুদেবের উপদেশক্রমে গঙ্গাস্নান যাত্রা রহিত করিয়া তখনই জমি ক্রয় করিয়া এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করেন। উহাই রামবিষ্ণু রায়ের দীঘি নামে পরিচিত।

হরনাথের ৩ পুত্র নিবারণ, বিধু এবং হৃদয়। প্রথম দুজনের পুত্র সন্তান নাই। হৃদয়ের ৩ পুত্র বর্ত্তমান।

পূর্ব্বপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ।

(১)

পূর্ব্ব পাড়ায় এক ঘর অবস্থাপন্ন চক্রবর্ত্তী ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইক্ষণে সে বংশের কেহই বর্ত্তমান নাই। পূর্ব্বপাড়ার মুখোপাধ্যায় এই চক্রবর্ত্তী বংশের দৌহিত্র। শ্যামরাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতৃপল্লী যশোহরের অন্তর্গত বোধখানা হইতে প্রথমে এখানে আসিয়া মাতামহদত্ত জমিতে বাস করেন। শ্যামরামের পিতা চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার অন্য দুই ভ্রাতা নন্দরাম এবং যোগেশ্বরও বোধখানা হইতে উঠিয়া আসেন। নন্দরামের বংশ সেনহাটীতে বাস করিতেছেন। তিনি সেনহাটী কুশারীদের ঘরে বিবাহ করেন। সে বংশে ডাঃ সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। যোগেশ্বরও সেনহাটী কাটানিদের ঘরে বিবাহ করিয়া বাস করিতে থাকেন কিন্তু তাঁহার ধারা এখন লুপ্ত। ইঁহারা কাচ্‌নার মুখটি দিবাকরের সন্তান। ইঁহাদের নবাব প্রদত্ত "রায়" উপাধি ছিল কিন্তু এই তিন ভ্রাতা সে উপাধি ত্যাগ করেন।

শ্যামরামের চারি পুত্র—রামদুলাল, রূপরাম, কৃষ্ণচন্দ্র এবং রামহরি। রূপরাম এবং কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ বর্ত্তমান। রূপরামের ৬ পুত্র—রাধানাথ, রঘুনাথ, রামজয়, রামকুমার, সদাশিব, রামকমল। শেষোক্ত ৩ জনের বংশ নাই। রাধানাথের পুত্র পীতাম্বর, তাঁহার পুত্র জনার্দ্দন এবং যজ্ঞেশ্বর। জনার্দ্দনের ৩ পুত্র, অক্ষয়, কেদার, পঞ্চানন। পঞ্চানন বাল্য কালেই দেহ

ত্যাগ করেন। কেদার গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাঁহার চরিত্র আদর্শ স্থানীয়; তাঁহার জীবনী অন্যত্র আলোচিত হইবে। অক্ষয়ের পুত্র কালীকুমার পশ্চিম প্রদেশ হইতে কুস্তী ইত্যাদি ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া গ্রামে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি দৌলতপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। যজ্ঞেশ্বরের ৩ পুত্র সতীশ, বীরেন, মণীন্দ্র। সতীশ বি, এন, রেল আফিসে চাকরী করিতেন, বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মণীন্দ্রও বি, এন্ রেল আফিসে এবং বীরেন পোর্ট কমিশনার আফিসে কাজ করেন।

রঘুনাথের পুত্র গদাধর ও সাগর। গদাধরের পুত্র রাখাল এবং সাগরের পৌত্র কৃপানাথ (কালিদাস) ইত্যাদি বর্ত্তমান। রাখাল ও কৃপানাথ রেলে চাকরী করেন।

রামজয়ের তিন পুত্র। সদাশিবের বংশ নাই। কমলাকান্তের প্রপৌত্র যোগেন্দ্রাদি ভিন্ন বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। রামজয়ের অন্যতম পুত্র ভোলানাথের পুত্র সন্তান নাই। দৌহিত্র গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্যামরামের অন্যতম পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের ৪ পুত্র—দ্বীপচন্দ্র, জয়চন্দ্র, ফটীক-চন্দ্র এবং ভৈরবচন্দ্র।

দ্বীপচন্দ্রের প্রপৌত্র সুরেশ বর্ত্তমান, ইহারা ভঙ্গ কুলীন। জয়চন্দ্রের বংশ নাই। ফটীকের পুত্র ফকীরচন্দ্র সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি দৌলতপুরে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন, তিনি সাত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, একদিন প্রত্যূষে ভৈরবনদকূলে কুঠির ঘাটে কাষ্ঠভ্রমে একটী কুম্ভীরের উপর বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, সকাল হইলে নীলকুঠির সাহেব দেখিলেন, তাঁহার দেওয়ান, ঠাকুর একটী কুম্ভীরের উপর বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন, কুম্ভীরকে গুলি করিবার জন্য তিনি বন্দুক উত্তোলন করিলেন, কিন্তু

পরক্ষণেই মনে হইল ইহাতে ঠাকুরের জীবন যাইতে পারে। তিনি বন্দুক হস্তে স্থির পুত্তলিকার ন্যায় ঠাকুরের আহ্নিক দেখিতে লাগিলেন, যতক্ষণ তিনি ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, ততক্ষণের মধ্যে কুম্ভীর একটুও নড়িল না। কিন্তু যখন তিনি আহ্নিক সারিয়া উপরে উঠিলেন, তখনই কুম্ভীরও লম্ফ দিয়া জলমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সাহেব ঠাকুরকে এই ঘটনার কথা বলিলে তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি ত ইহার কিছুই জানি না, একখানি কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া তাহার উপর বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলাম, যাহা হোক এই ঘটনায় ফকীরচন্দ্রের মনে বিরাগ উপস্থিত হয়। সন্ধ্যাহ্নিকে এত বল, না জানি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তিনি কত বলে বলীয়ান হইতে পারিবেন, ইহা মনে করিয়া তিনি দণ্ড লইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সন্ন্যাসী হইয়া ফকীরচন্দ্র কাশীধামেই অবস্থিতি করিতেন, ১২ বৎসর পরে মাত্র একদিনের জন্য দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার এক আত্মীয়া কাশীধামে গমন করেন, প্রথম দিন ফকীরচন্দ্র নিজ মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মীয়া পরদিন যাইয়া দেখিলেন, ফকীরচন্দ্রের দেহের রং তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিচ্ছটা নির্গত হইতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন এ সন্ন্যাসী আর তাহাদের ফকীর নাই, ইহাকে ধরিবার কল্পনা করাও তাঁহার বিশেষ অন্যায় হইয়াছে। তিনি মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ফকীরচন্দ্রের ভ্রাতা বিশ্বেশ্বরের বংশধরগণ পান্তাপাড়ায় বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম পুত্র ভৈরবচন্দ্র, তাঁহার পুত্র উমাচরণের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘকাল বাহারবন্দ পরগণায় পেস্কার ছিলেন। তিনি তাঁহার বাসাবাটীতে প্রত্যহ বহুলোককে অন্নদান করিতেন এবং বহুলোকের অন্নের সংস্থানও করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান

ছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করেন এবং নিঃস্বার্থ ভাবে তাহাদের হিতসাধন করেন, কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কাশীবাসী হন এবং সেইখানেই কলেবর ত্যাগ করেন।

(২)

পূর্ব্বপাড়ায় আর এক ঘর মুখোপাধ্যায় আছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে একঘরে দুই ঘর হইয়াছেন। তাঁহারা খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান, স্বভাবকুলীন; এখানে তাহাদের বাস অল্পদিনের। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য নামে ঐ বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার বংশে এখন কেহ নাই। বৈদ্যনাথের দৌহিত্র গিরিধর মুখোপাধ্যায় পিঠাভোগ হইতে এখানে আসিয়া মাতামহ বাড়ীতে বাস করেন। বংশ ও চরিত্রগুণে গ্রামে ও সমাজে গিরিধরের বিশেষ সুখ্যাতি ও সম্মান ছিল। তিনি ভুরি-ভোজী ছিলেন। একবার ৺শ্রীরাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। এই ব্রত প্রতিষ্ঠায় তালের বড়াপিঠা দিবার ব্যবস্থা আছে, আহারের শেষে দুই একখানি করিয়া বড়াপিঠা দিবার জন্য গৃহস্থ মাত্র একধামা পিঠা তৈয়ার করেন, গিরিধর ভুরিভোজনের পরেও পিঠা খাইতে আরম্ভ করিয়া একধামা পিঠাই খাইয়া ফেলিলেন, এবং আরও খাইতে পারেন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন, তখন গৃহস্থকে যোড়হাত করিয়া বলিতে হইল "খুড়া আজ মাপ করিতে হইবে. আর একদিন দেখিব।" গিরিধর হরি-সংকীর্ত্তন গানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রজনীকান্তেরও এই গানে পারদর্শিতা জন্মে। গিরিধরের ৪ বিবাহের মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ভজাত রজনীকান্ত, অপরার—সারদা, শ্যামাচরণ, যদু ও শরৎ। সারদা ও যদু বালককালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্যামাচরণ বসুন্দিয়া মাইনর স্কুলে সুখ্যাতির সহিত শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। এদেশে রেল আসিলে তিনি রেল বিভাগে প্রবেশ করেন, অনেকদিন পর্য্যন্ত ষ্টেশন

মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে থাকিয়া নানাবিধ সদনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ বিষয়ে তিনি হরিনাথ বাবুর বিশেষ সহায় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় সমাজেই তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তাঁহার আন্তরিক চেষ্টাতেই লক্ষ্মণ সেন সমাজে চলিত হয়েন। শ্যামাচরণ ১৩০৪ সালে ৯ই আষাঢ় তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। শ্যামাচরণের মাতা অম্বিকাসুন্দরী দেবী সেকালে আদর্শ গৃহিণী ছিলেন, পরিস্কার পরিচ্ছতার জন্য মুখার্জী বাড়ীর বিশেষ খ্যাতি ছিল, অম্বিকাসুন্দরীর তত্বাবধানে বহু গাভী প্রতিপালিত হইত, দুগ্ধ, ঘৃত, তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণ প্রস্তুত হইত, ফলতঃ পল্লীর শান্তি এই বাড়ীতে বিরাজিত ছিল। শ্যামাচরণের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ বামারঞ্জন পিতার ন্যায় তেজস্বী ছিলেন, পরোপকার তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। ১৩০৮ সালের ভীষণ মহামারীর সময়ে তিনি নির্ভীকচিত্তে রোগীদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন, জীবনের শেষভাগ তিনি বরিশালে যাপন করেন, সেখানেও বহু বসন্তরোগী ও অন্যান্য বিপন্নদের প্রাণ দিয়া সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে তিনি ইহলীলা সাঙ্গ করেন। শ্যামাচরণের মধ্যম পুত্র মনোরঞ্জন বালিকাবিদ্যালয়ের ২য় শিক্ষক। গ্রামের বহু সদনুষ্ঠানে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন, কনিষ্ঠ অতুলচন্দ্র ডাকবিভাগে চাকরী করিতেছেন। তিনি কলিকাতা পোষ্টাল ক্লাবের অন্যতম মেম্বর। গ্রামের নানাবিধ সংস্কারেও তিনি লিপ্ত আছেন।

পশ্চিমপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশের দৌহিত্র চট্টোপাধ্যায়।

পশ্চিমপাড়ায় একঘর মুখোপাধ্যায় ছিলেন, ইঁহাদের জ্ঞাতি লখপুরে বাস করেন। উমাচরণ এবং তারাচাঁদ দুই ভ্রাতা, তারাচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। উমাচরণের এক কন্যা ছিলেন তাঁহার পুত্র গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেনহাটী নিবাসী গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় গোপালের পিতা-মহ, ইঁহাদের বল্লভীমেল, কাশ্যপগোত্র, গঙ্গাধরে ভঙ্গ হইয়াছেন। গঙ্গাধরের পুত্র (গোপালের পিতা) রাজমোহন মাতামহ সম্পত্তি পাইয়া যশোহরের অন্তর্গত ইতনায় বাস করেন। রাজমোহনের অন্যপক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ ইতনায় বাস করিতেছেন, গোপাল মাতামহ সম্পত্তি পাইয়া মহেশ্বরপাশায় বাস করেন, গোপালের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ক্ষীরোদ ই, বি, রেলে কাজ করেন, মধ্যম শশধরও রেলবিভাগে চাকরী করেন।

রায় বংশ।

রায় বংশের আদিবাস ফরিদপুরের অন্তর্গত ফতেপুর নামক গ্রামে। ইঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। এখানে দুইঘর বাস করিতেছেন কিন্তু কে কখন প্রথম আসিয়াছিলেন তাহার কোন ঠিকানা নাই। রামকিঙ্কর রায়ের অন্যতম পৌত্র রামকিশোর, রামকিশোরের দুই পুত্র শিবচন্দ্র এবং তারাচাঁদ। শিবচন্দ্রের পুত্র মহিমচন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণ, শ্যামা-চরণের প্রমথ, মন্মথ প্রভৃতি ছয় পুত্র।

তারাচাঁদের পুত্র গোবিন্দ ও প্রসন্ন। প্রসন্ন এখান হইতে সেনহাটী যাইয়া বাস করেন। গোবিন্দের তিন পুত্রের মধ্যে শশধর ও কেশব বর্ত্তমান।

আর একঘর রায় ইহাদের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। যদুনাথ রায়ের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ রায় বর্ত্তমান।

মুখভারতের বংশ।

মহেশ্বরপাশার মুখভারতের বংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হরিদাস-পুরের কাঞ্জীবংশসম্ভূত, মহাত্মা কানুর সন্তান। কিন্তু এখানে কে প্রথম আসিয়াছিলেন তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এখানে রামরামেশ্বর সিদ্ধ হন এবং "মুখভারত" উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপ কথিত আছে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ এবং কনিষ্ঠ রামরামেশ্বর। রামনারায়ণ বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু রামরামেশ্বর নির্ব্বোধ ও মূর্খ ছিলেন, দ্বাবিংশবর্ষ বয়ক্রমের মধ্যে তাঁহার অক্ষর পরিচয়ও হয় নাই। এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে পণ্ডিত রামনারায়ণ নিমন্ত্রিত হইয়া পাঠকের কার্য্যে ব্রতী হয়েন, মহারাজার সুবিখ্যাত সভাপণ্ডিত রামধন শিরোমণি মহাশয় ধারকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজবাটীতে মাসাধিককাল এই কার্য্য চলিতে থাকে, এদিকে রামনারায়ণ বাড়ীর কথা একেবারেই ভুলিয়া যান, খরচের অভাবে সংসারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। জননী কনিষ্ঠ পুত্র রামরামেশ্বরকে রাজবাটী প্রেরণ করেন। রাজসভায় উচ্চ বেদীর উপর যখন পণ্ডিতগণ পুরাণাদি আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেই সময় বহুদিন পরে অগ্রজের দর্শন পাইয়া মূর্খ রামরামেশ্বর স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া মলিনবেশে বেদীর উপর জ্যেষ্ঠের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য সকলের দৃষ্টি এই আগন্তুকের উপর পড়িল, রামনারায়ণও অপ্রতিভ হইলেন। আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রামরামেশ্বরকে অনুজ বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন পরন্তু বাড়ীর ভৃত্য বলিয়াই

পরিচয় দিলেন। সরলচিত্ত রামরামেশ্বর অগ্রজের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন এবং আত্মহত্যা দ্বারা ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন মনস্থ করিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তিনি নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য লতাতন্তু খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে রাত্রিও গভীর হইয়া উঠিল, এমন সময় তিনি দেখিলেন এক দেবীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার দিব্য জ্যোতির ছটায় ঘন অন্ধকারময় কাননও অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস! আত্মহত্যা মহাপাপ। তোমার মনোব্যথা আমি বুঝিয়াছি, আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনঃকষ্ট দূর হইবে, তোমার যশঃসৌরভে দিকদিগন্ত পরিপূরিত হইবে। তুমি পুনরায় রাজসভায় গমন কর।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। রামরামেশ্বর দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অরণ্য হইতে বহির্গত হইলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে তিনি মলিনবেশে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অন্যের অলক্ষিতে সভার এক কোণে বসিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বদিনের ন্যায় মহাভারত পাঠ আরম্ভ হইল। মহাভারত সকলেই পুলকিতচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রামরামেশ্বর সভাস্থলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, মহাভারত পাঠে বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ আছে। মলিনবেশী বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাতুল বলিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা এবং সভাপণ্ডিত তাঁহাকে ভ্রম দেখাইবার জন্য আদেশ করিলে তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত ভ্রম দেখাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ভারত পাঠের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন এবং মুখে মুখে বিনা পুস্তকে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত বিবৃত করিলেন, ধারকের কোন প্রয়োজন হইল না। পণ্ডিতগণ রামরামেশ্বরের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সেই সভাতেই তাঁহাকে "মুখভারত" উপাধি প্রদান

করেন। সেই অবধি মুখভারতের বংশধরগণ দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। এই ঘটনায় রামনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ লজ্জিত হইয়া মহেশ্বরপাশা ত্যাগ করিয়া মূলঘর যাইয়া বাস করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণ মুলঘর এবং বরিশালে বাস করিতেছেন।

মুখভারতের দুই পুত্র—রামদেব বিদ্যালঙ্কার এবং রুদ্রদেব বিদ্যানিধি। রামদেবের পুত্র রামানন্দ ভারতী। ভারতীর ছয় পুত্রের মধ্যে রামলোচন, শ্রীধর এবং জগন্নাথের বংশ বর্ত্তমান। রামলোচনের বংশে ভগবতী, শ্রীধরের বংশে যজ্ঞেশ্বর ও ললিত এবং জগন্নাথের বংশে সুরেন্দ্র ও যতীন্দ্র বর্ত্তমান। ইহারা সকলেই রামানন্দ ভারতীর বৃদ্ধ প্রপৌত্র।

রুদ্রদেব বিদ্যানিধির দুই পুত্র, রাঘবরাম ন্যায়রত্ন ও গোকুলচাঁদ। গোকুলচাঁদের বংশধরগণ পাবলা গ্রামে বাস করিতেছেন। গোকুল চাঁদের পুত্র রূপরাম ন্যায়ভূষণ, তাঁহার দুই পুত্র সদানন্দ এবং শম্ভুনাথ। সদানন্দের পৌত্র নেপাল এবং শম্ভুনাথের পৌত্র গোপাল। গোপালচন্দ্র বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া দৌলতপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। তাঁহার চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ অনন্ত ইংরাজী সাহিত্যে এম্, এ, পাশ করিয়া কাশ্মীরের মহারাজার পৌত্রের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। নেপালের ৫ পুত্র।

রাঘবরাম ন্যায়রত্নের পৌত্র নীলমণি; তাঁহার দুই পুত্র প্রিয়ম্বর ও জয়ধন। প্রিয়ম্বরের পুত্র যদুনাথ এবং তাঁহার পুত্র মণীন্দ্রনাথ। জয়ধনের পুত্র বামনদাস, রাখালদাস (অকালে মৃত), গুরুদাস।

মুখভারতের বংশে ৩ পুরুষ পর্য্যন্ত অধ্যাপক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর আর বিদ্যার চর্চ্চা দেখা যায় নাই (বিশেষতঃ মহেশ্বর-পাশায়), ইহা মুখভারতের বংশীয়গণের পক্ষে বিশেষ কলঙ্কের কথা।

CamScanner

বিষ্ণুবংশ।

ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস মৌভোগ গ্রাম। ইহারা বিনোদখাঁর সন্তান বলিয়া পরিচিত। খাঁ নবাবসরকারের উপাধি। বিনোদ খাঁ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার নামের একটী রাস্তা মৌভোগ গ্রামে এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু এখানে কে প্রথম আসেন তাহার কোন ঠিকানা নাই। গোলোক বিষ্ণুর পুত্র হৃদয় এবং শশী ও ফকীরবিষ্ণুর ৪ পুত্রের মধ্যে নিবারণ বর্ত্তমান। শশী, এবং হৃদয়ের পুত্র সুশীল রেলবিভাগে চাকরী করিতেছেন।

মধ্যপাড়ার ভট্টাচার্য্য বংশ।

মথুরেশ তর্কবাগীশ নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধ্যপল্লী বা মাজপাড়া হইতে এইখানে প্রথম আগমন করিয়া মধ্যপাড়ায় বাস করেন। তিনি কাঁচনার মুখটী দিবাকরের সন্তান; বংশজ। সম্ভবতঃ তিনিই মহেশ্বরপাশার কাঞ্জিলাল বংশের এবং মধ্যপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আশ্রয়দাতা। মথুরেশের বংশে বর্ত্তমানে রাসবিহারী ভট্টাচার্য্যের পুত্র কাশীশ্বর, কেদারেশ্বর এবং শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র পঞ্চানন, বামাচরন; নিশিকান্ত প্রভৃতি মধ্যপাড়াতে এবং বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য বসুমিত্র পাড়ায় বাস করিতেছেন।

কাঞ্জিলাল বংশ।

কান্যকুব্জ হইতে প্রথম যে পাঁচজন বিপ্র বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় হইতে কাঞ্জিলাল বংশ সমুদ্ভূত। ছান্দড়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীধর কাঞ্জিলাল হইতে দশ পুরুষ অধস্তন কানু ও কুতুহল দুই ভ্রাতা সর্ব্বতোভাবে নবগুণ সম্পন্ন ছিলেন এবং উভয়েই গৌড়ভূপতি বল্লাল সেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সুরাই মেলস্থ এই কাঞ্জিলাল বংশ বহু বিস্তৃত। এই বংশে অনেক প্রসিদ্ধ এবং কুলক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন এবং রাজদত্ত 'ভট্টাচার্য্য' ও 'রাজ চক্রবর্ত্তী' উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি ঐ উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। মহাকবি জয়দেব গোস্বামী এবং বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ উভয়েই কাঞ্জিলাল বংশীয়। আরও শুনা যায় চন্দ্রগুপ্তের গুরু চাণক্য এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণেতা বোপদেব শাস্ত্রী উভয়েই বাৎস্য গোত্রীয় ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই বংশে যাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ স্থলে তাঁহাদের নামোল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না। সাগরদাড়ী নিবাসী শ্রীযুত যদুনাথ কাঞ্জিলাল, ডি, এল্, কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট, কলিকাতায় বাড়ী করিয়াছেন, ঐ পরিবারের শ্রীযুত মণীন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল, ব্যারিষ্টার (ক্যাণ্টাব্); তিনিও কলিকাতায় বাড়ী করিয়াছেন। গদখালি নিবাসী রায় বাহাদুর উপেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল, ডেপুটী কন্জারভেটর অব্ ফরেষ্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ রায় বাহাদুর শ্রীযুত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জামাতা শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার কাঞ্জিলাল, একস্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কন্জারভেটর অব্ ফরেষ্ট।

এই বংশের যাহারা মহেশ্বরপাশা গ্রামে বাস করিতেছেন তাহাদের পূর্ব্বনিবাস ফরিদপুরের অন্তর্গত হরিদাসপুর গ্রামে ছিল। ইঁহাদের



রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রামকিশোর কাঞ্জিলাল বিবাহসূত্রে এই গ্রামে আগমন করেন। মহেশ্বরপাশার মধ্যপাড়ার জনৈক ভট্টাচার্য্য (মথুরেশ তর্কবাগীশের বংশধর কেহ), সর্ব্ব মেলের কুলীনকে কন্যাদান করিয়া এই গ্রামে বসবাস করাইয়াছিলেন। এই ভাবে সুরাই মেল হইতে রামকিশোর কাঞ্জিলালকে আনিয়াছিলেন। রামকিশোরের পাঁচ পুত্র ছিল —দ্বীপচন্দ্র, রামকানাই, গুরুপ্রসাদ, রামরতন ও রামলোচন। বর্ত্তমানে যাহারা এই গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহারা গুরুপ্রসাদের বংশীয়। গুরুপ্রসাদের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের ৪ পুত্র, গোপাল, নৃপাল, হৃদয় ও উপেন্দ্র। গোপালের পুত্র ধ্রুব লোহের ফোরম্যান আফিসে ১১০৲ টাকা এবং নৃপালের পুত্র সুরেন্দ্র ডি এস ও আফিসে ১৫০৲ টাকা বেতনে কাজ করিতেছেন ; হৃদয় এবং উপেন্দ্র নিঃসন্তান। নবকুমারের পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র উপেন্দ্র এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার জীবনী আলোচনার যোগ্য। তিনি ইং ১৮৭১ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া তিনি অতি অল্পবয়সে ১৮৮৯ সালে ১৮৲ টাকা বেতনে ই, বি, রেলওয়ের অফিসে কেরাণীগিরি চাকরীতে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি যে আফিসে চাকরী করিতেন, একদিন সেই আফিসের বড় বাবুর টেবিলের উপর হাত রাখিয়া কোন কথা কহিতেছিলেন, তাহাতে সেই বড় বাবু চটিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"You should stand at a respectable distance." ইহাতে উপেন্দ্র বাবু মর্ম্মাহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন —"যদি বড় বাবু হইতে পারি তবে চাকরী করিব, নচেৎ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিব।" এই সংকল্প করিয়া তিনি ঘরে বসিয়া অধ্যবসায়ের সহিত লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন এবং আফিসেও কাজ করিতে থাকেন। সেই বড় বাবু এবং তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারীদের নানারূপ বাধা বিঘ্ন দেওয়া সত্ত্বেও উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন

হইলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই সেই আফিসের তুল্য অন্য এক আফিসের বড় বাবুর পদে নিযুক্ত হইলেন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৲ টাকা হইতে আজ তিনি মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতন পাইতেছেন, কিন্তু ইহাই উপেন্দ্র বাবুর গুণগ্রামের যথেষ্ট পরিচয় নহে। তিনি সুদীর্ঘকাল সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে সকল লোকহিতকর প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। সরকার বাহাদুর তাঁহার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়া ঐ সংক্রান্ত অনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন সেজন্য সমরবিভাগ হইতে তিনি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তিনি সনদ প্রাপ্ত হইবার সময় বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লিটন তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশংসা-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি এইরূপ—

"Rai Sahib Upendra Nath Kanjilal Since you joined the Eastern Bengal Railway 36 years ago you have worked with energy and loyalty. You have shewn yourself full of resources and prepared for every emergency, as for instance, when during a serious outbreak of cholera at Kanchrapara you arranged for medical attendance and the removal of the dead or when you rose from sick bed to quell a disturbance amongst the staff and thus saved a strike."

রায় সাহেব কাঞ্জিলাল কাঁচড়াপাড়ায় থাকিতে এক পিতৃহীন দরিদ্র. ব্রাহ্মণ বালকের অন্নের সংস্থান করিয়া দেন, এবং নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাঁহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বালক উৎকট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। রায় সাহেব তাহাকে নিজের বাসায়

রাখিয়া সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হইল না; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী অর্দ্ধোদয় যোগের দিন সে এক মাত্র মাতাকে অনাথা করিয়া চিরদিনের জন্য ইহ সংসার ত্যাগ করে। রায় সাহেব বালকের মাতাকে মা সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে সেই অবধি কাশীতে রাখিয়া আজও তাঁহার ভরণপোষণের ভার বহন করিতেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত রায় সাহেবের জীবনীতে বিরল নহে।

পশ্চিমপাড়ার সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চৈতলের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৺রবিকর চট্টো[illegible] শান্তিপুর নিবাসী ৺দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমপাড়ার ৺দুগাবর মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানে বাস করেন। বর্ত্তমানে এই মুখোপাধ্যায় বংশের হীনাবস্থা। এই বংশে আনন্দের পুত্র প্রতাপ বর্ত্তমান। সাহাপাড়ায় এক ঘর প্রবল প্রতিপত্তিশালী চক্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে জেলখানা পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া শুনা যায়। তাহাদের বংশ নাই। এই বংশীয় রঘুচক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া দুর্গাচরণ বটুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জমিতে বাস করেন, দুর্গাচরণের পুত্র হরিশচন্দ্র, হরিশ চন্দ্রের ৬ পুত্র। জ্যেষ্ঠ রজনীকান্ত খুলনা সহরে বাস করেন, তিনি নিঃসন্তান। আর কেহ জীবিত নাই, ৫ম, রামের পুত্র কালীপদ এবং কনিষ্ঠ শশীর পুত্র হরিপদ বর্ত্তমান।

পূর্ব্বপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশের আশ্রিত চট্টোপাধ্যায়।

এক সময় খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺হরষিত চট্টোপাধ্যায় কার্য্যোপলক্ষে মহেশ্বরপাশা গ্রামে আগমন করেন। তিনি স্বরাই মেল চাটুতিগাঁই, কাশ্যপগোত্রজ। তাঁহার পরিচয় পাইয়া পূর্ব্বপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশীয় শ্যামরামের পৌত্র রামজয় হরষিতের সহিত তাঁহার পিতা মাতার অমতে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। নববধূ লইয়া হরষিত দেশে গমন করিয়া বিতাড়িত হন। সুতরাং তিনি নিরুপায় হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়া শ্বশুর প্রদত্ত জমিতে বাস করিতে থাকেন। হরষিতের পুত্র গৌর, তাঁহার দুই পুত্র হরিমোহন এবং বরদাকান্ত। হরিমোহনের পুত্র সন্তান হয় নাই, মাত্র দুই কন্যা। বরদাকান্তের দুই পুত্র হারাণচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। কাহারও পুত্র সন্তান নাই। হারাণচন্দ্রের ৪ কন্যা এবং পূর্ণচন্দ্রের ১ কন্যা।

পশ্চিমপাড়ার বরেন্দ্রশ্রেণীর চক্রবর্ত্তী বংশ।

পশ্চিমপাড়ার বরেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানে আরও দুই ঘর ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা করঞ্জগাঁই এবং কাশ্যপ গোত্রীয় ৺প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তীর পুত্র অক্ষয়কুমার ফুলবাড়ী ইউ, পি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁহার জ্ঞাতি অন্নদাচরণের পুত্র বিশ্বেশ্বর বর্ত্তমান।

অন্যান্য বংশ এবং যাহারা মহেশ্বরপাশার নূতন বাড়ী করিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বাহিরদিয়া গ্রামের প্রসন্নকুমার ঘোষ মহেশ্বরপাশার টেকা সমাজের ৺রামধন মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পশ্চিম পাড়ায় বাড়ী করেন। প্রসন্নের দুই পুত্র উপেন্দ্র এবং দেবেন্দ্র। উপেন্দ্র ষ্টেসন মাষ্টার ছিলেন, অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি নিঃসন্তান। দেবেন্দ্র দৌলতপুর স্কুলে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়া সৈদপুর রেল আফিসে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় দক্ষতা বলে তিনি সামান্য বেতনের কেরাণী হইতে বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট লোকো আফিসের হেড্ক্লার্কের পদে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদও দৌলতপুর কলেজে আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া উক্ত আফিসে কেরাণীগিরি করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ পশ্চিমপাড়া হইতে উঠিয়া আসিয়া উত্তরপাড়ায় দারোগার দীঘির কূলে নূতন বাড়ী করিয়াছেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত চন্দ্রদীঘালিয়া গ্রামের শ্রীযুত ভুবনেশ্বর বসু. শ্রীযুত বিপিনবিহারী মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ভুবনেশ্বর মাহিনগরের বসু মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো কুলীন। পিতা ৺প্যারী মোহন বসু। তাঁহার ৬ পুত্র—বিশ্বেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, কাশীশ্বর, নকুলেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং বিজয়। মহেশ্বরপাশায় পুত্র কন্যাদের শিক্ষাদানের যথেষ্ট সুযোগ থাকায় ভুবনেশ্বর এখানে বাড়ী করিয়াছেন। জন্মস্থান চন্দ্রদীঘালিয়ায় তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্তই আছে এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ সেখানে বাস করিতেছেন। ভুবনেশ্বর মেধাবী ছাত্র, কলিকাতায় এফ, এ, এবং বি, এ, পাঠকালে মিঃ ক্রুস ও এডোওয়ার্ডস্ এবং ৺গৌরীশঙ্কর দে, ৺হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেণী, ৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, মিঃ ডি, এন্, দাস, প্রভৃতি মনীষিগণের পদপ্রান্তে বসিয়া ইংরাজী সাহিত্য, গণিত, রসায়ন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার ভাগ্য অনুরূপ ফল প্রদান করে নাই। তিনি ২৩ বৎসর যাবৎ মালদহের অন্তর্গত চাঁচল স্কুলে প্রথমতঃ ২য় শিক্ষক, পরে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কার্য্য যশের সহিত করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি চাঁচল রাজষ্টেটের একাউণ্টাণ্টরূপে রাজাবাহাদুর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় পানিহাটির কর বংশীয় শোলগাতি নিবাসী ৺পার্ব্বতী চরণ করের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র কর ভগ্নীপতি ৺উমাচরণ মিত্রের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র নিতাই ও গৌর।

দক্ষিণপাড়ায় দে, দাস ও বিশ্বাসবংশীয় কয়েকঘর কায়স্থের বসতি আছে। দে বংশীয় বিরিঞ্চিলাল নাগপুরে রেলবিভাগে উচ্চবেতনের কর্ম্মচারী। ৺কালীবাড়ীর দাসবংশীয় ৺হরিদাস সাধু প্রকৃতির বৈষ্ণব-ভক্ত ছিলেন। ভক্তসাধু গোঁপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবর্ত্তিত ৺কালীবাড়ী হরিসভার সহিত তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ব্বপাড়ায় ও কয়েক ঘর দে ও দাস আছেন। দে বংশীয় দুর্গাচরন, নেপাল, গোপাল প্রভৃতি কটকে কন্‌ট্রাক্‌টরী কার্য্যে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন, কটকে তাহাদের বাড়ী আছে। রেল লাইনের পরপারের দে বংশ এক সময় একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। বরদাকান্ত দাসের পুত্র ইন্দুভূষণ দাসের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য, তিনিও উড়িষ্যায় কন্‌ট্রাক্‌টরী করেন।

———

বারুজীবি জাতি। *

কলিকাতা হইতে খুলনার রেলরাস্তা মহেশ্বরপাশা গ্রামের পূর্ব্বাংশ ভেদ করিয়া গিয়াছে। এই রেলবর্ত্ম এবং ভৈরব নদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বারুজীবি জাতির বাস। আড়াই শতাধিক ঘর বিশিষ্ট পল্লী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম সদৃশ। মহেশ্বরপাশার বারুজীবি বহু বিষয়ে উন্নত। অনেকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। জাতীয় ব্যবসায়েও অনেকের অবস্থা উন্নত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইহাঁরা ভৈরবের কূলে বাস করিতেছেন কিন্তু ইহাঁদের আদিবাস গ্রামের অভ্যন্তরে বসুমিত্রপাড়াতে ছিল। মহেশ্বর ঘোষের আগমনের পরেই কেহ কেহ এখানে আসিয়া তাঁহার বাড়ীর নিকটেই বাস করেন। যখন ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, পর্টুগীজ ফিরিঙ্গী এবং দস্যুদের আর ভয় ছিল না তখন তাঁহারা নদীতীরে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের পালবংশ বহু গোষ্ঠী হইয়া পড়িয়াছেন। এই বংশের রতিকান্ত পাল প্রথম এইখানে আসেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত বলিয়া নামক গ্রামে ছিল। বর্ত্তমানে রতিকান্তর অধস্তন ১১শ পুরুষ চলিতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তিকালে এই বংশে শিবচন্দ্র নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বসুমিত্রপাড়ায় মিত্র বাড়ীতে তিনি প্রথমতঃ এক পাঠশালার শিক্ষক হন। গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ

* মহেশ্বরপাশার বারুজীবি সম্প্রদায় বর্ত্তমানে বহু বিষয়ে উন্নত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থের ন্যায় তাঁহাদের প্রত্যেক বংশের পৃথক বিবরণ দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিতের মধ্যেও অনেকে আমার সহিত সহযোগিতা করেন নাই, সেজন্য আমি অনেক বংশের ইতিহাস পাই নাই। গ্রন্থকার

জাতির বহু কৃতী ব্যক্তিই তাঁহার ছাত্র ছিলেন। পরবর্ত্তি জীবনে শিবচন্দ্র সার্কল পণ্ডিত হন। ছাপার ন্যায় তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল।

এই বংশের যোগেন্দ্রনাথ পাল উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। বাস্তবিকই তাহাতে কবিত্ব শক্তি ছিল কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে জানিনা ভগবান অতি অল্প বয়সেই তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন। অতি অল্প বয়সেই জ্যোতিষে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মে। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপিনচন্দ্র দৌলতপুরের নিকটে নূতন বাড়ী করিয়াছেন। ষষ্ঠীবর পাল সৈদপুর লোকো আফিসের হেডক্লার্ক. কালীকান্ত পাল বাচড়াপাড়া এবং ভারতের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পাল কাটিহারে রেল বিভাগে চাকরী করিতেছেন

রতিকান্তের অন্যতম পৌত্র অভিরামের বংশে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শশিভূষনের জন্ম হয়। এই বংশ চিরদিনই কলাবিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিল। শশিভূষনের পিতা শ্রীমন্ত পাল কবির দলের ওস্তাদ ছিলেন, তিনি মুখে মুখে মুখে ছড়া রচনা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার আশ্চর্য্য উপস্থিত বুদ্ধি ছিল, তিনি কবির দলের গান রচনা করিতেন। এই সময়ে পাড়াতে রামকৃষ্ণ দত্তের পুত্র কালাচরণ দত্তও কবির ছড়াদার ছিলেন। অনেক সময় উভয়ে লড়াই বাধিত। একবার কালী দত্ত শ্রীমন্তকে জগাই মাধাই এর বাপের নাম জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু শ্রীমন্ত তাহা জানিতেন না অথচ তিনি ঠকিবারও পাত্র নহেন। তখনই তিনি উত্তর দিলেন "শোন্‌রে শোন কালী দত্ত, তুই বড় অপদার্থ। জগাই মাধাই এর বাপের নাম রামকৃষ্ণ দত্ত।" জয় দত্ত নামে কালীর এক ভাই ছিল। শ্রীমন্তের ৩ পুত্র, পরেশ, পূর্ণ, শশী। পরেশ এবং পূর্ণ গান রচনা করিতে পারিতেন। জগদ্বিখ্যাত চিত্র শিল্পী শশিভূষণ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবনী পৃথক ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

প্রমথনাথ শশিভূষণের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহারই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন।

অভিরামের অন্যতম পুত্র রামচন্দ্রের বংশে কুঞ্জমোহন পালের পুত্রগণ (বরদা, সারদা, রতিকান্ত, কালীকান্ত) ফুলবাড়ী পল্লীতে নূতন বাড়ী করিয়া সেখানে বাস করিতেছেন। বরদার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারক ফটোগ্রাফার। ফুলবাড়ী মেরী পাঠশালার সেক্রেটারী রূপে তিনি স্কুলের উন্নতির জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

এই বংশের অন্য শাখার ধনঞ্জয়ের অন্যতম পৌত্র কেশব খুলনা জেলা স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার, সম্প্রতি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র হরষিত বি, এ, পাশ করিয়াছেন।

এখানে আরও কয়েক ঘর পাল আছেন, কিন্তু তাহারা এই বংশীয় নহেন। ৺রজনীকান্ত পাল রেলবিভাগে চাকরী করিয়া প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বাসা সর্ব্বদা অতিথি অভ্যাগতে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রনাথ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন গবর্ণমেণ্টের চাকরী করেন। উহা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে দৌলতপুর বাজারে একটী ঔষধের দোকান খুলিয়াছেন এবং নিজে প্রাক্‌টিস্ করিতেছেন। যতীন্দ্রনাথের খুল্লতাত পুত্র নগেন্দ্র নাথ ১৯০৯ সালে ঢাকা গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া খুলনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চাকরী গ্রহণ করেন। তিনি বর্ত্তমানে তালা ডিস্‌পেনসারীতে আছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ বি, এ, পাশ করিয়া কাননগো হইয়াছেন। এই পরিবারের শ্রীযুত রমানাথ পাল শিক্ষকতায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই পল্লীর দাস বংশও বহু পুরাতন। এইখানে কে প্রথম আসেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না কিন্তু তিনি মাণিকপীরতলায় বাড়ী করেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই বাড়ী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত

ছিল। এই স্থানের পুষ্করিণী এখনও দেওয়াল বাড়ীর পুকুর নামে পরিচিত। এই বংশে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দাস পিতার নামে মহেশচন্দ্র মেডাল ঘোষণা করেন। দৌলতপুর কলেজ হইতে যে বারুজীবি ছাত্র ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন তাহাকে উক্ত পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। উমেশচন্দ্র বহুদিন এই পুরস্কার দিয়াছেন, বর্ত্তমানে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উমেশচন্দ্রের বাড়ীতে গত ১৩২৫ সালের ২৬শে মাঘ সমগ্র বঙ্গদেশের বারুজীবি সম্প্রদায়ের এক বিরাট সভা (Conference) হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হন।

এই বংশের শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ দাস সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেছেন। তিনি গত যুদ্ধে গিয়াছিলেন। শ্রীযুত শিবেন্দ্রনাথ দাস, বি, এস্, সি, দিল্লী গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরী করিতেছেন। শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাস বি, এল্। ইনিও দিল্লীতে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট আফিসে ১০ বৎসর চাকরী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে খুলনায় ওকালতী করিতেছেন।

বসুমিত্রপাড়ায় এই পল্লীর একঘর দত্ত বাস করিতেন। রামদেব দত্ত সেনহাটী হইতে আসিয়া বাস করেন। ইহার পৌত্র নসীরাম দত্তের পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান, উহা ৺উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণের অধিকারে আছে। নসীরামের পৌত্র বদনচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন। মনিবের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় বসুমিত্রপাড়া পরিত্যাগ করেন। এই বংশে ধ্রুবনাথ দত্ত অবসরপ্রাপ্ত ষ্টেশনমাষ্টার এবং লক্ষ্মীকান্ত দত্ত রেলওয়ে আফিসের পে-ক্লার্ক। মালঞ্চর নিকটে কয়েক ঘর দত্ত বাস করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত ষ্টেশন মাষ্টার। বিনোদবিহারী এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার। শশিভূষণ দৌলতপুর স্কুলের অন্যতম মেধাবী ছাত্র

CamScanner



মদন ভদ্র ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সমাধি।

[পৃষ্ঠা ১২৯।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

ছিলেন। এফ, এ, পাশ করিয়া তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং যথা সময়ে কৃতিত্বের সহিত এল্ এম্, এস্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, বর্ত্তমানে তিনি এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, গবর্ণমেণ্ট চাকরী করিতেছেন। জগদ্বন্ধু রাহা মহেশ্বরপাশা হাই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক। তিনি বাংলাভাষায় উপাধিধারী এবং বাংলা রচনায় তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব আছে। উত্তর-পাড়ার সেনবংশ উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণপাড়ার ৺কৃষ্ণমোহন নন্দীর পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল নন্দীর নাম এ স্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতি দৈন্য অবস্থা হইতে কঠোর অধ্যবসায় গুণে কেমন করিয়া জীবনে উন্নতিলাভ করা যায়, রামলাল তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হইয়া তিনি এমন দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন যে স্কুলে পড়িবার জন্য তাহাকে অপরের কৃপাপ্রার্থী হইতে হয়, কিন্তু আজ তিনি মহেশ্বরপাশা কৃষ্ণমোহন হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং তত্ত্বাবধায়ক। স্কুলে পাঠকালে ৺ইন্দুভূষণ মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহার জন্য তিনি স্কুলে বিনাবেতনে পড়িবার অনুমতি পান। কিন্তু ১৩০২ সালে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার পরে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং ৬ মাস পরে পুনরায় স্কুলে গেলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে বিনাবেতনে পড়াইতে অস্বীকার করেন, সুতরাং রামলাল পড়া ছাড়িয়া দিয়া সুন্দর-বনের অন্তর্গত লাউডোব্ চকে বিনা সেলামীতে কিছু জঙ্গল জমী লইয়া নিজহস্তে আবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ঐ জমি সম্পূর্ণ উঠিলে তিনি পুনরায় ১৩০৪ সালে দৌলতপুর স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া একজন আত্মীয়ের সাহায্যে দুই বৎসর পড়িয়া ১৩০৬ সালে এন্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কিছু দিন খুলনা জেলাস্কুলে শিক্ষকতা করিয়া গবর্ণমেণ্ট বনবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৩৩০ সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। চাকরী জীবনে ১৩১৬ এবং ১৩২৬ উভয় ঝটিকাবর্ত্তের সময়

শিব্‌সা নদীর মোহনায় এবং গঙ্গাসাগরের নিকট বহুলোকের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হন এজন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার এবং উচ্চপ্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হন।

বহু দরিদ্র ছাত্র আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাভাবে লেখাপড়া শিখিতে পারে না ইহা তিনি নিজের জীবনে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। এজন্য মহেশ্বরপাশা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে নিয়মিত সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের স্থায়ী উপকারের কথা সময় সময় তাঁহার মনে জাগিত। ভগবান তাঁহার আকাঙ্খাও পূর্ণ করিয়াছেন। ১৯২০ সালে [illegible] মাসে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বাড়ী আসিলে ৺রমেন্দ্রনাথ বসুর নিকট হইতে তাঁহার স্থাপিত মাইনর স্কুল (আসবাবপত্রসহ) ক্রয় করিয়া লয়েন। পর [illegible] জানুয়ারীর ১৩ই তারিখে ইহা হাই স্কুলে পরিণত হয়, এই স্কুলের জন্য রামলাল এ যাবত বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, অনেক দরিদ্র ছাত্র এখানে বিনাবেতনে শিক্ষালাভ করিতেছে।

এই সম্প্রদায়ের আর এক মহাপুরুষের নামোল্লেখ না করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতে পারিতেছি না, ইহার নাম মদন ভদ্র। তিনি সন ১৩০৩ সালের ২৬শে ভাদ্র সমাধিস্থ হইয়াছেন। তিনি প্রথম বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কিছুকাল সংসারে উদাসীন হইয়া থাকেন। পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভৈরব নদের অপর পার দীঘালিয়ার বাওয়ালীঘাটার উপরে এক গাছতলায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। ইহার পর প্রায় ১২ বৎসর সেনহাটীর ভগবতীতলায় থাকিয়া নগরের ঘাটে আইসেন এবং এখানে তিনি কয়েক বৎসর বাস করেন। এখানে তিনি ঘট পাতিয়া পূজা করেন এবং একবার বিরাট আয়োজনে অন্নসত্র দেন। এখান হইতে বাড়ী আসিয়া রাস, দেল, দোল, দুর্গোৎসব, রথযাত্রার উৎসব প্রভৃতি করেন। একবার প্রচণ্ড নিদাঘে দৌলতপুরে



চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি

[পৃষ্ঠা ১২৯

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে)

জীবন জোদ্দারের রাস্তার পরে জলসত্র দিয়া তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন। দীঘালিয়া থাকা সময় হইতেই তিনি "ঝাড়াফুকা" দ্বারা ব্যাধি নিরাময় করিতে থাকেন। তাঁহার বাড়ীতে শনি ও মঙ্গলবারে বহু রোগীর সমাগম হইত। তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রকাশ। এক সময়ে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, "মদন ভদ্রের পড়তা" এই প্রবাদ এদিকে এখনও প্রচলিত। তিনি দেহরক্ষা করিলে বাড়ী-তেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

১৩১৬ সালের ২৪শে শ্রাবণ তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহ সংসার ত্যাগ করিলে তাঁহাকেও স্বামীর পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়, দুটী সমাধির উপর দুটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

মজুমদারদের সাত সরিকের পুষ্করিণী খননে এক বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। উহা মদনভদ্রের বাড়ীতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

মদন ভদ্রের পরলোক প্রাপ্তির পরে তৎপুত্র গোবিন্দ পৈতৃক ব্যবসা করিতেছেন। দেশের যাবতীয় সৎকার্য্যে তাঁহার উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তরপাড়ায় কয়েকঘর বারুজীবি আছেন। জাতীয় ব্যবসায়ে প্রায় সকলেই উন্নত, শ্রীযুত বরদাকান্ত পাল নানাবিধ চালানি কারবারে অব-স্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

অন্যান্য জাতি।

বারুজীবির পরে গন্ধবণিকের নাম করা যাইতে পারে. এখানে প্রায় ১৫।১৬ ঘর গন্ধবণিকের বাস। তাহারা কোন্ সময় কোথা হইতে আসিয়া এখানে প্রথম বাস করেন তাহা কেহ বলিতে পারেন না। দুঃখের বিষয় এ জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত মোটেই নাই, সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সকলেই জাতীয় ব্যবসা করিতেছেন।

* * * * *

এখানে ৭। ৮ ঘর কর্ম্মকার আছেন, উত্তরপাড়ায় (করাতিয়া ঘোষ বংশের বাড়ীর নিকটে) একঘর কর্ম্মকার আছেন, তাহারা করাতিয়ার ঘোষ বংশ কর্তৃক এখানে আনীত। এই বংশের শ্রীযুত শ্যামাচরণ কর্ম্মকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র এবং গ্রামের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি ১৯১৯ সালে সসম্মানে বি, এ, পাশ করেন, ১৯২১ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ, এবং ১৯২৪ সালে বি, এল, পাশ করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকরী করিতেছেন। পশ্চিমপাড়ায় যাহারা বাস করিতেছেন, তাহাদের অধিকাংশেরই জাতীয় ব্যবসা উপজীবিকা। শ্রীযুত নেপালচন্দ্র কর্ম্মকার ষ্টেশনমাষ্টার, উপেন্দ্রনাথ রেল আফিসে কাজ করিতেছেন।

* * * * *

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে আড়ংঘাটা পল্লীতে ২০।২২ ঘর সুবর্ণবণিকের বাস আছে। নানাবিধ ব্যবসায়ে ইহাদের অনেকেরই অবস্থা উন্নত। এই সম্প্রদায়ের উদয়চাঁদ দের স্ত্রী ভাগ্যমণি দাসী এক সময়ে দৌলতপুর স্কুলের উন্নতিকল্পে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের রাহাবংশ উল্লেখযোগ্য। ৺ভোলানাথ রাহা দৌলতপুর নীলকুঠীর খাজাঞ্চি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র প্রহ্লাদ

চন্দ্র উক্ত নীলকুঠীর আমিন ছিলেন। প্রহ্লাদের পুত্রগণ দ্বিজবর, নীলাম্বর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান্বিত। এই বাড়ীতে সন ১৩২১ সালে, যশোহরের অন্তর্গত ভাটপাড়া নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীযুত ললিতমোহন গোস্বামী মহোদয়ের পরিচালিত শ্রীশ্রীগৌরভক্তি প্রদায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই অবধি প্রতি বৎসরই ইহার বাৎসরিক উৎসব প্রতিপালিত হইতেছে। দিবসত্রয় ব্যাপী সভায় ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা, অষ্টপ্রহর হরিনাম কীর্ত্তন, নগর কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রভুপাদ শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীযুত কুলদাপ্রসাদ ভাগবত-রত্ন, শ্রীযুত নৃত্যগোপাল গোস্বামী ভাগবত-শিরোমণি, শ্রীযুত বিনোদবিহারী বেদরত্ন, সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ শ্রীযুত কিশোরীমোহন গুপ্ত, এম্, এ, ব্যাকরণতীর্থ, প্রভৃতি মনীষিগণ এই সভায় যোগদান করিয়া থাকেন।

* * * * *

পূর্ব্ব ও পশ্চিমপাড়ায় কয়েকঘর কুণ্ডু আছেন, জাতীয় ব্যবসাই অধিকাংশের উপজীবিকা। এই সম্প্রদায়ের গঙ্গাচরণ, চণ্ডীচরণ এবং অক্ষয়কুমার ষ্টেসন মাষ্টার। গঙ্গাচরণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; তিনি বনগাঁ ষ্টেশনে ৺সাতুলাল মজুমদারের অনুগ্রহে "পানিপাড়ে" হন কিন্তু সাতুলাল শীঘ্রই এই বালকের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং উচ্চ অন্তঃকরণ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে নিজেই লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন এবং পরে রেলে ঢুকাইয়া দিলেন। সাতুলালই গঙ্গাচরণের উন্নতির মূল এবং সাতুলালের নামে এখনও তাঁহার মস্তক নত হয়।

* * * * *

পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাড়ায় ৫।৬ ঘর করিয়া ১০।১২ ঘর কুম্ভকারের বাস। কৃষি এবং জাতীয় ব্যবসাই উপজীবিকা। পূর্ব্বপাড়ার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি চিত্রশিল্পী রায়সাহেব শ্রীযুত

শশিভূষণ পাল মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়া তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বেলেঘাটায় Calcutta Model Works এ কাজ করিতেছেন। তৈলচিত্র ও মৃৎশিল্পে (Oilpainting and Clay model) এ যাবৎ ৮।১০টা স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক ও ১৫।১৬ খানা উচ্চাঙ্গের প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

* * * * *

মহেশ্বর ঘোষের সহিত ভবানন্দ পরামাণিক আসিয়া কালীবাড়ীতে বসতি করেন, তাহার বংশধরগণ এখন বহুগোষ্ঠী, কোপার কূলে বাস করিতেছেন। জাতীয় ব্যবসার সহিত কৃষিকর্ম্ম করিয়া কাহারও কাহারও অবস্থা বেশ উন্নত হইয়াছে।

* * * * *

মহেশ্বর ঘোষের সঙ্গে তাঁহার ভৃত্যরূপে একজন নমঃশূদ্র আসিয়া পশ্চিমপাড়ায় বাস করেন; একজন হইতে বর্ত্তমানে ১০।১২ ঘর হইয়াছে; কৃষিকর্ম্ম তাহাদের উপজীবিকা। চরণ সরদার ভ্রাতৃগণের অবস্থা উন্নত এবং তাহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারও আদর্শ পরিবার।

* * * * *

পশ্চিমপাড়ার চাটুয্যে বাবুদের বাড়ীর নিকটে সাহাপাড়া অবস্থিত, এখানে প্রায় ২৫।৩০ ঘর সাহা আছে। এখানে ইহাদের আগমন অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। এই স্থানে একঘর সঙ্গতিপন্ন অতি পুরাতন চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণপরিবারের বাস ছিল। তাহাদের বাড়ীতে ১০।১২টা ধানের গোলা এবং পর্ব্বত প্রমাণ ধান্যস্তূপের গল্প এখনও বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায়। তাহাদের বাড়ীতে জেলখানা ছিল, এইরূপ কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে, বর্ত্তমানে এই বংশের কোন চিহ্নই নাই।

মদ্য বিক্রয় সাহাদের প্রধান ব্যবসা, বর্ত্তমানে অনেকে পানের ব্যবসা ধরিয়াছে।

* * * * *

CamScanner

ভৈরবের কূলে নগর পল্লীতে কয়েক ঘর পাটনী এবং পুণ্ডরীকের বাস। তিলক পুণ্ডরীক দীর্ঘজীবি ছিলেন। শতাধিক বর্ষ বয়সেও যুবকের ন্যায় শক্তি ধারণ করিতেন, তাহার একান্নবর্ত্তী পরিবার আদর্শস্থানীয় ছিল।

পুণ্ডরীকের পুরোহিত দ্বিজবর চক্রবর্ত্তী পাঠশালার শিক্ষক। তিনি রামায়ণ গাহিয়াও দেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহার পিতা ৺বদন চক্রবর্ত্তী এবং পিতামহ ৺রাধামোহন চক্রবর্ত্তীও প্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক ছিলেন।

মুসলমান।

মহেশ্বরপাশার মুসলমানগণ তেলিগাতি, থানাবাড়ী, কার্তিকের কূল, বুঁজিতলা, সরদারডাঙ্গা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিতেছেন। সম্ভ্রান্ত দুই চারি ঘর ব্যতীত আর সকলেই কৃষিকার্য্য করেন। দিনমজুরের সংখ্যাও কম নহে। আড়ংঘাটার সরদার বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ। তাহাদের নাম হইতে পল্লীর নাম সরদার ডাঙ্গা হইয়াছে। এই বংশে হাজি মকলেস্ আহম্মদ সরদার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৩১১ সালে মক্কায় যাইয়া মদিনা ইত্যাদি ঘুরিয়া ১৩১২ সালে ফিরিয়া আসেন। তিনি দেয়ানার শশিভূষণ রায় এবং মহেশ্বরপাশার পিয়ারীচরণ মজুমদার, কৈলাসনাথ মজুমদার, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র বসু প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া সালিসী করিতেন এবং সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে যোগ দিতেন। এই বংশের চেরাকালী সরদারের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি এবং দেয়ানার সুবল রায়, বয়রার নয়ান মজুমদার, শিরোমণির হাজি গোলামকাদের, বিরাটের সাদেক মোল্লা প্রভৃতি একত্র মিলিত হইয়া রেণীসাহেবের সহিত যুদ্ধ করিতেন। তাঁহাদের তাঁবেদারে অনেক লাঠিয়াল থাকিত। নৈহাটী গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ শিবনাথ ঘোষ ইহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সাদেক মোল্লার গুলি গোল্লায়
রেণীর দর্প হ'ল চুর।
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা
বাংলায় বাঙ্গালী বাহাদুর॥

এই বীরত্বসূচক প্রবাদ এখনও লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মীরের ডাঙ্গার চৌধুরী বংশও সম্ভ্রান্ত। কথিত আছে তাঁহারা পূর্ব্বে

চৌধুরী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কোন্ সময় কি অবস্থায় পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। সৈয়দলাল নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক চৌধুরীদের কন্যা বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস করেন। লোকে তাহাকে মীর (মোড়ল) বলিয়া ডাকিত। সেই অবধি তাহার বংশধরগণ মীর নামে পরিচিত আছেন। এই বংশে খয়রাত আলি এখনও ১১৯ বৎসর বয়সে জীবিত আছেন। মীরেরডাঙ্গার মুনসীবংশও প্রসিদ্ধ। এই বংশের বকাউল্লা মুনসী পাঠশালার প্রসিদ্ধ গুরু ছিলেন, দেশের মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং এইরূপ কথিত আছে তাঁহার শিক্ষাদান কোন স্থানেই ব্যর্থ হয় নাই, তাঁহার ছাত্রগণ সকলেই উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বকাউল্লার পুত্র দীনআলি মুনসীও প্রসিদ্ধ গুরু ছিলেন। দীন আলির পুত্রগণের মধ্যেও তিনজন পাঠশালার শিক্ষক হন। আছিরদ্দি মুন্সী বর্ত্তমান। দীন আলির অন্যতম পুত্র আবদুল মুন্সী শ্বশুরালয় দৌলতপুরের নিকট কাশীপুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তিনি এতদ্দেশের একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন, গত ১২৩৪ সালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্যামগঞ্জ পল্লীর মে নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। শ্যামগঞ্জের তাহির মুনসী সেকালের একজন পাঠশালার প্রসিদ্ধ গুরু ছিলেন। মহেশ্বরপাশার অনেক বৃদ্ধের প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহারই নিকট হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিবিধ।

১। শিক্ষা।

ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে লোকে সংস্কৃত এবং আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত। স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী ছিল এবং মহেশ্বরপাশায় এক সময়ে একাদিক্রমে বহু অধ্যাপক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সেকালে সংস্কৃত শিক্ষা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত, দৈবাৎ দুই একজন কায়স্থ সন্তান সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। কিন্তু কায়স্থগণ নবাব সরকারে চাকরী করিবার জন্য অধিকাংশই আরব্য ও পারস্যভাষা শিক্ষা করিতেন, কারণ তখন ইহাই রাজভাষা ছিল।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। আধুনিক যুগে ৺রজনীকান্ত ন্যায়রত্ন নিজবাটীতে টোল খুলিয়া দেশ বিদেশের ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়াছেন। দৌলতপুর কলেজ সংসৃষ্ট চতুষ্পাঠীতেও অনেক ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অর্থকরী বিদ্যার উপর লোকের আগ্রহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় সংস্কৃত শিক্ষায় লোকের সমধিক আস্থা লক্ষিত হয় না।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় আরব্য ও পারস্য ভাষার চর্চ্চাও লোপ পায় অথচ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য তখনও বেশী লোকের আগ্রহ দেখা যায় নাই। গ্রাম্য পাঠশালার লোকে সামান্য বাংলা লেখা পড়াই শিখিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Calcutta University) প্রতিষ্ঠার পরে (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজী শিক্ষার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বত্রই

CamScanner

উৎসাহ এবং আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ইং ১৮৬৭ সালে তদানীন্তন যশোহর জেলায় মাত্র ৩টী মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়, একটী দৌলতপুরে একটী খুলনায় এবং তৃতীয়টী বাগেরহাটে, ভৈরবকূলে মাত্র এই তিনটী স্কুলই পাশ্চাত্যশিক্ষার আশ্রয় স্থল হয়। এই তিনটীই পরে উচ্চইংরাজী (High English) বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বলাবাহুল্য দৌলতপুর স্কুলই মহেশ্বরপাশাবাসীর ইংরাজী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রভূমি।

সৈদপুর ট্রাষ্ট এষ্টেটের কাছারী বহু পূর্ব্ব হইতে দৌলতপুরে অবস্থিত আছে। এই সময়ে ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বিদ্যানুরাগী, পরোপকারী ভদ্রলোক সৈদপুরের ম্যানেজার রূপে কাছারী বাড়ীতেই বাস করিতেন। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় এবং গ্রামবাসীগণের উৎসাহে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে দৌলতপুর স্কুল স্থাপিত হয়। দৌলতপুর বাজারে ৺গৌরমোহন সাহা নামে এক ধনী ব্যবসাদার ছিলেন তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে মাত্র ৫৪ জন বালক এবং সেনহাটী নিবাসী বাবু অভয়কুমার সেন নামক একজন শিক্ষক লইয়া এই স্কুল প্রথম বসে।

ট্রাষ্ট এষ্টেটের ম্যানেজারের চেষ্টায় স্কুলটী শীঘ্রই এষ্টেটের স্কুল বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহার ব্যয় ভার এষ্টেট বহন করেন।

এই সময়ে সদাশয় মিঃ মন্‌রো সাহেব যশোহরের কালেক্টর এবং এষ্টেটের এজেণ্ট ছিলেন। তিনি এই স্কুলের উন্নতির জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় স্কুল বর্ত্তমান ষ্টীমারঘাটার নিকটে ভৈরবের উপর একটী সুন্দর বাংলোতে স্থানান্তরিত হয়। এই বাংলো পূর্ব্বে নীলকর সাহেবের বাসভবন ছিল। নীলব্যবসা উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গৃহ ট্রষ্ট এষ্টেট অধিকার করেন এবং পরে স্কুলের জন্য প্রদান করেন। এই সঙ্গে মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাদ্রাসা খোলা হয় এবং তাহাদের বেতন মাত্র ৵০ আনা নির্দ্ধারিত হয়, কারণ তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিতে চাহিতেন না, তাঁহারা মনে করিতেন ইংরাজী শিখিলে

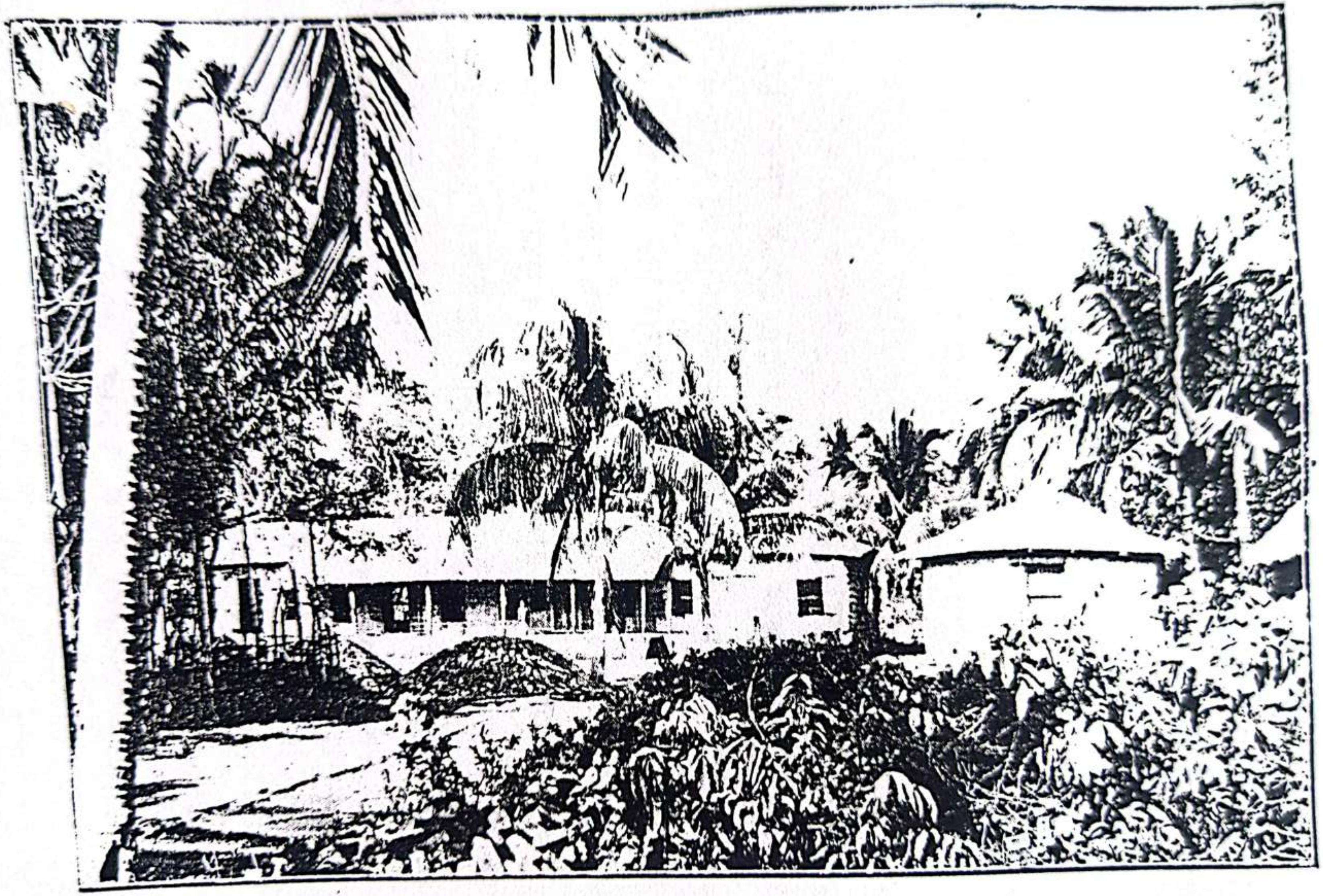
CamScanner

তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল হইতে ১৩ জন ছাত্র মাইনর পরীক্ষা দেন এবং ১ জন বাদে সকলেই সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ইহার মধ্যে এই গ্রামের বাবু কুঞ্জবিহারী মজুমদার এবং সিদ্ধিপাশার বাবু যাদবচন্দ্র দাস বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহাতে স্কুলের সুনাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট হইতে ৩০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হয়। অতঃপর মিঃ স্মিথ্ যশোহরের কালেক্টার হইয়া আসেন। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় ইং ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা হাই স্কুলে (H. E. School) পরিণত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে ৩৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হয়।

ইং ১৮৮৭ সালে কোন দুষ্ট লোক আগুণ দিয়া স্কুলের লাইব্রেরী এবং বহু আসবাব পত্র পোড়াইয়া দেয়, এই সময় ক্লে সাহেব খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় ট্রাষ্ট এষ্টেট হইতে ৩৩০০৲ টাকা ব্যয়ে একটা সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৮৮ সালের ২৪শে মার্চ শনিবার অপরাহ্নে পুনরায় আগুণ লাগিয়া স্কুল ভস্মীভূত হয়। এষ্টেট পুনরায় ২২০০৲ টাকা মঞ্জুর করেন এবং ৪ মাসের মধ্যে গৃহ নির্ম্মিত হয়। ইহার পর আরও একবার গৃহদাহ হয় পরে ইষ্টকালয় হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে এই স্কুল এতদ্দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল বলিয়া পরিচিত। ট্রাষ্ট এষ্টেট এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুসলমান ছাত্রগণ এইক্ষণে ইংরাজী পড়িতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন না। ইং ১৮৯৩ সালের কমিটিতে স্থিরীকৃত হয় যে তাহারা অর্দ্ধবেতন দিবেন কিন্তু এই সময়ে স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার পরিদর্শনে আসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে মুসলমান ছাত্রদের বেতন ⅔ অংশ হওয়া উচিত কিন্তু নিম্নসংখ্যা ।০ আনার কম হইবে না, সেই অবধি এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে এক এক বিভাগে (Section) নির্দ্দিষ্ট



মহেশ্বরপাশা কে, এম্, এইচ, ই, স্কুল ।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য ।)

সংখ্যক ছাত্রের অধিক ভর্ত্তি করা যায় না। এরূপ অবস্থায় নূতন বিভাগ খুলিতে হয়, সুতরাং তাহাতে অধিক শিক্ষকের প্রয়োজন। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে এক সময় এই জন্য কতকগুলি ছাত্র স্কুল হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। ইহাদিগকে লইয়া স্কুলের তদানীন্তন অন্যতম শিক্ষক ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, দৌলতপুরের শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এবং মহেশ্বরপাশার ৺রমেন্দ্রনাথ বসু দৌলতপুরেই একটী মাইনর স্কুল স্থাপিত করেন। কিছু দিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের মতানৈক্যে একটী স্কুল ভাঙ্গিয়া দুটী হয় এবং ৺কালীপ্রসন্ন বাবুর স্কুল জাতীয়বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ৺রমেন্দ্রনাথ বসুর স্কুল মহেশ্বরপাশার বাবু রামলাল নন্দীর কর্ত্তৃত্বাধীনে ও স্বত্ত্বাধিকারীত্বে আইসে এবং ইং ১৯২১ সালের ১৩ জানুয়ারী তারিখে ইহা হাইস্কুলে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ইহা দৌলতপুর স্কুলের এক মাইল অন্তরে মহেশ্বরপাশার পূর্ব্বপ্রান্তে যশোহর রাস্তার পরে স্থানান্তরিত হইয়াছে, এই স্কুল মহেশ্বরপাশার অন্যতম গৌরব এবং এজন্য বাবু রামলাল নন্দী মহেশ্বরপাশাবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

দৌলতপুর এবং মহেশ্বরপাশা স্কুলে মহেশ্বরপাশার বালকদের ইংরাজী শিক্ষা চলিতেছে। উচ্চতর শিক্ষার জন্য দৌলতপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাত্রৈডাঙ্গা নিবাসী, হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্, মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে ইং ১৯০২ সালে এই কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ৺দধিবামন দেব নামক শালগ্রামশিলার নামে ইহা উৎসর্গীকৃত। বর্ত্তমানকালে ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে। এখানে আই, এ; আই, এস্, সি; বি, এ; বি, এস্ সি, পাশ ও অনার কোর্স পড়ান হয়। এই কলেজ হইতে অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। বিদেশের বহু ছাত্র মহেশ্বরপাশার অনেক গৃহস্থ বাড়ীতে থাকিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

মহেশ্বরপাশা গ্রামে প্রাইমারী শিক্ষার জন্য ৪টী ইউ পি (উচ্চপ্রাথমিক) এবং অনেকগুলি এল্, পি, (নিম্নপ্রাথমিক) স্কুল আছে ইহার মধ্যে মজুমদার পাড়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের স্কুল সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার হেড্ পণ্ডিত সেনহাটী নিবাসী শ্রীযুত হরনাথ দাস প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিতেছেন। এক সময়ে তাঁহার হাতে মহেশ্বরপাশার বহু ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ স্কুলের সে পূর্ব্বশ্রী নাই। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের উদাসীনতা ইহার অন্যতম কারণ।

এদিককার ইউ, পি, স্কুলের মধ্যে ফুলবাড়ী মেরী পাঠশালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই স্কুল ১৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। চারি জন শিক্ষক দ্বারা স্কুলের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়, বর্ত্তমানে ছাত্র সংখ্যা শতাধিক। গত ১৯১৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই দুই একজন ছাত্র উচ্চপ্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া এ পর্য্যন্ত বিদ্যালয় হইতে ৬।৭টী ছাত্র প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সদরে মাত্র একটী বৃত্তির ব্যবস্থা সত্ত্বেও, উহা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তীর কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ শিক্ষাদানে গ্রাম মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট সুনামও আছে। সম্প্রতি এই স্কুলসংলগ্ন একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এস্থলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে এই গ্রামের উচ্চপ্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। প্রায় ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে ইং ১৮৬৪ সালে ৺শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক আত্মীয়স্বজনবিহীন বিদেশী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ৺রাইচরণ মজুমদার মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে এই বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ইহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় যদুনাথ ঘটক মহাশয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে বৃত হন, তিনি আজীবন এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টা করিয়া

গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। তিনি অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে গ্রামের বিশেষতঃ বালিকা বিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূরণ হইবে না। এস্থলে স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩১৬ সালের ঝড়ে পূর্ব্ব গৃহ পড়িয়া গেলে বিদ্যালয় কেদারবাবুর বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। ইহার নানাবিধ অভাব তিনি প্রাণ দিয়া অনুভব করেন এবং সে অভাব মোচনার্থ তিনি সময়ে সময়ে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত আসবাব এখনও স্কুলে বর্ত্তমান আছে।

৺যদুনাথ ঘটক মহাশয়ের পরে এই গ্রামনিবাসী ৺সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। তিনিও জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত উক্তপদে ব্রতী থাকিয়া বিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুর পরে ৺হরষিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি শেষ বয়সে কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য শ্রীযুত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং পরে বারাকপুরনিবাসী শ্রীযুত শশধর সিকদার হেড্ পণ্ডিতের কার্য্য করেন। ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছুদিন অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে এই গ্রামনিবাসী শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া এখনও কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সময় হইতে স্কুলের ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। ইং ১৯২৪ সাল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিকে বালিকারা বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে। ১৯২৪এ একটী বালিকা নিম্নপ্রাথমিকে বৃত্তি পায় ১৯২৫ সালেও একটী বালিকা নিম্ন প্রাথমিকে বৃত্তি পায়। ১৯২৬ সালে উচ্চপ্রাথমিকে একটী বালিকা খুলনার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পায় এবং অপর একটী বালিকা গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী উচ্চাঙ্গের

পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। ১৯২৭ সালে একজন উচ্চপ্রাথমিক ও একজন নিম্ন প্রাথমিকে বৃত্তি পায়। শেষোক্ত বালিকা জেলার মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করে। স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বর্ত্তমানে শতাধিক, দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাদেও আর একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় ৺কুঞ্জবিহারী মজুমদার মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনী বসুকে গ্রহণ করা হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হিন্দুফিমেল ট্রেনিং স্কুল হইতে পড়িয়া পাশ করিয়া আসিয়াছেন।

এই স্কুলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য ৺হরিনাথ বসু বি, এল,এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। স্কুলবাড়ীর জমি ক্রয় কালে তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। স্কুলের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত কালিদাস ঘোষ বি, এল, এবং পূর্ব্বতন সম্পাদক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ, গ্রামের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকার্য্যে অগ্রণী। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইং ১৯২১ সালে স্কুলের দুইটী কামরা ও দরদালান বিশিষ্ট পাকা বাড়ী হইয়াছে ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ১০০০৲ টাকা ব্যয়ে এই সঙ্গে আর একটী কামরা সংযোজিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় হৃদয়নাথ ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় বারুজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ তাহারও উন্নতির অবস্থা।

রায় সাহেব শশিভূষণ পালের চিত্রবিদ্যালয় (The Moheswarpasha School of Arts) এতদ্দেশে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট দৌলতপুরের সন্নিকটে সম্প্রতি পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন।

(খ) স্বাস্থ্য—ব্যাধি—মহামারী।

শত বৎসর পূর্ব্বে এ গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ থাকিলেও লোকে ব্যাধির সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল না। ম্যালেরিয়া কি তাহা এদেশের লোক জানিত না। মাঝে মাঝে দুই এক জন জ্বরের রোগী দেখা যাইত। দুই চারিদিন অথবা অষ্টাহ লঙ্ঘন দিলে জ্বর স্বভাব হইতেই সারিয়া গিয়াছে, তখন শিউলি ফুলের পাতা, তুলসীর পাতা বিল্বপত্রের রস এবং নাটা প্রভৃতি প্রধান ঔষধ ছিল, ইহাতে যিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই তাহার জন্য কবিরাজের প্রয়োজন হইয়াছে।

কলেরা এদেশে অজ্ঞাত ছিল, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি ব্যাধি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এক সময় কোন কোন দেশ মহামারীরূপে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে উচ্ছন্ন যাইলেও বাস্তবিক এদেশবাসী তখন ম্যালেরিয়ার সহিত পরিচিত হয় নাই। এক সময়ে বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি রাজা সীতারাম রায়ের মহম্মদপুর ভীষণ ম্যালেরিয়া প্রকোপে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। যশোহরে ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা এক সময় চিত্রানদীর উভয় তীরস্থ বহু জনপদে প্রকট মূর্ত্তিতে বিরাজিত ছিল। গদখালির প্রেতের গল্প এখনও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করে কিন্তু সুখের বিষয় এরূপ মূর্ত্তি মহেশ্বরপাশাবাসী কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

বর্ত্তমানে এদেশে ম্যালেরিয়া আছে কিন্তু যশোহর অথবা অন্যান্য অনেক স্থান অপেক্ষা অল্প। মহেশ্বরপাশায় ২।৪ বৎসর অন্তর এক একবার ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবলীলা দেখিতে পাওয়া যায়, সম্প্রতি ইং ১৯২৬ সালে ম্যালেরিয়ায় বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; যাহারা চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই এরূপ অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যেই

মৃত্যুহার অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। কিন্তু গ্রাম কোনবারেই ম্যালেরিয়া শূন্য হয় নাই।

কলেরা এস্থানে কোন্ সময় দেখা দিয়াছে তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না। সন ১২৮৯ সালের কার্ত্তিক মাসে ইহা মহামারীরূপে বহু লোকের প্রাণসংহার করিয়াছে। ঐ সালে অনেক দিন ধরিয়া শেষরাত্রে সম্মার্জনীর আকার বিশিষ্ট ধূমকেতু উঠিতে দেখা গিয়াছিল, ইহার ৩।৪ বৎসর পরে আর একবার কলেরা দেখা দেয় কিন্তু এবারকার মহামারী পূর্ব্ববারের ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করে নাই। ১৩১৭ সালের কলেরায় এ গ্রামের বহুলোক মৃতুমুখে পতিত হয়, ইহার পর হইতে প্রায় প্রতি বৎসর ইহা নিজ মহিমা প্রচার করিতেছে। ইহাও ম্যালেরিয়ার ন্যায় দুই চারি বৎসর অন্তর ভীষণ আকার ধারণ করে।

ম্যালেরিয়া এবং কলেরাই এখানকার প্রধান ব্যাধি। অন্যান্য ব্যাধির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, প্রকৃত কালাজ্বর এস্থলে আজও অজ্ঞাত।

(গ) সমাজ।

কালের কুটীল গতিতে আজ সর্ব্বসমাজেই ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। ইহার কি ভয়াবহ পরিণাম, একমাত্র ভগবানই জানেন। 'একতাই বল' একতা সমাজের মেরুদণ্ড কিন্তু কালচক্রে সে একতা স্রোতমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, এখন স্ব স্ব প্রধান; কেহ কাহারও অনুশাসন মানিতে চাহে না, কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের এ দুর্গতি ছিল না। ব্রাহ্মণসমাজে ৺মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৺ফকীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কায়স্থসমাজে ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার ৺দিগম্বর ঘোষ এবং পরবর্ত্তীকালে ৺কৈলাসনাথ মজুমদার ৺পিয়ারীচরণ মিত্র, ৺নিবারণচন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রবলপ্রতাপে সমাজের নেতৃত্ব

করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের তর্জনী হেলনে লোক উঠিত, বসিত, মস্তক অবনত করিত; কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতের মধ্যে তেমন 'রাশভারী' সমাজের নেতা দেখা যায় না। দাসত্বের কঠিন নিষ্পেষণে যেন সকলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহারা বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, কর্ম্মোপলক্ষে তাহারা প্রায়ই বিদেশে। বর্ত্তমানের সমাজ যাহাদের করতলগত তাহাদের দ্বারা ইহার উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

সমাজে আর এক অমঙ্গল উপস্থিত—বর্ত্তমানে জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, পরস্পর ঈর্ষাদ্বেষ প্রবলভাবে বর্ত্তমান; কায়স্থের উপবীত গ্রহণ ইহার গৌণকারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যেদিন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়া স্বজাতির উন্নতিচেষ্টায় মনঃ সংযোগ করিয়াছে সেই দিনই অন্যান্য জাতির মধ্যে বিদ্বেষের অনলশিখা ধূ, ধূ করিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বজাতিতে উন্নতির চেষ্টা, জাতিতে জাতিতে বিপুল সংঘর্ষ আনয়ন করিয়াছে।

অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে কায়স্থজাতির কয়েকটী সামাজিক মর্য্যাদার অত্যন্ত হানিকর নজীর প্রস্তুত হইয়াছে। কায়স্থ এবং তাঁতি ও কায়স্থ এবং ডোম সম্পর্ক মোকদ্দমায় কায়স্থকে তাঁতি এবং ডোমের তুল্য করিয়াছে, কারণ কায়স্থও শূদ্র, তাঁতি ও ডোমও শূদ্র, সুতরাং তাহারা পরস্পর সমান। এই গ্লানিকর অপবাদ বিরাট কায়স্থজাতি কখনও নীরবে সহ্য করিতে পারে নাই।

জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, রসায়নে, কবিত্বে, আইনে, ধর্ম্মপ্রচারে, দেশশাসনে জগতের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও উপনয়ন সংস্কারের অভাবহেতু যে তাহাদের এই অবনতি তাহা কায়স্থসমাজ বুঝিতে পারেন, সেই জন্য প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে ব্রাত্য প্রায়শ্চি-

১০

ত্তান্তে কায়স্থের উপবীত গ্রহণ আরম্ভ হয় এবং এই তরঙ্গ ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতে করিতে অন্যান্য গ্রামের ন্যায় ক্রমে মহেশ্বরপাশায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সন ১৩১৬ সালে মহেশ্বরপাশা গ্রামে কায়স্থের প্রথম উপবীত সংস্কার হয়, এই কার্য্যে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ যোগদান করেন নাই। খুলনার অন্তর্গত নপাড়া খাজুরা নিবাসী ৺ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কার্য্যে স্বেচ্ছায় আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে নপাড়ার ঘোষ জমিদারবাবুরা উপবীত গ্রহণ করেন। মহেশ্বরপাশায় ইং ১৯২১ সালে ৺রাইচরণ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হয়; মহেশ্বরপাশার উপবীতি কায়স্থ জাতির মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ত্রয়োদশাহের শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত সরলকুমার ঘোষ অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

যাহা হৌক, মহেশ্বরপাশার যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ এতদিন একত্রে সখ্যতাসূত্রে বাস করিয়া আসিতেছিলেন, উপবীত গ্রহণে সে সূত্র ছিন্ন হইল। যদিও কায়স্থ কখনও ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইতে চাহেন নাই অথবা তাঁহার অশ্রদ্ধা বা অনাদর করেন নাই, তবুও উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি জাতিচ্যুত হইলেন। আজ প্রায় বিশ বৎসর পরে ব্রাহ্মণের সে দৃঢ়তা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে বটে এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থের এ বিচ্ছেদের পরিণাম ভয়াবহ তাহাও অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন সত্য, কিন্তু এই দুই জাতির মিলনেরও কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। কায়স্থ উপবীত ত্যাগ করিয়া কখনই শূদ্রত্ব স্বীকার করিবে না, সেরূপ করিতে পারিলে সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইত, অথচ বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণসমাজেও এমন কোন মহাপুরুষের দেখা

পাওয়া যাইতেছে না, যিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়া সত্য রক্ষার্থ স্বীয় তেজে সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয় মহেশ্বরপাশার সমগ্র কায়স্থ জাতির মধ্যেও একতা নাই। যাহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও দলাদলি এবং ঈর্ষা দ্বেষ বর্ত্তমান। এক শ্রেণীর মৌলিক কায়স্থ অবস্থা-বিগুণ্যে আচারভ্রষ্ট হইয়া সমাজে প্রবেশাধিকার পাইতেছেন না, অথচ ইহারা বর্জ্জনীয় নহেন; যাহারা ক্রমাগত কুলক্রিয়া করিয়া উন্নতের সংস্পর্শে নিজেরাও শিক্ষিত ও উন্নত হইতেছেন কায়স্থের উদারনৈতিক দল তাহাদিগকে আপন ক্রোড়ে স্থান দিতেছেন কিন্তু বিপক্ষ রক্ষণশীল দলের নিকট তাহাদের দুয়ার যেন চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া আছে। দলাদলি সর্ব্বব্যাপারে লক্ষিত হয়, উদারনৈতিক এবং রক্ষণশীল পাশাপাশিভাবে সর্ব্বত্র চলিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যিনি যে মতই পোষণ করুন, সমাজের পক্ষে এরূপ দলাদলি কখনই হিতকর নহে এবং বর্ত্তমানে একতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারি-বেন না।

জাতীয় উন্নতির চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম কায়স্থই করিয়াছেন, এ বিষয়ে কায়স্থই পথপ্রদর্শক। আজ অন্যান্য জাতি তাহাদের প্রদর্শিত পথে সর্ব্বত্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদেরও ঈর্ষা উচ্চতর জাতির উপর ন্যস্ত।

এখানকার মুসলমানসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, অধিকাংশই নিরক্ষর কৃষক, মজুর। এতদিন তাহারা সরলচিত্ত এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থের অনুগামী ছিল। গত পূর্ব্ব বৎসর কলিকাতায় মসজিদের সম্মুখে সঙ্গীতের ব্যাপার লইয়া হিন্দু মুসলমানে যে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, মফস্বলে দূরদূরান্তরে আজও তাহার ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। এখানে কোন উত্তেজনা দেখা যায় নাই, সরলপ্রাণ কৃষক মজুর বুঝিয়াছিল হিন্দু ও

মুসলমানের পরস্পর সাহায্য ব্যতীত কেহ কখনও বাঁচিতে পারে না, কিন্তু কালের স্রোতে আজ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অল্পশিক্ষিত মৌলবীদের উত্তেজনাই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) আমোদ-প্রমোদ।

মহেশ্বরপাশার আমোদ প্রমোদের মধ্যে থিয়েটার এবং কনসার্টপার্টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানের ন্যায় থিয়েটার-পার্টি বহুপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ ইহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে ৺ভবনাথ মজুমদার একটী সখের যাত্রার দল সংগঠন করেন কিন্তু এ দল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ৺যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহেশ্বরপাশায় সর্ব্বপ্রথম থিয়েটারপার্টি বা মহেশ্বরপাশা নাট্যসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু প্রথম অবস্থায় ইহার কোন উৎকর্ষ লক্ষিত হয় নাই। এই সমিতিতে ক্রমে হরিনাথ বসু (পরে কুচবিহারের জজ), বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার (এক্ষণে রায় সাহেব), ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (পরে দৌলতপুর স্কুলের ২য় পণ্ডিত), শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার (বর্ত্তমানে দৌলতপুর স্কুলের অন্যতম শিক্ষক), শ্রীযুত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যোগদান করেন। অভিনয়ের জন্য বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত ৺যদুনাথ ঘটক 'কন্যাবিক্রয়' নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন এবং তিনি নিজে এই সমিতিতে যোগদান করেন। ৺অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী এই সময়ের সর্ব্বপ্রধান হাস্যরসিক ছিলেন। অনুমান ১২৯২ সালে সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু কয়েক বৎসর পরে কিছুদিনের জন্য অভিনয় বন্ধ থাকে। এই অবসরে ৺ভবনাথ মজুমদারের অন্যতম পুত্র ৺অশ্বিনীকুমার মজুমদার পুনরায় এক যাত্রার দল গঠন করেন; এই

দল বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যশঃ অর্জ্জন করেন, কিন্তু এই দল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই পুর্নিরায় থিয়েটারের নূতন অভিনয় চলিতে থাকে এবং নূতন পার্টি গঠিত হয়। বাঙ্গালার গৌরব সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রিয় শিষ্য যশোহর জেলার ধুলপী গ্রামের ৺ফটিক চন্দ্র কর্ম্মকার এই পার্টিতে যোগ দেওয়ায় কলাবিদ্যায় এই পার্টি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন, এবং ইহাদের নাম দেশে বিদেশে ঘোষিত হয়। এই সময়ে কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে সিন পোষাক এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আনা হইয়াছিল। ফলতঃ তখনকার আমোদ প্রমোদ সজীবতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি ছিল। এই সময়কার অভিনীত নাটক প্রসঙ্গের মধ্যে প্রহ্লাদ চরিত্র, নরমেধ যজ্ঞ, নলদময়ন্তী, পূর্ণচন্দ্র, প্রফুল্ল, কবু, রাজাবাহাদুর, বিবাহ বিভ্রাট প্রভৃতি প্রধান। ৺অটলবিহারী মজুমদার (মকা) এবং শিবনাথ ঘোষ হাস্যরস অভিনয়ে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। অটলবিহারীর অন্যান্য রস অভিনয়েও বিশেষ দক্ষতা ছিল। প্রহ্লাদ চরিত্রে এবং নরমেধ যজ্ঞে প্রহ্লাদ ও কুশধ্বজের ভূমিকায় ফটিকের মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে শ্রোতাগণ বিগলিত হইয়া যাইতেন এবং অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না; আজও লোকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয়ের কথা বিস্মৃত হয় নাই। এই যুগের প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের মধ্যে ৺শ্যামানাথ রায়, ৺ঠাকুররাজ মল্লিক, ৺গোপালচন্দ্র মুন্সী (বালক), ৺বিজয় কুমার মজুমদার (ভুলো) (বালক) শ্রীযুত কেশবলাল দাস, শ্রীযুত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺শশিভূষণ বসু, ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুত বিনোদলাল মজুমদার (বর্ত্তমানে খুলনার উকিল), শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার (বর্ত্তমানে পুরুলিয়ার উকীল), শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ (বর্ত্তমানে কুচবিহার রিজেন্ট অফিসের ক্লার্ক), শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যশোহর জেলার মাইজপাড়া গ্রামের শ্রীযুত কিরণ চন্দ্র কাঞ্জিলাল

(বালক) (বর্ত্তমানে রংপুরের ষ্টেশন মাষ্টার) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবগঠিত এই দল বিদেশেও বহুস্থানে সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছেন। ইহার অল্প পরে কনসার্টপার্টি গঠিত হয়। সিক্‌সিমিলনিবাসী শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (যোগে বাঁশেল) প্রসিদ্ধ ক্লার্ণেট (clarionet) নামক বংশীবাদক ছিলেন। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় এবং শিক্ষকতায় অনেকেই গানবাজনা শিখিতে সক্ষম হন। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল মজুমদার উত্তরকালে প্রসিদ্ধ ক্লার্ণেটবাদক হন; শ্রীযুত ভুবনমোহন ঘোষ উত্তম ফ্লুট বাজাইতে পারিতেন। শ্রীযুত কালিদাস ঘোষ কর্ণেট ও বেরিটোন বাজাইতেন, শ্রীযুত কেশবলাল মজুমদার বেহালা বাদক ছিলেন। এই সময়ের কন্‌সার্টপার্টি খুলনার রঙ্গমঞ্চে কলিকাতার পাব্‌লিক থিয়েটারে বাজাইয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। শ্রীযুত ভুবনমোহন মজুমদারের বেরিটোন ও তবলা বাদ্যে অভিজ্ঞতা ছিল। এই সময়ের নাট্যসমিতির অধ্যক্ষতায় (বড় বাবু) ৺হরিধন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত অভিনেতাদের মধ্যে অনেকে জীবিকার্জ্জনে বিদেশে গমন করেন এবং কেহ কেহ অপরিণত বয়সে ইহসংসার পরিত্যাগ করেন, সেজন্য সমিতি কিছুদিনের জন্য নির্জীব অবস্থায় থাকে। পূর্ব্বের ষ্টেজ এবং পোষাকাদিও নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু কনসার্টপার্টিতে তরুণের দল যোগ দিয়া আজও তাহাকে সজীব রাখিয়াছেন। তরুণের দলে ৺শান্তি-গোপাল ভট্টাচার্য্য ক্লারিওনেট বংশীবাদনে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পার্টির অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

গ্রামের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত উৎসাহী যুবক বহুকালের প্রসিদ্ধ নাট্যসমিতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে একটী পুরাতন ষ্টেজ খরিদ করিয়া নূতন করিয়া ইহাকে গঠন করেন। এস্থলে

শ্রীযুত কিরণচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে মহেশ্বরপাশার সেকালের বড় আদরের নাট্যসমিতি আজও অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হইতেছে।

(ঙ) দুর্ভিক্ষ।

সন ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, ইহার করালমূর্ত্তি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকট হইয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি ১২৭২ এবং ১২৮০ সালেও অল্পকালস্থায়ী দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে চাউলের দর প্রতিমণ ৪৲ টাকার উপর উঠে নাই। ১৩১০ সালের দুর্ভিক্ষ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই সময় স্থানে স্থানে ১০৲ টাকা করিয়া চাউলের মণ বিক্রয় হইয়াছে। তাহাতেই চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল কারণ ইহার পূর্ব্বে চাউল ৫৲ টাকারও কম দরে বিক্রয় হইত। ১৩১০ সালের দুর্ভিক্ষ বাংলার সর্ব্বস্থল ব্যাপী হয়, পুত্রকন্যাকে ভরণপোষণ দিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করার সংবাদ অনেক স্থান হইতে পাওয়া যায়। ১৩২৬ সালের দুর্ভিক্ষ সমগ্র বঙ্গদেশকে পীড়িত করে। স্থানে স্থানে চাউলের মণ ১৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের (সন ১৩৩৫ সালের) দুর্ভিক্ষ সাতক্ষীরা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

(চ) সাধারণ প্রতিষ্ঠান।

১। **হিতসাধনী সভা।** এই গ্রামে বহুপূর্ব্বে হিতসাধনী সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ পরলোকে এবং অনেকে স্থানান্তরে যাওয়ায় ইহার কার্য্যাদি বন্ধ থাকে। গত

১৩২৭ সালের ৬ই কার্ত্তিক তারিখে ৺রজনীকান্ত ন্যায়রত্ন, ৺হরিনাথ বসু, বি, এল, নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ, শ্রীযুত কালিদাস ঘোষ, বি, এল, প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়; গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ৺হরিনাথ বসু, বি,এল, ইহার সম্পাদক এবং শ্রীযুত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ, সহকারী সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। কিছুদিন পর্য্যন্ত এই সভা নিয়মিত-ভাবে চলিয়াছিল কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়।

২। **সেবাশ্রম**। সন ১৩১০ সালের দুর্ভিক্ষের পরে শ্রীযুত কালিদাস ঘোষ মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় দরিদ্র এবং আতুরজনের সেবার জন্য মহেশ্বরপাশা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রথম ইহার কার্য্যও যথানিয়মে চলিয়াছিল কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের (volunteer) অভাবে এবং কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলায় অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা একরূপ অচল অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। ডাক্তার শ্রীযুত যদুনাথ বসু পেনসান লইয়া বাড়ী আসিবার পরে ইং ১৯২১ সালের প্রথম ভাগে নবীন উৎসাহে সেবাশ্রমের কার্য্যে অগ্রসর হন এবং সেবাশ্রমের ভার পূর্ব্বতন সম্পাদক শ্রীযুত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, বি,এ'র নিকট হইতে স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন। এই সময়ে সেবাশ্রমের তহবিলে খুলনা কায়স্থ ব্যাঙ্কে ২০০৲ টাকা জমা থাকে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের আন্তরিক চেষ্টায় এককালীন দান, চাঁদা এবং মুষ্টিভিক্ষা আদায় হইতে থাকে। কার্য্যের সুবিধার জন্য পশ্চিম-পাড়ায় শ্রীযুত বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়ের সম্পাদকতায় সেবাশ্রমের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯২১ এবং ১৯২২ এই দুই বৎসর শীতকালে দুস্থগণকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। কিন্তু ইহার পর কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে উপযুক্ত অর্থ ও চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায় নাই। এখন হইতে দুই বৎসর কাল সেবাশ্রমের কার্য্য প্রায় বন্ধই

CS CamScanner

থাকে কিন্তু এক সময় এই সেবাশ্রম সাধ্যানুসারে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিয়াছে। বস্ত্র এবং চাউল বিতরণ ব্যতীত দুস্থ আতুর জনের চিকিৎসা, দুঃস্থগণের গৃহনির্ম্মাণ, উত্তরবঙ্গ ও মেদিনীপুর জলপ্লাবনে সাহায্য ইত্যাদি করা হইয়াছে।

অতঃপর খালিস্পুর স্বরাজ আশ্রমের শ্রীযুত যামিনীভূষণ মিত্র, এম. এ, বি, এল্, এর প্রস্তাবানুসারে উক্ত আশ্রমের দুইজন কর্ম্মীর সাহায্যে সেবাশ্রমের কার্য্য চলিতে থাকে, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল আশ্রম পক্ষীয় কর্ম্মীদ্বয়ও কার্য্য উত্তমরূপে চালাইতে পারিতেছেন না, তখন গ্রামস্থ স্বেচ্ছাসেবকগণ চাউল সংগ্রহের ভার নিজেরাই গ্রহণ করেন. এই সময়ে পশ্চিমপাড়ার শাখাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুত বসন্ত কুমার মিত্র মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্য চালাইতে অক্ষম হওয়ায় উক্ত শাখা-সমিতির পরিচালনা ভার সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদের উপর অর্পিত হয়।

ইং ১৯২৮ সালের প্রারম্ভে বাৎসরিক সভায় সেবাশ্রমের নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়, ইহাতে ডাক্তার শ্রীযুত যদুনাথ বসু সভাপতি, শ্রীযুত শিবনাথ কাব্যতীর্থ, তর্কতীর্থ, সম্পাদক এবং ডাক্তার শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ বসু, কাব্যবিনোদ, সহকারী সম্পাদক (শাখাকেন্দ্রের পরিচালক) নিযুক্ত হন।

৩। **বয়ন বিদ্যালয়।** সন ১৩২৯ সালের জৈষ্ঠমাসে শ্রীযুত নগেন্দ্রভূষণ সরকার মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যার বিবাহোপলক্ষে গ্রামের উন্নতিকল্পে কোন প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের জন্য কায়স্থ সমাজের হস্তে পাঁচশত টাকা দান করেন, কায়স্থ সমাজ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার শ্রীযুত যদুনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে বয়ন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ৺ নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার সভাপতি এবং ডাক্তার শ্রীযুত যদুনাথ বসু সম্পাদক ও

কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দুইটী তাঁত খরিদ করিয়া একজন তন্তুবায়কে মাহিনা করিয়া রাখা হয় এবং গ্রামের ভদ্রসন্তানগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশেষজ্ঞের অভাবে এই অনুষ্ঠান পরে উঠিয়া যায়।

৪। **মহিলা সমিতি।** কলিকাতাস্থ সরোজনলিনী দত্ত নারী সমিতি হইতে শ্রীযুত প্রভাত চন্দ্র গুহ মহাশয় প্রচারোদ্দেশ্যে মহেশ্বরপাশা গ্রামে আগমন করিলে তাঁহার নিকট হইতে সমিতির মঙ্গলকর কার্য্যাবলী অবগত হইয়া সন ১৩৩৩ সালের ৫ই বৈশাখ রবিবার বালিকাবিদ্যালয়ে ২১ জন সভ্যা লইয়া মহেশ্বরপাশা মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এই সভাতেই স্থির হয় প্রতি রবিবারে সভ্যাগণ সম্মিলিত হইয়া কেন্দ্রীয় সমিতির (অর্থাৎ সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির) নিয়মাবলী অনুসারে কার্য্য করিবেন, সভ্যাগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শিশুপালন, গৃহশিল্পের সাহায্যে অর্থাগমের চেষ্টা প্রভৃতি সমিতির প্রধান আলোচ্যবিষয় হইবে; কলিকাতা কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে প্রকাশিত "বঙ্গলক্ষ্মী" নামক মাসিকপত্রিকা সভ্যাগণের মধ্যে পঠিত এবং আলোচিত হইবে। এই সমিতির চেষ্টায় দৌলতপুরের ডাক্তার শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, এম, বি, মহাশয়ের শিক্ষকতায় এখানকার অশিক্ষিতা রমণী এবং ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষার্থিনীদিগকে খুলনা জেলাবোর্ড অনুষ্ঠিত ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইং১৯২৮ সালে পরীক্ষায় ১০ জন ধাত্রী উত্তীর্ণা হন, সমিতির সভ্যাগণের মধ্যেও অনেকে ইচ্ছা করিয়া এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুত যদুনাথ বসু মহাশয় বৃদ্ধবয়সেও যুবকের ন্যায় উৎসাহ লইয়া এই সমস্ত সভাসমিতি গঠনে এবং ইহার স্থায়িত্ব সাধনে মনোযোগী আছেন।

৫। **মহেশ্বরপাশা ম্যালেরিয়া নিবারণী ও স্বাস্থ্যসমবায় সমিতি লিমিটেড।** ইং ১৯২৫

সালের ২৯শে নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত বসন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে মাত্র ৪ জন সভ্য লইয়া এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার পূর্ব্বে ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ সোসাইটির সহিত যোগদান করিয়া কিছুদিন কার্য্য চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সমিতি তখনও পর্য্যন্ত রেজষ্টরী হয় নাই। ৺কালীপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতাতেই শ্রীযুত কালিদাস ঘোষ, বি, এল, শ্রীযুত সতীন্দ্র নাথ সরকার, বি, এ, শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, শ্রীযুত পুলিন বিহারী দাস, বি, এল, প্রভৃতি গ্রামের উন্নতিকামী যুবকবৃন্দ, যাহারা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন, তাঁহারা একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত করিয়া উহার একটা বিবরণী নবনির্ব্বাচিত সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীযুত যদুনাথ বসু মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন; সেই অনুসারে গ্রামে যাবতীয় কাজ চলিতে থাকে।

ইং ১৯২৭ সালের ২২শে মার্চ তারিখে এই সমিতি গবর্ণমেণ্টের সমবায় রীতি অনুসারে কলিকাতায় রেজেষ্টরী করা হয়। এই সংবাদ জেলা-বোর্ডকে জানান হইলে তাহার নিয়ম অনুসারে ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে সমিতি ১০০৲ টাকা দিলে বোর্ড এবং গবর্ণমেণ্ট ৩০০৲ টাকা প্রদান করেন; এই সঙ্গে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গঠিত হয়, উহার মূলধন ১০,০০০ টাকা, প্রতি অংশ ৫৲ টাকা হিসাবে ২,০০০ অংশে বিভক্ত করা হয়; এখন হইতে ইহা "মহেশ্বরপাশা ম্যালেরিয়া নিবারণী ও স্বাস্থ্যসমবায় সমিতি লিমিটেড্" এই নামে অভিহিত হয়, এবং ইহার কার্য্যাদি উপবিধি অনুসারে চলিতে থাকে।

৬। **দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়** (**Charitable Homoeopathic Dispensary**)। ইং ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে এই চিকিৎসালয় যদুনাথ হরিনাথ দাতব্য হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় নামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে

স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় হরিনাথ বসু (তদানীন্তন অবসর প্রাপ্ত সাবজজ) মহাশয়ের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত যদুনাথ বসু মহাশয়ের সাহচর্য্যে এইরূপ একটী সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া দরিদ্রদেশবাসীর উপকার সাধন করিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে দুর্জয় কাল তাঁহাকে অকালে হরণ করিয়া লইল। তিনি ডিস্‌পেনসারীর কোন ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে পারিলেন না, কিন্তু অনুজের সদিচ্ছা স্মরণ করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত যদুনাথ বসু মহাশয় এই ডিস্‌পেনসারি প্রতিষ্ঠা করেন। সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ঔষধ বিতরণের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থিরীকৃত হইল, সাধারণের উপকারার্থ ডাক্তার শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ বসু, কাব্যবিনোদ, সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া সমাগত রোগীদিগকে দেখিয়া ব্যবস্থা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে একমাত্র উপার্জ্জনশীল পুত্রের অকালমৃত্যু হওয়াতে এবং অন্যান্য বৈষয়িক দুর্ঘটনায় প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার শ্রীযুত যদুনাথ বসু মহাশয় একাকী ডিস্‌পেন্‌সারী চালাইতে অক্ষম হইয়া পড়েন। ৺হরিনাথ বসু মহাশয়ের পুত্রগণ যাহারা এইক্ষণ খুলনা সহরবাসী হইয়াছেন, প্রথমতঃ আংশিক সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রামের পরে তাহাদের বিশেষ কোন মায়ামমতা না থাকায় তাহারা স্বীকৃত হইয়াও কখনও সাহায্য করেন নাই। এই বিষয় পাড়ার ভদ্রমহোদয়গণকে জানান হয়। তাহারা এইরূপ একটী অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ইহা দ্বারা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন স্বীকার করিয়া চাঁদা দ্বারা ইহা চালাইবার পরামর্শ করেন, কিন্তু পল্লীগ্রামে চাঁদা দ্বারা এরূপ স্থায়ী কাজ হইতে কখনও দেখা যায় না। এখানেও সকলে পরামর্শ করিলেও কেহই চাঁদা লইয়া অগ্রসর হন নাই. সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানও উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা সুন্দররূপে চালাইবার কোন সুযোগ উপস্থিত হইতে

পারেএবং এইরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা দরিদ্র আতুরজনের সেবা করা হইবে ও গ্রামেরও সুনাম বর্দ্ধিত হইবে মনে করিয়া ডাক্তার বিনা পারিশ্রমিকে যোগ করিতে স্বীকৃত হন এবং তিনি আজও পর্য্যন্ত তাহাই করিতেছেন।

গত ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে মহেশ্বরপাশা ম্যালেরিয়া নিবারণী ও স্বাস্থ্যসমবায় সমিতি রেজেষ্টরী হইয়া আসিলে, সভ্যগণের মতানুসারে ডিস্‌পেনসারী পরিচালনার ভার সমিতির হস্তে দেওয়া হয়; এই সমিতির সহিত যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার উপসত্ব হইতে ডিস্‌পেনসারী চালাইতে হইবে এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। ডিসপেনসারী আজও পর্য্যন্ত সেই ভাবেই চলিতেছে।

৭। **যুবক সঙ্ঘ।** ৮। **পল্লীমঙ্গল সমিতি।** যশোহর এবং খুলনার যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া গ্রামের হিতকর কার্য্য করিবার প্রণালী স্থির করিবার জন্য ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাড়ুলী কাটিপাড়া গ্রামে উভয় জেলার উৎসাহী যুবকেরা একটী সভার অধিবেশন করেন, ঐ সভায় শ্রীযুত সুবোধ কুমার দে (Mr. S. K. De —Incorporated Accountant) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ (খুলনার উকিল), শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ সেন (উকিল), বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত কামাখ্যা চরণ নাগ প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া যুবকদিগকে উৎসাহিত করেন। ইহার পরে ৪ঠা জুন তারিখে (১৯২৭) সাতক্ষীরার খুলনা জেলা সম্মিলনীর মণ্ডপে অমৃতবাজার পত্রিকার সহ সম্পাদক শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু, এম্, এ ; বি, এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে যুবক সম্মিলনের অধিবেশন হয়, ডাক্তার শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ বসু, কাব্যবিনোদ, এই সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সভ্য মনোনীত হন। এই সঙ্ঘেরই শাখারূপে মহেশ্বরপাশা যুবক

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত মন্মথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সভাপতি, ডাক্তার শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ বসু সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন মিত্র, বি, এ, সম্পাদক মনোনীত হন।

এই গ্রামে পল্লীমঙ্গল সমিতি নামেও একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ব্যায়ামাগার এবং পাঠাগার স্থাপন, পীড়িতের সেবা, অত্যাচারিতের রক্ষা, কায়িক পরিশ্রম অভ্যাসের দ্বারা বেকার-সমাস্যার সমাধান চেষ্টা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য উভয় প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য।

৯। **ব্যায়াম ও পাঠাগার।** এই গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বহুবার হইয়াছে কিন্তু সফল হয় নাই, ইহা গ্রামের কলঙ্ক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে এবং শ্রীযুত কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মজুমদারের তত্ত্বাবধানে মজুমদারপাড়ায় একটী ব্যায়ামাগার এবং সেই সঙ্গে পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে কেবল মাত্র মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র আনা হয়। শ্রীযুত কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষকতায় ছাত্র এবং গ্রামের যুবকগণকে কুস্তী, লাঠি, ও অন্যান্য খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়। বসুমিত্রপাড়ায় ইহার একটী শাখা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১০। **কংগ্রেস কমিটি।** এই গ্রামে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের কার্য্য হইত কিন্তু নানাকারণে কমিটি উঠিয়া যায়। ১৩৩৫ সালের ২০শে শ্রাবণ, ডাঃ শ্রীযুত যদুনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে কংগ্রেস সভ্যগণের এক সাধারণ সভায় ডাক্তার শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ বসু, কাব্য-বিনোদ, সভাপতি এবং শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন মিত্র, বি, এ, সম্পাদক, ৪ জন সহ সভাপতি ও দুই জন সহ সম্পাদক এবং কয়েকজন সভ্য লইয়া এক কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১১। **হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।** সন ১৩০১ সালে ভক্ত

সাধু ৺গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিকী চেষ্টায় ৺কালী-বাড়ীতে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারই নায়কত্বে প্রতি রবিবারে ভাগবতপাঠ, হরিসংকীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে ৺রজনী-কান্ত ন্যায়রত্ন, ৺রাসবিহারী ভট্টাচার্য্য, ৺নিবারণ চন্দ্র বসু, ৺হরিদাস দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ৺হরিদাস ৺গোপীমোহনের প্রধান অন্তরঙ্গ এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত নিয়মিত চলিয়া এই সভা উঠিয়া যায় এবং ইহারই রূপান্তর আড়ংঘাটা পল্লীর শ্রীযুত দ্বিজবর রাহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীগৌরভক্তি প্রদায়িনী সভারূপে প্রকাশ পায়।

(ছ) ইউনিয়ান কমিটি ও ইউনিয়ান বোর্ড।

ইং ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে খুলনা জেলায় প্রথম ইউনিয়ান কমিটি স্থাপিত হয় এবং মহেশ্বরপাশা ও খালিস্পুরের কতকাংশ লইয়া সেনহাটী ইউনিয়ান কমিটি গঠিত হয়।

ইং ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে খালিস্পুর, মহেশ্বরপাশা, দেয়ানা, পাবলা, দৌলতপুর লইয়া সেনহাটী হইতে পৃথক ভাবে দৌলতপুর ইউনিয়ান কমিটি গঠিত হয়। পরে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে দৌলতপুর ইউনিয়ান ভাঙ্গিয়া দুইটী ইউনিয়ান কমিটি গঠিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক কমিটির সহিত কয়েকটী করিয়া নূতন গ্রাম ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়, ঐ দুই কমিটীর নাম হয় গোয়ালপাড়া ও দৌলতপুর ইউনিয়ান কমিটি।

পঞ্চায়েত ইউনিয়ন প্রথম স্থাপিত হয় ইং ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে (বাং ১৩১২ সালে)। দৌলতপুর থানার অন্তর্গত ভৈরবনদের পশ্চিমপারস্থ গ্রামসমূহ ৩টী ইউনিয়নে বিভক্ত হয়—বয়রা ইউনিয়ন, পাবলা ইউনিয়ন ও মহেশ্বরপাশা ইউনিয়ন। ইং ১৯১৪ সালে যখন

ইউনিয়ন কমিটি পুনর্গঠিত হয়, তখন বয়রা ও পাবলা ইউনিয়নের কতকাংশ লইয়া গোয়ালপাড়া ইউনিয়ন কমিটি হয় এবং পাবলা ইউনিয়নের অবশিষ্টাংশ ও মহেশ্বরপাশা ইউনিয়ন লইয়া দৌলতপুর ইউনিয়ন কমিটি হয়। পঞ্চায়েত ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন কমিটির কার্য্য পৃথকভাবে চলিতে থাকে। পরে ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে পঞ্চায়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন কমিটি মিলিত হইয়া ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা এবং আয়তন পঞ্চায়েত ইউনিয়নেরই সমান হয়। মহেশ্বরপাশা, মধ্যডাঙ্গা, কার্ত্তিকের কূল, বুঁজিতলা, তেলিগাতি, খানাবাড়ী, যাত্রীপুর, ফুলবাড়ী, যোগীপোল ও মীরেরডাঙ্গা এই ১০টী গ্রাম লইয়া মহেশ্বরপাশা ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ইহার পরিমাণ ৫'৪১ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৬৮৭৬। বাবু মহানন্দ মজুমদার পঞ্চায়েত ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন কিন্তু তিনি দুই বৎসর পরে অসুস্থ হইয়া পড়িলে ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তীকে সমস্ত কার্য্য করিতে হইত, পরে ইং ১৯০৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মহানন্দ বাবুর মৃত্যু হইলে বসন্তবাবু প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

ইং ১৯০৮ সালে দৌলতপুর ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হইলে বাবু নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উহার প্রথম চেয়ারম্যান হন। ইং ১৯১৪ সালে কমিটি পুনর্গঠিত হইলে, বসন্তবাবু চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতে তাঁহাকে ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং পঞ্চায়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট উভয় কার্য্যই করিতে হইয়াছে।

ইং ১৯২২ সালে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হইলে রায় সাহেব শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন কিন্তু তিনি প্রথম মাসেই কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়ায় ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট বসন্তবাবুকে সমস্ত কার্য্য করিতে হয় এবং পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে তিনি প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং সেই অবধি ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

CamScanner

সেকাল ও একাল।

সেকাল। সেকালে ভাল রাস্তাঘাট ছিল না এবং গ্রাম জঙ্গলে পূর্ণ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহু গৃহস্থের বাড়ীর নিকটস্থ জঙ্গল ব্যাঘ্রের আবাসভূমি ছিল। জঙ্গলের জন্য যথেষ্ট মশক ছিল কিন্তু ম্যালেরিয়া ছিল না। দৈবাৎ দুই একটী জ্বররোগী এখানে ওখানে দেখা যাইত বটে কিন্তু বিনা ঔষধেই অষ্টাহ লঙ্ঘনে অধিকাংশ নিরাময় হইয়া যাইত।

রেলষ্টীমার ছিল না, বহির্জগতের সহিত সাধারণের কোন সম্পর্ক রাখারও প্রয়োজন ছিল না। তখন গ্রামে কোনরূপ বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। যথেষ্ট অর্থের আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিতেন না। গোলায় ধান, গোশালায় গরু, পুষ্করিণীতে মৎস্য, জমিতে খড় এবং বাগানে বাঁশ প্রায় প্রতি গৃহস্থেরই ছিল। পুষ্করিণীর মাছেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। দুই এক পয়সার ক্ষুদ্র মৎস্য বড় একটী পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এক পয়সায় এক খালুই খলিসা মাছ কিনিয়া গৃহিণীর বিরক্তিভাজন হওয়ার গল্প এখনও শুনা যায়। এক টাকার ধান কিনিলে সমস্ত দিন বহিয়াও বাড়ীতে পৌঁছান যাইত না।* গরু যে দুগ্ধ দিত, তাহাতে বাড়ীতে ঘৃত, মাখম এবং নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইত।

সকলে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিত, ধান, চাল, দুধ, মাছ বাড়ীতেই থাকিত, নগদ ১০৲ টাকা হইলে একটী বড় পরিবারের

* প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বপাড়ার প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় গিরিধোপার বাড়ী হইতে ১৲ টাকার আউসধান ক্রয় করেন এবং পিতাপুত্রে বহন করিতে আরম্ভ করিয়া একবেলার মধ্যেও যখন বহিয়া শেষ করিতে পারিলেন না তখন বিরক্ত হইয়া ধোপাকে বলিলেন—শালা তুই আরও ধান মিশাইয়া রাখিয়াছিস্। ইহা গল্পকথা নহে, সত্য ঘটনা, প্রসন্ন অত্যন্ত বদরাগী ছিলেন।

স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। বিদেশে যাইয়া দাসত্ব করিবার প্রয়োজন হইত না, তবে কেহ কেহ জমিদারী সরকারে চাকুরী করিতেন এবং ৩৲ টাকা মাহিনায় তহশিলদারী করিয়া বাড়ীতে দেল, দোল, দুর্গোৎসব দিতেন। গ্রামে ৭০।৮০ খানা পূজা হইত। একটী পাটার দাম ছিল ।০ আনা কিম্বা ।৵০ আনা এবং এই অনুপাতে সমস্ত জিনিষই সস্তা ছিল। সরলভাবে অনাড়ম্বর জীবন লইয়া লোকে কুটীরে বাস করিতে ভালবাসিত। জ্ঞানী এবং প্রখর বুদ্ধিশালী ব্যক্তির আদর ছিল এবং তাঁহারাই সমাজের নেতৃত্ব করিতেন।

সন ১২৮৯ সালে (ইং ১৮৮২ সালে) খুলনা মহকুমা জেলায় পরিণত হয়। এ সময় এদেশে রেল ষ্টীমার আইসে নাই। ইহার পূর্ব্বে সকলে যশোহর আদালতে মোকদ্দমা করিত; রাত্রি থাকিতে ৩০ মাইল পথ হাটিয়া যাইত, মোকদ্দমা করিয়া আবার রাত্রে ফিরিয়া আসিত। তখনকার লোক এমনই বলিষ্ঠ, পরিশ্রমশীল, কর্ম্মদক্ষ ছিল। কলিকাতা এবং মুর্শীদাবাদ গঙ্গাস্নানে ও গয়া, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে সকলে দল বাঁধিয়া হাটিয়া যাইত। তীর্থ স্থানে বহু গ্রামের লোক একত্র হইয়া যাইত।

প্রতি গৃহ লক্ষ্মীর আগার বলিয়া মনে হইত। অতি প্রত্যূষে কুল-বধূগণ শয্যাত্যাগ করিয়া গোবরছড়া, ঝাঁট ইত্যাদি দিতেন। পৌষের দুরন্ত শীতেও ইহার অন্যথাচরণ হইত না, নিজ হস্তে গাভী পরিচর্য্যা করিতেন। এক একটী একান্নবর্ত্তী পরিবারে গৃহিণীর কি সুন্দর মূর্ত্তি যে তখন দেখা যাইত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। শাঁখা এবং লাল কস্তাপেড়ে শাড়ীই তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ ছিল। এই অলঙ্কারেই তাঁহারা গৃহে গৃহে জগদ্ধাত্রীরূপে বিরাজিতা ছিলেন। তাঁহাদের বিনয়নম্র ব্যবহার, পতিভক্তি, গুরুজনসেবা, অতিথিসৎকার সে রূপকে কত উজ্জ্বল করিয়া

তুলিত। পুরুষের মধ্যেও বিলাসিতা ছিল না, ধুতী, চাদর এবং চটিজুতায় সভ্যতা রক্ষা হইত।

অকালমৃত্যু বা শিশুমৃত্যু খুব কমই দেখা যাইত। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরের অযাচিত দান প্রচুর পরিমাণ মাতৃস্তন্য পাইয়াছে। মাতৃস্তন্যে শিশু বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে। অপর্য্যাপ্ত আহারের প্রভাবে প্রসূতিকেও কোন্ ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে নাই।

একাল। এখন রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হইয়াছে, লোকের বসতি ক্রমে বাড়িতেছে, জঙ্গলও অনেক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রেল ইষ্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি ব্যাধি গ্রামে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীবৃন্দকে অহরহঃ নির্য্যাতন করিতেছে। এখন আর লঙ্ঘনে কিম্বা সামান্য প্রক্রিয়ায় ব্যাধি আরোগ্য হয় না। এলো-প্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী এবং লাল, নীল, সবুজ, আদি নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধের ছড়াছড়ি। একটীর পর আর একটী, এই-ভাবে একই সময়ে একই দেহে সর্ব্বপ্রকার ঔষধের পরীক্ষা হইয়া যাইতেছে আর তাহারই ফলে ব্যাধি আরোগ্য হওয়া দূরের কথা—মানবদেহ ক্রমেই জটিল ব্যাধির আগার হইয়া উঠিতেছে।

এখন আর বাড়ীতে থাকিলে কাহারও চলে না। বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। এখন আর গোলায় ধান নাই, গোশালায় গরু নাই। দেশের মৎস্য যেন কোন্ মন্ত্রশক্তির প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহাও রেল কোম্পানীর কৃপায় দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে। খড় বাঁশও প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার আর নাই। এখন "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"। বধূগণ স্বাধীনা, তাহারাই এখন সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাহাদের তর্জনী হেলনে সংসার চলিতেছে! পূর্ব্বের ন্যায় এক জনের আয়ে পাঁচ জন

বসিয়া খাইতেও পারেন না। সেই স্বর্ণযুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেককে উপার্জন করিতেই হইবে। সুতরাং "বহু পোষক" এই আখ্যা বর্ত্তমানের কোষ্ঠী হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এখন যিনি মাসে ৫০০৲ টাকা আয় করেন, তাহারও স্বচ্ছন্দভাবে সংসার চলে না। পূজা পার্ব্বণ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে।

সমাজে অর্থহীন জ্ঞানী ব্যক্তির স্থান নাই। এখন জ্ঞানের আদর নাই, রজতখণ্ডের আদর বাড়িয়াছে, সুতরাং অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে কেহ দ্বিধাবোধ করেন না এবং তাহা পাপ বলিয়াও সমাজে গণ্য হয় না। অসদুপায়লব্ধ অর্থে যিনি যত আড়ম্বর করিতে পারিবেন, তিনি সমাজে ততই প্রতিপত্তিশালী হইবেন।

এখন মোকদ্দমা করিতে খুলনায় যাইতে হয়. মহেশ্বরপাশা হইতে মাত্র ৫ মাইল। হাটিয়া যাইবার অবকাশ নাই। সারাদিন রেলগাড়ী এবং মোটরবাস্ চলিতেছে। তিন চারি বৎসর হইল এখানে মোটর-বাসের আমদানী হইয়াছে। মহেশ্বরপাশার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে যাত্রী লইয়া আদালতের সম্মুখে নামাইয়া দেয়। মোটরবাস্‌কে পরাস্ত করিবার জন্য রেল কোম্পানী ১০ খানি আপ্ ও ১০ খানি ডাউন ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

এখন প্রতি গৃহ হইতেই লক্ষ্মী যেন অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছেন। পল্লীলক্ষ্মী এখন অভিধানের কথা হইয়াছে মাত্র। কুললক্ষ্মী বেলা ৮টার সময় শয্যাত্যাগ করেন, গোবর ঝাঁট, ছড়া দিবার পদ্ধতি এখন নাই। অনেক বাড়ীতে চা বিস্কুট প্রবেশ করিয়াছে, গাভীপরিচর্য্যা এখন আর নাই, নানাবিধ কৃত্রিম দুগ্ধ ক্রয় করিয়া ছেলেদের উদরপূর্ত্তি করা হয়। খানাডোবার জল মিশান দুগ্ধ এখন অনেকে অমৃতজ্ঞানে পান করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছেন। অবস্থানুসারে নিত্য নূতন অলঙ্কার মা লক্ষ্মীদের জন্য দাবি করিতেছে আর তাহাদের স্বামীগণ তাহা অবস্থানুসারে [illegible]

হইয়া পড়িতেছেন। স্বামী স্ত্রী বা পুত্র কন্যা কাহারও মুখে আর আনন্দজ্যোতি নাই।

আজ পতিভক্তি নাই, গুরুজনসেবা নাই, অতিথিসৎকারও নাই। নারীর সে জগদ্ধাত্রী রূপ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। শাঁখা এবং লাল কস্তাপেড়ে সাড়ীর স্থানে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার এবং মূল্যবান বস্ত্র শোভা পাইতেছে। কুৎসিত নাটক নভেল অন্তঃপুরকে কলুষিত করিতেছে। পুরুষের সভ্যতাও উচ্চস্তরে উঠিয়াছে। ধুতীচাদর এবং চটিজুতায় সভ্যতা রক্ষা হয় না। জুতা, মোজা, শার্ট, কোট, পাঞ্জাবী ইত্যাদি না হইলে ভদ্রলোকের স্থানে যাওয়া যায় না।

অকালমৃত্যু আজ ঘরে ঘরে বিরাজমান। শিশুমৃত্যুর তাণ্ডব লীলায় শরীর কণ্টকিত হয়। বিধাতার কি অভিশাপ, আজ মাতৃস্তন্য শুষ্ক! শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরের সেই অযাচিত দান হইতে বঞ্চিত! তাহার জীবন বিলাতের ফুড্ নামক কতকগুলি কৃত্রিম বাসী খাদ্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জীবনী সংগ্রহ।

স্বর্গীয় কেদার নাথ মজুমদার। *

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মহেশ্বরপাশার প্রসিদ্ধ গুহ মজুমদার বংশে কেদারনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺পিয়ারীমোহন গ্রামের মধ্যে একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় কেদারনাথের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি শ্রীধরপুরের অন্যতম জমিদার ৺পঞ্চানন বসু পিশামহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া শ্রীধরপুরের উচ্চ ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তিনি অত্যন্ত শ্রমশীল, চরিত্রবান্ এবং প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন এজন্য শিক্ষকগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ঐ স্কুল হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বেই ইং ১৮৭০ সালে স্বীয় গ্রামের ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

পূর্ত্তকার্য্যে কেদারনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন এই বিভাগে প্রবেশ করিলে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবেন।

---

* কেদারনাথের সুযোগ্য পুত্র রায় শ্রীযুত নলিনীনাথ মজুমদার বাহাদুর এবং দামোদর-নিবাসী ৺সারদাচরণ বসুর সুযোগ্য পুত্র রায় শ্রীযুত প্রভাত চন্দ্র বসু বাহাদুরের সাহায্যে সংগৃহীত। গ্রন্থকার।



স্বর্গীয় কেদার নাথ মজুমদার

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য)

সুতরাং ১৮৭৪ সালে তিনি কলিকাতায় যাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে দুই বৎসর পরে ইঞ্জিনিয়ারীং পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

ইং ১৮৮৬ সালে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইলে নৈহাটী শ্রীরামপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বংশধর মিত্র মহাশয়ের পৌত্রী, ভগবতীচরণ মিত্র মহাশয়ের দুহিতা সুরেন্দ্রবালাকে বিবাহ করেন।

কেদারনাথ ইং ১৮৮৭ সালে কুচবিহারে ওভারসিয়ারের পদে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। স্বীয় কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি তত্রত্য ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর পদে উন্নীত হন।

কেদারনাথ ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগের যাবতীয় কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিতেন [illegible] র বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কুচবিহারে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির [illegible] এখনও বর্ত্তমান। বিবিধ কারুকার্য্যখচিত কুচবিহারের রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকার যাবতীয় অট্টালিকা এবং রাজপথ, সমস্তই কেদারনাথের অসামান্য পারদর্শিতা ঘোষণা করিতেছে। যিনি যখন কুচবিহারে গিয়াছেন, তিনি তখনই সেই সুন্দর রাজপথ এবং সমৃদ্ধিশালী অট্টালিকা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। রাজপুরুষগণ কুচবিহার যাইয়া এই সমস্ত দর্শন করিয়া শতমুখে কেদারনাথের প্রশংসা করিয়াছেন। কুচবিহারের টেনিস্ কোর্ট (Covered Tennis Court) বা টেনিস খেলিবার ঘর কেদারনাথের অন্যতম কীর্ত্তি। এরূপ সুন্দর পরিকল্পনা (design) বিশিষ্ট গৃহ উত্তরাঞ্চলে বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে আর কোথায়ও নির্ম্মিত হয় নাই। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারাল লর্ড ল্যান্সডাউন এই গৃহ দেখিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে সিমলায় ঠিক এই প্রকারের একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন এবং এজন্য তাঁহাকে

সিমলায় যাইতে হয়। তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন না, অধিকন্তু বাঙ্গালী বলিয়া গবর্ণমেণ্টের ইউরোপিয়ান্ ইঞ্জিনিয়ারগণ বড়লাটের এইরূপ বিচার বুদ্ধিতে বিরক্ত হন এবং কেদারনাথের কার্য্যদক্ষতা অস্বীকার করিয়া তাঁহারা বিরোধী হইয়া দাড়ান, অথচ গবর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করিবার তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ইউরোপিয়ান ইঞ্জিনিয়ারগণকে কেদারনাথের প্রাধান্য (superiority) মানিয়া যতদিন গৃহনির্ম্মাণ শেষ না হয়, ততদিন তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এজন্য কেদারনাথকে তিন মাস কাল সিমলায় অবস্থান করিতে হয়। এই ঘটনা হইতেই অট্টালিকা নির্ম্মাণে কেদারনাথের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইং-১৮৯৭ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে রাজ প্রাসাদ ভগ্ন হইয়া গেলে তাৎকালিক ভারতের যাবতীয় খ্যাতনামা চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার কুচবিহার আসিয়া প্রাসাদ ধ্বংসাবস্থায় দেখিয়া মহারাজ বাহাদুরকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে বলেন। কেদারনাথ তাঁহাদের সম্মুখে মহারাজাকে বলেন "নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণে রাজকোষ শূন্য হইয়াও কার্য্য শেষ হইবে না, কারণ ইহাতে বহুলক্ষ অর্থের প্রয়োজন, আমি প্রাসাদের গম্বুজ প্রভৃতি সমস্ত বাড়ী মাত্র পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে এমন ভাবে সংস্কার (repair) করিব যে উহা নূতন অপেক্ষা দৃঢ় হইবে।" এই কথা শুনিয়া ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারগণ কেদারনাথকে বাতুল ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিলেন না। কিন্তু মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ কেদারনাথের অসাধ্য কিছুই নাই, ইহা বিচক্ষণ জানিতেন, সুতরাং তিনি আনন্দিতমনে তাঁহাকে এই সংস্কার কার্য্যে অনুমতি দিলেন। কেদারনাথের কার্য্যকুশলতা দেখিবার বিষয় হইয়াছিল। ভূমিকম্পে বড় বড় স্তম্ভ প্রতি ঘরের দেওয়াল, মেজে ইত্যাদির বিস্তৃত, সুদীর্ঘ এবং গভীর crack গুলি নিজের মস্তিষ্ক চালনায় প্রস্তুত এক

প্রকার মসলা দ্বারা চমৎকার ভাবে জুড়িয়া দিলেন যে কেহই উহা পরে বুঝিতে পারে নাই যে কোন্ স্থানে জোড়া হইয়াছে। ৩২ বৎসর গত হইতে চলিল, অদ্যাপিও সেই রাজ প্রাসাদ কেদারনাথের সেই কীর্ত্তি স্মৃতি প্রকাণ্ড ধাতুময় গম্বুজ মস্তকে ধারণ করিয়া, তাহাতে রাজ পতাকা উড়াইয়া ভারত ও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারগণের পূর্ত্ত কার্য্যের অপারদর্শিতার প্রমাণ ঘোষণা করিতেছে।

কুচবিহারের প্রতি গৃহেই কেদারনাথের কারিগরিমা উজ্জ্বল ভাস্করের ন্যায় দেদীপ্যমান। গবর্ণমেণ্টের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার বি, কে. ফিনিমুর কুচবিহারে ভ্রমণ করিতে যাইয়া নবনির্ম্মিত The New Victoria College & Jenkins School buildings দেখিয়া বলিয়াছিলেন—This is the finest building in the Northern Circle. In simplicity of structural design and remarkable cheapness of construction, they stand out as monument of his wonderful engineering skill.

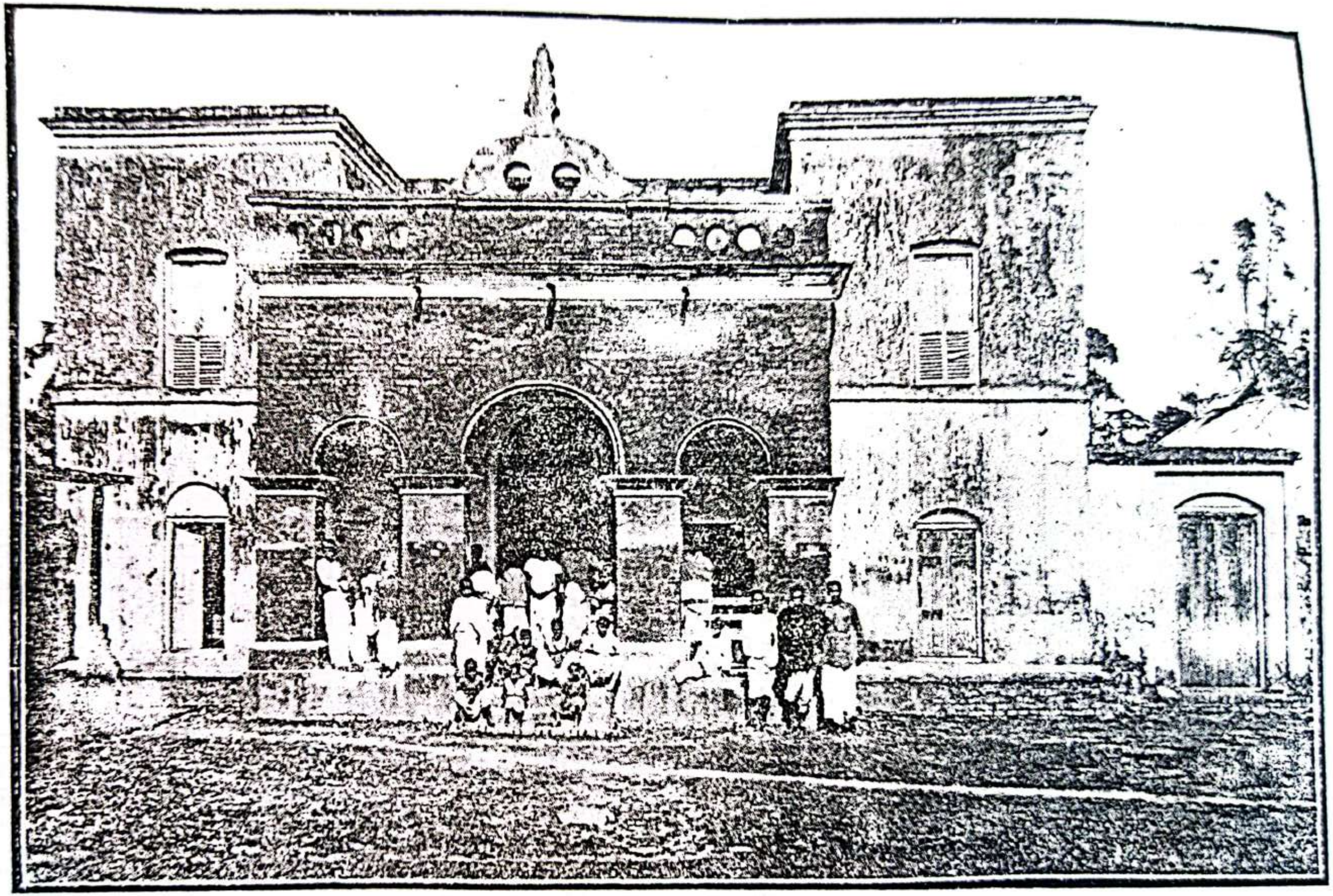
কুচবিহার)Gitaldaha to Coochbeher) এবং গবর্ণমেণ্টের সীমান্তপ্রদেশে রেলবিস্তার কার্য্যে (Cooch Behar-Jointi Extension) কেদারনাথ প্রধান ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। বহু ইউরোপিয়ান ইঞ্জিনিয়ারের উপর কর্ত্তৃত্ব করায় কেদারনাথের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্টের ও ষ্টেটের এই কার্য্য তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। উক্ত রেলপথ "তোরসা" এবং "কালজানি" নামক পার্ব্বতীয় স্রোতস্বতীদ্বয় পার হইয়া গিয়াছে। কেদারনাথ ঐ দুটী নদীর উপর রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তোরসানদী কুচবিহার প্রদেশের নিম্নে এবং কালজানি কুচবিহার ও ব্রিটিস্ ভারতের মধ্যে পরিখারূপে প্রবাহিত। উক্ত সেতুদ্বয়ের একটী লৌহ ও অপরটী ইষ্টক নির্ম্মিত।

ভীষণ জঙ্গলে হিমালয়ের পাদদেশ আচ্ছাদিত। একপ্রকার দূষিত বায়ুও সেখানে সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়; মাঝে মাঝে সংক্রামক জ্বরে শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেদারনাথ প্রকৃত কর্ম্মবীর ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেই ভালবাসিতেন। মনিবের কার্য্যের জন্ত নিজের সুখস্বুবিধার দিকে কখনও লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহাকে এইরূপ স্থানে রেলবিস্তার এবং অন্যান্য কার্য্যের ব্যপদেশে হিংস্রশ্বাপদ সঙ্কুল এবং দূষিত বায়ুপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধিযুক্ত গভীর অরণ্যমধ্যে সদলে কর্ম্ম করিতে হইত, এই সময়ে পার্ব্বত্য ম্যালেরিয়ার তীব্র বিষ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হয়, হয়ত ইহাই তাঁহার শেষ পীড়ার মৌলিক কারণ।

মহারাজ বাহাদুর এক সময়ে তাঁহাকে ভুটানে কয়লার খনির সন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি সেখান হইতে কৃতকার্য্য হইয়াই প্রত্যাগমন করেন।

কুচবিহারে "আর্টিজান" নামক একটী শিল্পবিদ্যালয় আছে, ইহাতেও কেদারনাথের কৃতিত্ব বিদ্যমান। এই বিদ্যালয়ে লৌহ এবং কাষ্ঠ প্রভৃতির ব্যবহার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানে ইহার দ্বারা সর্ব্বদা সরকারী যন্ত্রাদি প্রস্তুত এবং মেরামত হয়। এই স্কুল দ্বারা কুচবিহার রাজ্যে শিল্পবিভাগের একটী অভাব পূরণ হইয়াছে। স্থানীয় বালকগণ এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যাহাতে এই ষ্টেটে এবং অন্যত্র সহজেই অন্নের সংস্থান করিতে পারে, এবং ষ্টেটও স্থানীয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত বেতনে রাখিতে সক্ষম হন, এই উদ্দেশ্যে তিনি ইহা স্থাপনা করেন।

কুচবিহার ষ্টেটের মহারাজার পার্সনাল এসিসষ্ট্যাণ্ট, পরে দেওয়ান, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ কেদারনাথের প্রিয়তম সুহৃদ ছিলেন। উভয়ের সখ্যতা গৌরনিতাই এর ন্যায় মধুময় ছিল। বাস্তবিক একজন অপরের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না।



৺কেদার নাথ মজুমদারের চণ্ডী মণ্ডপ।

(শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসুর ''রাজেশ্বরপাশা পরিচয়ের'' জন্য।)

ইং ১৯০৪ সালে কুচবিহার রাজবাড়ী হইতে টমটমে বাসায় ফিরিবার সময় পথিমধ্যে একটী গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহার বাম উরুতে আঘাত লাগে। ষ্টেটের ডাক্তার বাবু মোহিতলাল সেনের চিকিৎসায় তিনি উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পান বটে, কিন্তু ইহার গৌণ ফল হেতু একটা চক্ষু আক্রান্ত হয়। ইহার পরে ১৯০৫ সালে তাঁহার শূলবেদনার সূত্রপাত হয়, তৎকালে মিষ্টার জেম্‌স্ কুচবিহারের সিভিলসার্জ্জন ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় কেদারনাথ অনেকদিন পর্য্যন্ত ভাল থাকেন, কিন্তু ১৯০৭ সালে ৺পূজার সময় তিন মাসের ছুটী লইয়া তিনি ৺কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন এই বেদনা পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৯০৮ সালের প্রথমভাগে তিনি কার্য্যে যোগদান করিয়া পুনরায় অবসর গ্রহণের অভিমত প্রকাশ করেন, ইহাতে মহারাজ বাহাদুর হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে বিলাত লইয়া যাইতে চাহেন, প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ বাবু সঙ্গে যাইবেন শুনিয়া কেদারনাথ হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। যাহা হৌক এই বৎসর মে মাসে মহারাজ এবং প্রিয়নাথ বাবুর সহিত তিনি বিলাতযাত্রা করেন। জাহাজে কয়েক দিবস ভাল থাকার পরে তিনি পুনরায় বেদনাতে কষ্ট পাইতে থাকেন। অতঃপর তিনি বিলাত পৌঁছিয়া "লণ্ডন কুইনস্ এন্‌স্ ম্যানসন্" নামক অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার কয়েক দিবস পরে ১০ই জুন তারিখে তিনি পুনরায় শূল বেদনায় বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন। এই সময়ে অনেক বিজ্ঞ ও ভাল ভাল বহুদর্শী চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু কেহই প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, ইহার পরে তাঁহার শরীরে ন্যাবার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লণ্ডনের বিখ্যাত ডাক্তার সার টমাস বার্ণোকে দেখান হয়। তিনি হাওয়া পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন, এজন্য কেদারনাথ Llandrindoied Wells নামক স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন। এই

সময়ে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কালেক্টার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় তথায় বাস করিতেছিলেন। এই দুই মহাত্মা হইতে কেদারনাথ যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। এখানে আসিয়া তিনি অনেকটা সুস্থবোধ করিলেন, একদিন ৬০ মাইল পথ মোটরযোগে পর্য্যটন করিয়াও আসিলেন।

তিনি লণ্ডনে প্রত্যাগত হইলে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বার্ণো তাঁহার যকৃতে পিত্তশিলা (Gallstone) অনুভব করিতেছেন এবং উহাতে শীঘ্র অস্ত্রোপচার না করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। কেদারনাথ উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অস্ত্রোপচারে সম্মতিদান করেন বটে কিন্তু প্রবীণ বয়সে এরূপ অস্ত্রোপচারে প্রাণের যে আশঙ্কা বিদ্যমান তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। লণ্ডনে Nursing Home নামে রোগীদের একটা আবাসস্থান আছে, অস্ত্রোপচারের জন্য কেদারনাথ সেইখানে যান, কিন্তু তিনি বন্ধুবান্ধবহীন রোগি নিবাসে থাকিতে অসম্মত করিয়া বন্ধুদের নিকট থাকিবার অভিমত প্রকাশ করিলে পূর্ব্বোক্ত কুইন্সগেনস ম্যানসনের একটি কক্ষ অস্ত্রোপচারের জন্য স্থির করা হয়। ৩১ই আগষ্ট অস্ত্রোপচারের দিন স্থির হয়, তৎপূর্ব্বদিন তিনি ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি উইল এবং প্রিয়সুহৃদ প্রিয়নাথ বাবুকে ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্র লিখেন। দেশে বিদেশে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকেও পত্র লিখিয়া সকলের নিকট শেষে বিদায় প্রার্থনা করেন। প্রিয়নাথ বাবুর নিকট যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল, ইহাতে পাঠকগণ দেখিবেন, অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে তাহার মন কিরূপ সবল ছিল—

My heartfelt thanks and devotion convey to His Highness the Maharajah and assure him that my gratitude for the many acts of kindness will go with me. You must

assure him that during the time, I have served as the Superintendent of works, I have to my knowledge and belief not allowed a pice of His Highness to be misspent or misappropriated and I used to consider the interest of the state more than that of mine. I tried to do good works with as little expenditure as possible and that used to be looked after as mysterious and unusual & some had a suspicious look on me.

* * * *

I have nothing more to say except pray sincerely to my God to grant you long life and happiness. I have no means of expressing my gratitude to you for many acts of favour, affections and love I have received from your hands for which I open my heart to the Allseeing eye, it is full now and my kind friend give me leave. We meet again in the next world. I shall die a peaceful death, there is nothing, for which I shall be afraid to face it except the separation from you all.

অর্থাৎ—মহারাজ বাহাদুরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং গভীর শ্রদ্ধা জানাইবেন, আমার উপর তাঁহার অজস্র কৃপা ও অনুগ্রহের কথা আমি মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও কৃতজ্ঞতাসহকারে স্মরণ করিয়াছি, ইহা তাঁহাকে অবগত করাইবেন, যতদিন আমি ওয়ার্কস সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়াছি—জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে—ততদিন আমি মহারাজ বাহাদুরের এক কপর্দ্দকও অযথা ব্যয়িত বা অন্যায়ভাবে হস্তান্তরিত হইতে দেই নাই।

মনে রাখিয়া কাজ করিয়াছি। দেশহিতকর সুন্দর কাজ আমি এত অল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন করিয়াছি যে কেহ কেহ আমার উপর সন্দেহ প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

* * * *

পরমেশ্বরের নিকট আপনার দীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা ব্যতীত আমার আর অধিক বলিবার কিছু নাই। আপনার নিকট হইতে আমি যে বহু অনুগ্রহ, স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই। আমার হৃদয় একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট উন্মুক্ত করিলাম। হে সুহৃদ, আজ আপনি আমাকে শেষ বিদায় দিন্—আমরা পরলোকে পুনরায় মিলিত হইব। আমি পরম শান্তির সহিত দেহত্যাগ করিব—কারণ আমি এমন কিছুই অন্যায় করি নাই যাহার জন্য ভীত হইব, আপনাদের চিরবিচ্ছেদব্যথাই আমাকে একমাত্র পীড়া দিতেছে।

যথাসময়ে বিলাতের প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার মেয়ো রবসন্ অস্ত্রোপচার করিয়া কুলের আটির ন্যায় দুই খণ্ড পাথুরী বাহির করেন, সকলেই একবাক্যে ডাক্তারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডাক্তারেরা বলিলেন সিরোসিস্ (Cirrhosis of the liver) হইয়া যাওয়ায় অনেকটা পচিয়া গিয়াছে, ইহাতেও তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না, নলের দ্বারা পিত্তঃনিঃসরণ কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কয়েকদিবস এইভাবে গত হওয়ার পরে ক্রমে পিত্তনিঃসরণ বন্ধ হইয়া শরীরের রক্ত দূষিত হইতে লাগিল। এই সময়ে চিকিৎসকগণও হতাশ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু চিকিৎসা অবস্থানুসারেই চলিতে লাগিল। ৫ই সেপ্টেম্বর কেদারনাথের সংজ্ঞালোপ হয়, ৯ই তারিখে বেলা ১০টার সময় (কলিকাতায় অপরাহ্ণ ৪টার সময়) তিনি বন্ধুবান্ধবের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়া ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডস্থ

বন্ধুবান্ধব এবং ভারতবাসী যাহারা নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সকলে মিলিয়া তাঁহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। "গোল্ডারস্ গ্রীন্" নামক স্থানে তাঁহার শবদেহ দাহ করা হয়।

যে দুইজন শুশ্রূষাকারিণী (nurse) তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন, কেদারনাথ তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মাতা বা ভগিনী ঐরূপ সতর্কতা এবং যত্নের সহিত শুশ্রূষা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বাস্তবিক আমাদের এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের ঐরূপ শিক্ষা পাইতে যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

কেদারনাথের চিকিৎসার জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, সহৃদয় মহারাজ বাহাদুর সে সমস্তই বহন করেন। তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষতঃ প্রিয়নাথ বাবু এবং শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সেন যেরূপ আন্তরিকতার সহিত অকাতরে দিবারাত্র যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা অতি বিরল। বাস্তবিক তাহাদের জন্যই তিনি সাতসমুদ্র পারে বহু দূরদেশে রোগশয্যায় স্বীয় স্ত্রী-পুত্র ও ভ্রাতাদিগের অভাব বোধ মনে করিতে অবসর পান নাই।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র মহারাজ বাহাদুর এবং মহারাণী মহোদয়া ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট শোকসূচক তার এবং পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিলাত এবং ভারতের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রাদিতেও শোকসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সকলের উল্লেখ এ স্থলে অসম্ভব। কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ্যামণ্ড সাহেব (বর্ত্তমানে Sir Laurie Lucas Hammond, Governor of Assam.) যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এ স্থলে দেওয়া হইল—

* * * How sorry I am to learn that a man whose friendship I most sincerely valued, is dead. I think that

between Kedar Babu and myself there existed a really close and intimate friendship, one which is ordinarily rare under existing circumstances and therefore its loss is the more deplorable.

I respected him so much for his remarkable energy and common senses.

* * * * * * * * *

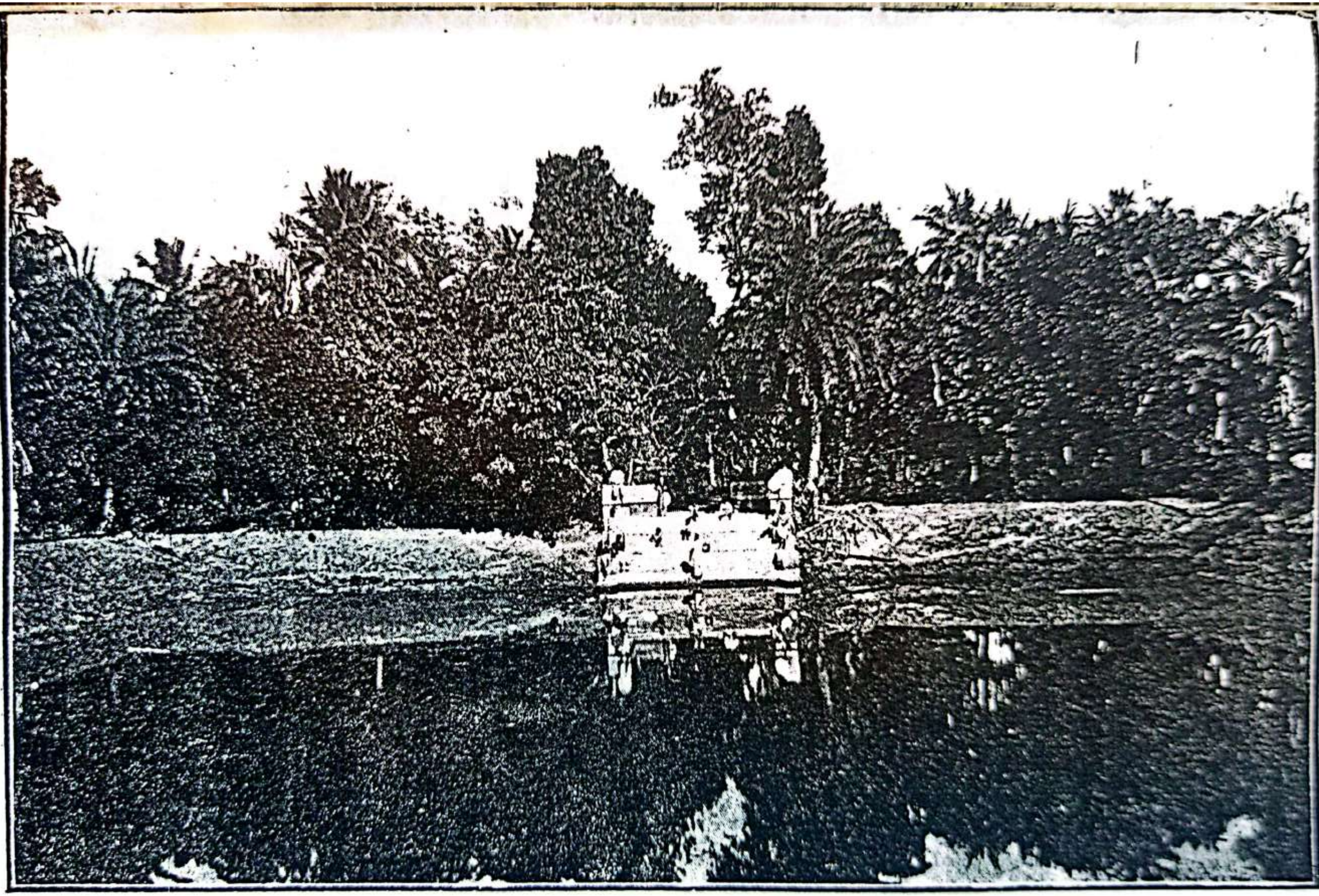
I hope you won't mind me saying, that to know Kedar Babu as I was privilaged to know him intimately, —has done much to eradicate any less kindly idea I had about your countrymen. If there were more of his class about with his manly energetic practical ideas, the problem of India's regeneration industrial and political would be easily solved. * * *

I can not myself imagine Cooch Behar without him.

কেদারনাথ কুচবিহারের বহু সভাসমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সে সকল স্থানেই শোকসভা হইয়াছিল।

মহারাজবাহাদুর কেদারনাথকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার মৃত্যুতে যে ষ্টেটের কিরূপ ক্ষতিবোধ করেন তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত কার্য্য হইতে সহজেই অনুভব করা যায়। মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নলিনীনাথের নিকট লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত তার করেন—

Please accept my heartfelt sympathy and deep condolence in your sad loss. Eveything possible was done to save him but God willed it otherwise. In Kedar I have lost a servant whom it would be impossible to replace. His loss is irreparable.



৺কেদার নাথ মজুমদারের "বাগের পুকুর"।

মহেশ্বরপাশার এক চতুর্থাংশ লোক পানার্থে এই পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করেন।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" ...

কেদারনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার শোকাতুর পরিবারের জন্য ১০০৲ টাকা মাসিক ভাতা মহারাজ বাহাদুর মঞ্জুর করিয়া দেন।

কেদারনাথের জন্য শোকপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ আদেশে বিশেষ গেজেট প্রকাশিত হইয়া রাজ্যের যাবতীয় আফিস, আদালত, স্কুল ও কলেজ বন্ধ দেওয়া হয়।

কেদারনাথের মৃত্যুর পর একদিন মহারাজ বাহাদুর শিকারোপলক্ষে একজন I. M. S. সিভিল সার্জনকে পানীয় জল পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন, তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, কেদার থাকিলে আমাকে এসব বিষয় ভাবিতে হইত না, আমি বলিবার আগে সে আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিত। দুই হাজার টাকা বেতন দিলেও তাহার পক্ষে উপযুক্ত হয় না।

কেদারনাথ কুচবিহারের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন এবং মহারাজ বাহাদুর তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন, সরলতা এবং সহৃদয়তা কেদারনাথের চরিত্রের এক বিশিষ্ট গুণ ছিল। এই জন্য সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ওভারসিয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় দক্ষতাগুণে পাবলিক্ ওয়ার্কস্এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ হন এবং মহারাজ বাহাদুরের অশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন কিন্তু তাঁহার মনে কখনও দাম্ভিকতা উদিত হয় নাই, তিনি সর্ব্বদা বালকের ন্যায় সরল ছিলেন। নিজগ্রামে শ্রীশ্রী৺ আনন্দময়ীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি দেশে আসিয়া বাল্যবন্ধু শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী বেড়াইতে গেলে তাঁহারা কেদারনাথের ন্যায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ত জলযোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কেদারনাথ গোপালবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, ছেলেবেলায় তোমার বাড়ীতে যেমন মুড়ী, গুড় এবং নারিকেলকোরা খাইয়াছি আজও তাহাই খাইব, তাহার অধিক কিছু দিলে আমি কিছুই খাইব না, বাস্তবিক কেদারনাথ বাল্যবন্ধুর বাড়ীতে মুড়িগুড় খাইয়া মহা

তৃপ্তিলাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কুচবিহারের বাসায় দেশের বিদেশের যে কেহ উপস্থিত হইলে তাহাকে ভুরিভোজনে আহার না করাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তিনি সকলকে লইয়া একসঙ্গে বসিয়া খাইতে ভালবাসিতেন। তিনি বাসায় বহু লোককে অন্নদান করিয়াছেন. কুচবিহারে কোন বিদেশীয়ের আহার বাসস্থানের জন্য তাঁহার বাসাই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

তিনি কুচবিহারে দেশ বিদেশের অনেকেরই অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, ইহা তাঁহার চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব। ৺হরিনাথ বসু, ৺কুঞ্জবিহারী মজুমদার এবং শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষের চাকরী তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃত হৃদয়বান না হইলে অন্যের অন্নের সংস্থান করিয়া দেওয়া যায় না।

কেদারনাথ আত্মীয় অনাত্মীয়, অনেক দরিদ্র ছাত্রকে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাহায্য করিতেন, কাহারও পুস্তক কিনিতে টাকা দিয়াছেন, কাহাকেও বিদ্যালয়ে বেতন দিয়াছেন এবং অনেক ছাত্রকে আহার ও শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। তাহার অর্থে বহু ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষ হইয়া গিয়াছে।

কেদারনাথের চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব তিনি জীবনে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই এবং কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

কেদারনাথ নানাপ্রকারের দেশ হিতকর কার্য্যে যোগদান এবং সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতেন। তিনি কুচবিহারের অনাথ আশ্রমের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণের জন্য ২৫০৲ দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধারকগণ ঐ টাকা দিয়াছেন। কুচবিহার মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট ফণ্ডেরও তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু বৎসর যাবৎ বিশেষ

দক্ষতার সহিত ঐ ফণ্ডের সম্পাদকতা করিয়াছেন। দৌলতপুরের ডাক্তারখানা এবং মহেশ্বরপাশা গ্রামের বিদ্যালয়ে ও বিশেষতঃ বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি অনেক সময়ে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং মূকবধির বিদ্যালয়ের নিয়মিত সভ্য ছিলেন এবং শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের শিল্পবিজ্ঞান সমিতির কুচবিহার বিভাগের পৃষ্ঠপোষক সভ্য ছিলেন এবং এই সমিতির জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য কতকগুলি সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। তিনি প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ছিলেন এবং নির্ভীক চিত্তে তাঁহার মত ব্যক্ত করিতেন, অবসর পাইলে এই সব ব্যাপারে এবং সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। দেশের বর্ত্তমান অশান্তি এবং সুখদুঃখ সম্বন্ধে তিনি উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত অকপট ভাবে আলাপ করিতেন, এবং তিনি তাহাদের নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইতেন। তাঁহারই জন্য মিঃ হ্যামণ্ড্ অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় তৎকালের স্বাধীনমতের সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক হইতে বাধ্য হন। তিনি একজন বিখ্যাত Freemason ছিলেন। কুচবিহারের নৃপেন্দ্রনারায়ণ লজ্ এবং আরও বহু Lodgeএর সভ্য ছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাহার বহু স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক আছে। ১৯০৬ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন কুচবিহার গমন করিলে কেদারনাথের তাঁহার সহিত অনেক সময় একত্র থাকিবার সুযোগ ঘটে, তিনি কেদারনাথের আপ্যায়নে এতই মুগ্ধ হন যে মহারাজের নিকট তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কেদারনাথ হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন কিন্তু তিনি গোঁড়া (Orthodox) ছিলেন না, অবসর সময়ে ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পাঠ এবং ধর্ম্মালোচনা করিতেন, তিনি অধ্যাপক পণ্ডিতদের সহিত মিলিয়া অনেক সময়ে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। অন্য ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

কেদারনাথের মৃত্যুতে মহেশ্বরপাশা গ্রামের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।

পুত্র কন্যা। কেদারনাথের প্রথমা স্ত্রী বিরাজমোহিনীর গর্ভে দুই কন্যা এবং পরে দুই পুত্র জন্মে। ইহাদের মধ্যে একমাত্র নলিনী নাথ ভিন্ন অপর কেহ জীবিত নাই। প্রথমা কন্যা সরোজিনী সন ১২৮৬ সালের ২৭শে আষাঢ় জন্মগ্রহণ করে এবং ১২৯০, ২রা জ্যৈষ্ঠ ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যায়। দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম ১লা মাঘ ১২৮৮ এবং মৃত্যু ১২৯১ বৈশাখ। তৃতীয় সন্তান পুত্র নলিনীনাথ, তাঁহার জীবনী পৃথক আলোচিত হইবে। ৪র্থ—পুত্র, জন্ম ১২৯২ পৌষ, জন্মের পরেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। বিরাজমোহিনী ১২৯২ সালের পৌষ মাসে স্বর্গলাভ করেন, (তাঁহার জন্ম ১৫ই চৈত্র, ১২৭০)।

কেদারনাথের দ্বিতীয়া পত্নী সুরেন্দ্রবালার গর্ভের প্রথম সন্তান—পুত্র পটল—বায়ু পরিবর্ত্তনে কেদারনাথের মধুপুরে অবস্থানকালে অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করে। ২য়—কন্যা চারুবালার জন্ম ৬ই বৈশাখ ১২৯৬। শ্যামবাজারের রায় শ্রীযুত দীননাথ ঘোষ বাহাদুরের পুত্র, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ঘোষের সহিত ১১ই বৈশাখ ১৩০৭ ইহার বিবাহ হয়। যোগেশ চন্দ্র ২৯শে কার্ত্তিক ১২৮৮ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহাদের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ জোতিষচন্দ্র ২০শে পৌষ ১৩১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইং ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯২৫ সালে আই, এস, সি, এবং ১৯২৮ সালে বি, এস, সি, পাশ করিয়া এখন Chartered Accountancy পড়িতেছেন। কনিষ্ঠ জ্যোৎস্নাচন্দ্র ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৭সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আই, এ, পড়িতেছেন।

সুরেন্দ্রবালার গর্ভের তৃতীয় সন্তান ক্ষেত্রনাথ, জন্ম ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। ম্যাটি কলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া Calcutta Commercial School

হইতে পাশ্ করিয়া মার্চেণ্ট আপিসে কার্য্য করেন, পরে গত মহাযুদ্ধের সময় Bengali Double Co. তে থাকেন, পরে Bengali Regimentএ অল্পদিন থাকার পরে সৈনিকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া Basah ও Mesopotamiaতে মিলিটারি ষ্টোর আফিসে কাজ করেন। তিনি কলিকাতার জেলিয়াটোলার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে ২৮শে ফাল্গুন ১৩২১ সালে বিবাহ করেন। তিনি ২৮শে কার্ত্তিক ১৩২৬ সনে গৌহাটীতে পরলোকগমন করেন। তাহার এক কন্যা সবিতাসুন্দরী, জন্ম ২৯শে পৌষ ১৩: এবং এক পুত্র সমরেন্দ্র-নাথ, জন্ম ২৫শে বৈশাখ ১৩২৭।

৪র্থ—কন্যা, রেণুবালা, জন্ম ২৮শে কার্ত্তিক, ১৩০৮। খুলনার নৈহাটী শ্রীরামপুরের ৺কেদারনাথ ঘোষের পুত্র খুলনা জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২১ বিবাহ হয়, তাহাদের এক পুত্র দেবপ্রসাদ বর্ত্তমান; জন্ম ২৯শে ভাদ্র ১৩২৪।

৫ম—ভূতনাথ, জন্ম ২৭শে আশ্বিন ১৩১০ সাল। ইং ১৯২১ সালে ভবানীপুর L.M.S. Institution হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কাঁচড়াপাড়া Railway Workshop হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন।

৬ষ্ঠ—বৈদ্যনাথ, জন্ম ৩০শে বৈশাখ ১৩১২। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সেণ্ট্ জেভিয়ারে আই, এ, পড়েন, পরে পুলিশ বিভাগে সাব-ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭ম—কাশীনাথ, জন্ম ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ সাল, South Suburban College হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সেণ্ট্ জেভিয়ারে আই, এ, পড়েন, বর্ত্তমানে পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্কিমচন্দ্র ৺পিয়ারীমোহন মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র এবং ৺কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের অনুজ। তিনি মহেশ্বরপাশা গ্রামে ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি শিশুশিক্ষার সুশীল ও সুবোধ বালকের ন্যায় কোন দিন ছিলেন না, তাহা হইলে হয়ত আজ মহেশ্বরপাশা রায় সাহেবের গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিত না। তাঁহার বাল্যের দুর্দ্দান্ত স্বভাব ভবিষ্যতের personality বা আত্মক্ষমতা সূচিত করে।

পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে বঙ্কিমচন্দ্র দৌলতপুর স্কুলে প্রবেশ করেন, এখান হইতে তিনি কালিয়া স্কুলে যান। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন তাঁহার সহপাঠী এবং আন্তরিক বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় ছিল যে উত্তর কালে চক্ষুর অন্তরালে কেহ কাহাকেও ভুলিতে পারেন নাই। কালিয়ার নগেন্দ্র বাবুর পরিবারে তিনি বাড়ীর সন্তানের ন্যায় বিবেচিত হইতেন।

মহেশ্বরপাশার ৺কুঞ্জবিহারী মজুমদার মহাশয় কুচবিহার স্কুলে শিক্ষক হইয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র কালিয়া হইতে কুচবিহারে গমন করেন এবং অগ্রজ কেদারনাথের তত্ত্বাবধানে জেন্‌কিন্স্ স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। এখানে তিনি ১ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া একটী সুযোগের সন্ধান পাইয়া অগ্রজের ইচ্ছানুসারে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন। এইখান হইতে তাঁহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয় এবং তাহাতে পাশ করিয়া ৩ বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন, কিন্তু শেষ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি চাকরী প্রাপ্ত হন।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর তাঁহার সর্ব্বদাই ঝোঁক ছিল। তিনি ৺গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এবং তাঁহার বাসায় থাকিয়া



রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র মজুমদার।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর 'মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য)।

CamScanner

সৈদপুর ওয়ার্কসপে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত এবং তিনি নিজ হাতে গাড়ীও প্রস্তুত করিতেন কিন্তু দুর্দ্দান্ত বঙ্কিম্ সুবোধ বালকের ন্যায় সর্ব্বদা পুস্তকপাঠ অপেক্ষা এই সমস্ত কার্য্য অধিকতর পছন্দ করিতেন এবং সেজন্য পরিণামে এই বিভাগে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন। ছত্রপতি শিবাজী, দিল্লীশ্বর আকবর অথবা পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহ—ইঁহারা লেখাপড়ায় মনোযোগী না হইলেও সকলেই এক এক দিকপতি ছিলেন, এ আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইত। যাহা হৌক এখানে কিছুদিন কাজ করার পরে তিনি কুরীগ্রাম লাইনের সার্ভেয়ার নিযুক্ত হইয়া যান। ৺মহেন্দ্রনাথ ঘোষ রেল আফিসের হেড্ক্লার্ক ছিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে একৃজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার ভনান্ সাহেবের কাছে লইয়া যান। সাহেব বঙ্কিমের সুন্দর চেহারা এবং শরীরের সুদৃঢ় আকৃতি দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অতীব আনন্দিত হন এবং তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই স্থানে কাজ করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট হইতে টেলিগ্রাম আসে সমস্ত সার্ভেয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারকে কটক-বেনারস লাইনে সার্ভে করিতে যাইতে হইবে। সুতরাং তিনি কটকে প্রেরিত হন। এখানকার কার্য্য শেষ হইলে ফিডার রোড্ প্রস্তুতের জন্য তিনি রাঁচি গমন করেন। এখানে তিনি ৩ বৎসর ছিলেন, রাঁচি হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণিয়ায় যান। তিনি পূর্ণিয়ার মহকুমা আরারিয়ার ডিঃ বোর্ডের সাব-ডিভিসনাল অফিসার হন এবং জেলা বোর্ডের সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার উপর থাকে। এখানে তিনি বড় বড় রাস্তা এবং পুল তৈয়ার করেন। তৎকালে পূর্ণিয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ এচ্ জি কুক্। তিনি পরিদর্শনে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ণিয়ার মিউনিসিপালিটিতে তাঁহাকে লইয়া যান, কারণ এখানে কতকগুলি বড় কাজ ছিল। এখানকার কার্য্যগুলি উত্তমরূপে সম্পন্ন করার দরুণ অনুমান ইং

১৮৮৮ সালে তিনি হুগলী জেলা বোর্ডের ওভারসিয়ার হইয়া আসেন প্রথম কিছুদিন শ্রীরামপুর সাবডিভিসনে থাকেন পরে হুগলীতে গমন করেন, এই স্থানে অবস্থান কালে তিনি ত্রিবেণী নদীর উপরের বড় লোহার পুল প্রস্তুত করেন। এই পুলে তাঁহার নাম খোদিত থাকিয়া আজও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে। তাঁহার এই কার্য্যে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার উভয়েই অত্যন্ত সন্তোষলাভ করেন।

এই সময়ে উড়িষ্যায় ট্রিবুটারী মহালের ঢেঙ্কানাল, তালচর, নরসিংহপুর, বড়ম্বা এবং পাল্লাহারা এই ৫টী ষ্টেটের জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে অনেক ইউরোপীয় ও বাঙ্গালীর দরখাস্ত পড়ে, কিন্তু এই কার্য্যে বঙ্কিমচন্দ্রই নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিয়া তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। এই সময়ে ছোট বড় অনেক পুল প্রস্তুত হয়। তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রায় এক হাজার মাইল রাস্তা নির্ম্মিত হয়, কমিশনার এবং সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া অঙ্গুল জেলার পাবলিক ওয়ার্কস্ এর এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে অন্যত্র বদলী করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার করিয়া রাখেন। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী ষ্টেট, সমগ্র আঙ্গুল ডিষ্ট্রিক্ট এবং খন্দমহাল এই সকলের কাজ তাঁহাকে দেওয়া হয় অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সমস্ত ক্ষমতাই তাঁহাকে দিলেন। এরূপ ক্ষমতা এ যাবত আর কেহই প্রাপ্ত হন নাই। এই সময়ে তিনি (সমুদ্র হইতে) ৫০০০ ফুট উচ্চে খন্দমহালের পর্ব্বতের উপর একটী সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করেন। নরসিংহপুর ২০০০ ফুট উপর বুড়বুড়ী ঘাটে এবং ঢেকানাল ষ্টেটের কপিলাস পাহাড়ে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ যাত্রীর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া আছেন। পূর্ব্বে যাত্রীগণ অতি কষ্টে উপরে উঠিত কিন্তু এখন এই রাস্তা দিয়া উপরে

অনায়াসে গাড়ী চলিয়া যায়। এই পর্ব্বতের উপরে তিনি ঢেঙ্কানাল রাজ পরিবারের জন্য এবং অতিথির জন্য ৩টী পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তৎকালীন কমিশনার ৺রমেশচন্দ্র দত্ত সপরিবারে এই রাস্তা দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন। তিনি এবং আরও দুজন কমিশনার কুক এবং ষ্টিভেন্স সাহেব তাঁহাদের বাৎসরিক বিবরণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করেন, ফলতঃ তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং অনেক দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন, এই সময়ে এবং ইহারই ফলে ইং ১৮৯৬ সালে তিনি "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে রায় সাহেব অত্যন্ত সম্মানকর উপাধি ছিল। অনুমহালে দুর্ভিক্ষ পরিদর্শনে তিনি কমিশনার মেরিওেণ্ট সাহেবের সহিত ফিরিবার সময় হাতী হইতে পড়িয়া যান, ইহাতে তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। এই অবস্থায় ৬ মাসের ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন কিন্তু ৬ মাসেও সুস্থ হইতে না পারিয়া চাকরী ছাড়িয়া দেন।

রায় সাহেব এখন হইতে কিছু দিন খুলনায় বাস করেন। খুলনায় তিনি সুরকী মিল, ছাপাখানা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। খুলনায় অবস্থানকালে তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারাল এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ইত্যাদিরূপে খুলনার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। প্রথমে তিনি কণ্ট্রাক্ট হিসাবে এই সহরে জলের কল করেন, পরে যখন উহার প্রসার লাভ হয় তখন তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে প্রায় প্রতি বৎসরই খুলনা শিল্পপ্রদর্শনী হইত এবং তিনি আমোদ বিভাগের সম্পাদক থাকিতেন। এই সময়ে তিনি কিছু কণ্ট্রাক্টের কাজও করিয়াছিলেন। নড়াইলের কাছারী বাড়ী, ষ্টেসনের অনেক বিল্ডিং, সাতক্ষীরার ভোমরা রোড্ তাঁহারই কৃত। তিনি খুলনা, যশোহর এবং কলিকাতায় কতকগুলি বাড়ী ------

ইং ১৯১৫ সালে হঠাৎ ঢেঙ্কানালের রাজা তাঁহাকে ষ্টেট এঞ্জিনিয়ার করিয়া ঢেঙ্কানালে লইয়া যান, রাজার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানে তিনি ৫ বৎসর পুনরায় চাকরী করেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি বহুবার বহু অর্থ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখান হইতে আসিয়া তিনি কিছু দিন বাড়ীতে ছিলেন। ইং ১৯২১ সালে মহেশ্বরপাশার ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু বেশী দিন বাড়ীতে থাকিতে পারেন নাই। কালাহাণ্ডির মহারাজা দেওয়ানের দ্বারা তাঁহাকে ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার করিয়া কালাহাণ্ডিতে লইয়া যান, বর্ত্তমানে তিনি সেইখানেই আছেন।

রায় সাহেব জীবনে বহু কার্য্য করিয়াছেন এবং সৎকার্য্যে সর্ব্বদাই তাঁহাকে মুক্তহস্ত দেখা গিয়াছে। তাঁহার অগ্রজ ৺কেদারনাথের ৺কালীবাড়ীর দীঘি সংস্কার করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। জ্যেষ্ঠের সদিচ্ছা স্মরণ করিয়া তিনি ডিঃ বোর্ড দ্বারা উহার দখল লয়েন এবং স্বার্থপরতাদোষ পরিহারের জন্য উহার পঙ্কোদ্ধার করিতে জেলাবোর্ডের হস্তে প্রদান করেন। দৌলতপুর স্কুলের সেক্রেটারী রূপেও তিনি তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। স্কুলের পিছনে ছেলেদের খেলার মাঠ তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় হইয়াছে। তিনি বাং ১৩১০ সালে পুরাতন ৺কালীবাড়ীর মন্দির সংস্কার করিয়া দেন এবং তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে নূতন মন্দির করিয়া তাঁহার অগ্রজ কেদারনাথের পরামর্শে বহু অর্থ ব্যয়ে ৺কাশী হইতে পাষাণময়ী ৺কালীমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া শ্রীশ্রী৺আনন্দময়ী নামে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন।

রায় সাহেব দেয়াড়ার ৺দুর্গাবর ঘোষের কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি লক্ষ্মীর অযাচিত কৃপালাভ করিলেও ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছেন। অনেক স্থলে দেখা যায় লক্ষ্মী এবং ষষ্ঠীদেবী সখ্যতাসূত্রে এক স্থানে বাস করিতে পারেন না। রায় সাহেব চাকরী

করিয়াছেন কিন্তু কখনও কাহারও চাকর হন নাই, তিনি চিরদিনই প্রভুর উপরও প্রভুত্ব চালাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার personality বা ব্যক্তিত্ব বা আত্মক্ষমতা এমনই প্রবল। খুলনায় রায় সাহেব অনেক আছেন, কিন্তু যোগরূঢ় শব্দের ন্যায় "রায় সাহেব" বলিলে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝায়, ইহাই রায় সাহেবের গুণপনার যথেষ্ট পরিচয়। ইংরাজীতে যাহাকে Self-made man বলে, আমাদের রায় সাহেব তাহাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তাঁহার স্ত্রীর মতন গুণবতী এবং আদর্শ রমণী আজকাল প্রায় দেখা যায় না। তিনি শিল্প এবং রন্ধন কার্য্যে অতিশয় নিপুণা। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক এবং দয়াশীলা। তিনি উড়িষ্যায় থাকা কালীন অন্নপূর্ণানাম্নী একটী ক্ষুদ্র বালিকাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়া পরে মহেশ্বরপাশা শ্রীপঞ্চাননদাস বৈরাগীর সহিত বিবাহ দিয়া স্থিতি করিয়াছেন। তিনি আত্মীয় স্বজন সকলকে খাওয়াইতে এবং দুরবস্থায় সাহায্য করিতে ভালবাসেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার. এম, এ, এফ, আর, জি, এস, ইং।

(শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র, বি, এ, লিখিত)।

শরচ্চন্দ্র মহেশ্বরপাশা গ্রামের বিখ্যাত গুহমজুমদার বংশ সম্ভূত ৺পিয়ারীমোহন মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতামাতা উভয়েই নানা সদগুণালঙ্কৃত ছিলেন, পুত্র সে সমস্তই পাইয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। তিনি ১২৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

শরচ্চন্দ্র স্থানীয় প্রাইমারী স্কুল হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন কিন্তু এখানে তিনি বেশী দিন পড়িবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। স্কুলে তিনি সহপাঠী এবং শিক্ষক সকলেরই অত্যন্ত স্নেহের এবং ভালবাসার পাত্র ছিলেন। কুচবিহারের জেন্‌কিন্স স্কুল হইতে তিনি সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ লাভ করেন, উক্ত কলেজ হইতে তিনি যথাক্রমে এফ্, এ; বি, এ, ও পদার্থ বিদ্যায় (Physics) এম্, এ, সসম্মানের সহিত পাশ করেন। পঠদ্দশায় তিনি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন, কারণ তিনি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। শরচ্চন্দ্র গ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরব, কারণ তিনি গ্রামের সর্ব্বপ্রথম এম্, এ।

কর্ম্মক্ষেত্রে। শরচ্চন্দ্র যে সময়ের এম্, এ, সে সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী চাকরী তিনি অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিতেন কারণ চাকরীর বাজার তখন এত মন্দা ছিল না, তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার সাহায্য করিবার লোকেরও অভাব ছিল না কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় জীবন উৎসর্গ করিবার তাঁহার বলবতী ইচ্ছা থাকায় তিনি অন্য ক্ষেত্রে চাকরীর চেষ্টা করেন নাই। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুকাল কোন চাকরী গ্রহণ করেন নাই। তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) অল্পকাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, প্রায় ৩ বৎসর পর আনুমানিক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপকের



শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র মজুমদার, এম্, এ। এফ, আর, জি, এস্।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কলেজে বিশেষ যোগ্যতা ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। তার পর কিছুকাল কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করেন, কিন্তু নানা কারণে সেখানকার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া তদানীন্তন সুবিখ্যাত জেনেরাল এসেম্‌ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউসনে (বর্ত্তমান স্কটিশ্ চার্চ্চ কলেজে) স্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত উক্ত কলেজে কার্য্য করেন। ১৯০৭ সালে জুলাই মাসে তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৫০৲ টাকা বেতনে লেক্‌চারার (Lecturer) পদে নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিয়াই শরচ্চন্দ্রের আর্থিক উন্নতি ও পদগৌরবের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহাকে জন্মভূমি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি ২০০৲ টাকা বেতনে পাটনা কলেজে বদলী হন। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত শরচ্চন্দ্র সেখানে কার্য্য করেন। তারপর কটক রাভেন্সা কলেজে সিনিয়ার প্রফেসরের পদ প্রাপ্ত হইয়া কটক গমন করেন। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত উক্ত কলেজে সগৌরবে কার্য্য করেন, ঐ সময় পাটনায় "নিউ কলেজ" নামক একটী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হইলে ১৯২১ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত উক্ত কলেজে অস্থায়ী ভাবে চারিবার অধ্যক্ষের (প্রিন্সিপালের) কার্য্য করেন, অধ্যক্ষ হিসাবে এখানে তিনি তাহার কার্য্য দক্ষতার পরিচয় বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শাসন ক্ষমতার অপূর্ব্ব কৌশলে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় তখন সমগ্র ভারতবর্ষ ভাসমান; স্কুল কলেজ শূন্য করিয়া কাঁতারে কাঁতারে ছাত্র বাহির হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতেছিল। তাঁহার অসামান্য কার্য্যকুশলতা ও অপূর্ব্ব শাসন ক্ষমতাগুণে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা অস্থির মস্তিষ্ক ছাত্রগণকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

নিউ কলেজ উঠিয়া গেলে তিনি পুনরায় ১৯২৭ সালে পাটনা কলেজে বদলী হইয়া অদ্যাবধি কার্য্য করিতেছেন, শরচ্চন্দ্রের বর্ত্তমান বেতন ৮০০৲ আটশত টাকা, ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষরূপে তিনি অতিরিক্ত ১৫০৲ দেড়শত টাকা ভাতা পাইতেছেন ; শরচ্চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী পরীক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ৮ই বৈশাখ ১৩০০ সালে শরচ্চন্দ্র কলিকাতা মহানগরীস্থ ঝামাপুকুর নিবাসী এবং তমলুকের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত দুর্গারাম বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা নীরোজিনীর পাণি গ্রহণ করেন।

পুত্র কন্যা—শরচ্চন্দ্রের চারি পুত্র এবং ছয় কন্যা ; জ্যেষ্ঠ সুবোধচন্দ্র (জন্ম ৯ই মাঘ ১৩০৪, কলিকাতা), এম্, এস্, সি ; বি, এল্, খুলনা বারের উদীয়মান উকিল। সুবোধ বাল্যকালে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বিশেষ সম্মানের সহিত Matriculation, I. Sc. এবং B. Sc. পাশ করেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী এবং বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ বসু পরিবারের ৺হরিচরণ বসুর কন্যা রাধারাণীকে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ বিবাহ করেন। তাঁহার এখন ৩টী কন্যা বিদ্যমান। ১ম—হাসি, জন্ম পাথুরিয়া ঘাটা ২২শে শ্রাবণ ১৩২৯। ২য়—লক্ষ্মী, জন্ম খুলনা, ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৩। ৩য় কন্যা জন্ম পাটনা ২৯শে ভাদ্র ১৩৩৫।

প্রথম কন্যার পর নিমাই নামে একটী পুত্র হয়, সে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

দ্বিতীয়—সুধীরচন্দ্র জন্ম তমলুক ২৬শে ফাল্গুন ১৩১১, এবার মেডিক্যাল-কলেজের শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

তৃতীয়—সুশীলচন্দ্র জন্ম তমলুকে ১৪ই মাঘ ১৩১৮, এবার পাটনা কলেজ হইতে সম্মানের সহিত I. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

CamScanner

৪র্থ—সুনীল চন্দ্র জন্ম কলিকাতা ১৩ই চৈত্র ১৩২৭।

কন্যাদের পরিচয়—১মা। বিভাবতী, জন্ম মেদিনীপুর ২৪শে ভাদ্র ১৩০৮; বিবাহ ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২০ শঙ্কর পাশা নিবাসী কালীদাস বসুর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বসু, যশোহরের উকীল; ইহার এক কন্যা সতী, জন্ম খুলনা ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩০; পুত্র শঙ্কর, জন্ম খুলনা ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

২য়া—উষাবতী জন্ম মেদিনীপুর ১২ই আশ্বিন ১৩১০, বিবাহ ২৮শে শ্রাবণ ১৩২২, যশোহর বিদ্যানন্দকাটী ৺বিজয়কান্ত ঘোষের পুত্র বিমল কান্ত ঘোষ ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহিত। ইহার তিন কন্যা—অঞ্জলী জন্ম খুলনা ৩১শে আশ্বিন ১৩২৮; মায়া জন্ম পাটনা ৬ই মাঘ ১৩২৯; মাধুরী জন্ম ঢাকা ৪ঠা মাঘ ১৩৩৪।

৩য়া—লীলাবতী জন্ম তমলুক ২১শে বৈশাখ ১৩১৪; বিবাহ ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮ মূলঘরের বনমালী ঘোষের পুত্র চিত্তরঞ্জন ঘোষের সহিত। তিনি কলিকাতার পুলিস আপিসে চাকরী করেন। ইহার এক পুত্র দীপ্তিকুমার জন্ম খুলনা ২১শে কার্ত্তিক ১৩০০, ২য়, কন্যা কস্তুরী জন্ম খুলনা ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৩১। রেবা—জন্ম পাটনা ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৫।

৪র্থী—আভারাণী জন্ম খুলনা ৩রা ফাল্গুন ১৩১৫; বিবাহ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ যশোহর মাধবপুর কেশব লাল বসুর পুত্র সুধাংশু কুমার বসুর সহিত, তিনি বেহারে পোষ্টাল ইন্‌সপেক্টার। ইহার এক কন্যা মঞ্জরী জন্ম খুলনা ১লা ফাল্গুন ১৩৩৪।

৫মী—শান্তিরাণী জন্ম কটক ২১শে পৌষ ১৩২১; বিবাহ ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৪ খর্ণিয়া হরিদাস ঘোষের পুত্র হৃদয় কুমার ঘোষের সহিত, ইনি বি, এস, সি, পাশ করিয়া এখন এম, এস, সি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছেন।

৬ষ্ঠী—শুধারাণী জন্ম কটক ৩০শে শ্রাবণ ১৩২৫।

CamScanner

শরচ্চন্দ্রের চরিত্র, তাঁহার পবিত্র ও অনাড়ম্বর সহজ, সরল, সুন্দর পল্লীজীবন বাঙ্গালীর আদর্শ স্থানীয়, জীবনে মূর্ত্তিমানরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী উপরন্তু শিক্ষা বিভাগের এক উচ্চাসনে সমাসীন, কিন্তু বিদ্যাভিমান কাহাকে বলে তাহা কখনও জানেন না, বালকের ন্যায় সরলতা একমাত্র তাঁহাকেই সম্ভবে।

পাশ্চাত্যশিক্ষা তিনি আকণ্ঠ পান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি—সরকারী চাকরীও গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া কখনও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়েন নাই, ইহাই শরচ্চন্দ্রের চরিত্রের বিশেষত্ব, পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে পারে নাই। প্রাচ্যের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু গৌরবের, যাহা কিছু অপূর্ব্ব, শরচ্চন্দ্র সর্ব্বদাই তাহার উপাসক। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের জ্ঞান কর্ম্ম সমন্বয়ে ভারতের সর্ব্ববিধ মুক্তি ও কল্যাণ আনয়ন করিবে ইহা শরচ্চন্দ্রের ঐকান্তিক বিশ্বাস। ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা শরচ্চন্দ্র মেঘ নির্ম্মুক্ত শরচ্চন্দ্রেরই ন্যায় ঘনঘোর জলদাচ্ছন্ন মহেশ্বরপাশাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখুন।

রায় শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মজুমদার বাহাদুর।

নলিনীনাথ স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রী বিরাজ-মোহিনীর গর্ভজাত প্রথম পুত্র। ইনি ২৫শে পৌষ ১২৯০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বিরাজমোহিনীর প্রথমে দুই কন্যা হয় কিন্তু তাহারা অল্প বয়সেই ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যায়। নলিনীনাথের পরে বিরাজমোহিনীর আর এক পুত্রসন্তান হয়, কিন্তু জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।



রায় শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ মজুমদার বাহাদুর

বিরাজমোহিনী মহেশ্বরপাশার ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা; নলিনীনাথের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন বিরাজমোহিনী স্বামী, পুত্র এবং আত্মীয় স্বজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনন্তলোকে প্রয়াণ করেন।

কুচবিহারের রাগিণী নাম্নী একটী দাসী তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহে লালন পালন করেন। নলিনীনাথ কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতায় যাইয়া তাঁহার খুল্লতাত শরৎচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে হেয়ার স্কুলে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার অন্যতম খুল্লতাত শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী নলিনীনাথকে তাঁহাদের নিকট রাখিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে নলিনীনাথ ক্যানাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে ৺উমেশচন্দ্র মজুমদারের জামাতা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ তালচরের রাজার শিক্ষকরূপে কটক সহরে থাকিতেন, নলিনীনাথ তাঁহার তত্ত্বাবধানে কটকে এক বৎসর থাকার পরে পুনরায় কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হন, এবং সেখান হইতে ইং ১৯০০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতে অনবরত স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পাঠের বড়ই ব্যাঘাত হয়, তিনি কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে দুই বৎসর এবং কলিকাতা ডাফ্ কলেজে এক বৎসর এফ্, এ, পড়েন।

সন ১৩১০ সালের ৪ঠা বৈশাখ তারিখে নলিনীনাথ কলিকাতা ঠন্‌ঠনিয়ার শঙ্কর ঘোষের লেনস্থ বিখ্যাত ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষের (যাহাদের প্রতিষ্ঠিত ঠন্‌ঠনিয়ার ৺কালীবাড়ী কলিকাতায় বিশেষ প্রসিদ্ধ) পৌত্রী, ৺অম্বিকাচরণ ঘোষের কন্যা মহিলাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। গত ১৩২৯ সালের ২৫শে শ্রাবণ মহিলাসুন্দরী অকালে সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। লোকে যাহাকে

"রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী" বলে মহিলাসুন্দরী তাহাই ছিলেন। তাঁহার ন্যায় রূপবতী রমণী ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি কবি ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা এবং উপন্যাস "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শিনী ছিলেন।

বিবাহের পর নলিনীনাথ কিছুকাল খুলনায় খুল্লতাত রায় সাহেব শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থাকিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা. ইটখোলা, সুরকীমিল প্রভৃতির কার্য্য তত্বাবধান করেন এবং কনট্রাকটরী কাজকর্ম্ম দেখেন; রায় সাহেবের খুলনার বাড়ী, নড়াইলের কাছারী বাড়ী প্রভৃতি তাঁহারই তত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। রায় সাহেব সাতক্ষীরার রাস্তা কণ্ট্রাক্ট লইলে নলিনীনাথ তাহারও তত্বাবধান করেন। মহেশ্বরপাশার মা ৺আনন্দময়ীর মন্দির তাঁহারই উদ্যোগে এবং তত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। এই সময়ে তিনি বাড়ীতে থাকিয়া নিজ বাড়ী, বাগিচা ইত্যাদিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে ইং ১৯০৫ সালে তিনি কুচবিহার যাত্রা করেন। এই সময় Mr. E. L. L. Hammond, I. C. S. (এখন যিনি Sir Lancis Lucas Hammond, আসামের গবর্ণর) কুচবিহার ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এবং সাহায্যে নলিনীনাথ পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯০৫ সালের ১লা মে তারিখে তিনি ভাগলপুর পুলিশ টেনিংএ ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে পাশ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে দারজিলিংএ পোষ্ট হন। দারজিলিং এবং কোর্টে সাবইন্‌স্‌পেকটারী করেন। অতঃপর ১৯০৬ সালে বেঙ্গল পুলিশ সি, আই, ডি'তে ভর্ত্তি হন। এখানে নলিনীনাথ অধিকাংশ আফিসেই কাজ করেন এবং মাঝে মাঝে বড় বড় মামলা সিনিয়ার অফিসারদের সহযোগে করেন। এই সময়ে আলিপুরে প্রথম বোমার মামলা হয়। মাত্র কয়েক দিনের জন্য তাঁহাকে উক্ত মোকদ্দমা



মহেশ্বরপাশার মহিলা-কবি—

৺মহিলা সুন্দরী মজুমদার।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্য্যে পাঠান হয়। তিনি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় আফিসের কার্য্যে যোগ দেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে ১৯১০ সালে কলিকাতা পুলিশে সাবইনস্পেক্টার হইয়া বদলী হন এবং কুমারটুলী ও বড়বাজার থানায় কাজ করেন। এই সময় নানারূপ মামলায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং বহু পুরস্কারের অধিকারী হন। বড়বাজার থানায় থাকার সময় কলিকাতায় প্রথম Bakrid riot হয় এবং সে সময় তিনি বিশেষ সাহস ও দক্ষতার সহিত কাজ করেন। তাঁহার প্রেরিত ঘটনাবলীর ম্যাপ কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ আদরণীয় হয়। ইহার অব্যবহিত পরে অন্নদা রায়ের টালিগঞ্জ নোট জালের মোকদ্দমা (Tollygunge Note Forgery case) হয়। ইহার তদন্তের ভার নলিনী নাথের উপর পড়ে এবং বলা বাহুল্য ইহাতে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। ইহার অব্যবহিত পরে ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা পুলিশের Special Branchএ নীত হন, সেই সময় হইতে ১৯২৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সেখানে কাজ করেন। ১৯১৮ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি মহা গৌরবের King's Police Medal পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এই উপলক্ষে ইণ্ডিয়া গেজেটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে মেডেল দেওয়ার সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই (Gazette of India, Extraordinary, dated January 1st 1918—page 30).

Nalini Nath Majumdar

Inspector, Calcutta Police—This officer was transferred to the Calcutta Police in 1910 where he has worked ever since. His work has always been carried out in a praiseworthy manner and he has never spared himself in following hazardous cases to a successful conclusion.

CamScanner

১৯২০ সালের ৫ই জুন, রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে নলিনীনাথ রায় সাহেব উপাধিভূষিত হয়েন, গবর্ণমেণ্ট হাউসে দরবারে সনদ প্রদান কালে গবর্ণর লর্ড রোনালড্‌সে বলেন—

Rai Saheb Nalini Nath Majunder.

"You have often at considerable risk to your prsonal safety successfully carried out the responsible duties connected with the Police Administration of this great city which during the past nine years have been entrusted to you".

এই উপলক্ষে কলিকাতা পুলিসের ডেপুটীকমিশনার উইলসন সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য—

Rai Saheb has worked for nearly ten years in the Special Branch and his work during the war and the time of great anarchical stress has been several times brought to the notice of the Government and has been rewarded in part by the award of the King's Police Medal and the title of Rai Saheb. The Intelligence Branch and we ourselves have testified to his unflagging zeal and unfailing courage and loyalty (Dated 16th Oct. 1920).

নলিনীনাথ ১৯২২ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতা পুলিশের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত হন এবং দুইবার অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করার পর ১২।১২।১৯২২ তারিখে ঐ পদে স্থায়ী হন এবং ৩০।৬।১৯২৬ তারিখ পর্য্যন্ত সেই কার্য্য করেন। তিনি ১৯২৫ সালের নববর্ষ উপলক্ষে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়েন, বাংলার তদানীন্তন

গবর্ণর লর্ড লিটন সনদ প্রদান কালে তাঁহার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য—

Joining the Calcutta Police in 1910, you have risen by sheer merit to the rank of Assistant Commissioner, your courageous conduct and the high standard of your work won for you the King's Police Medal in 1918 and the title of Rai Saheb in 1920. You have fully maintained and added to the reputation which you so early won and of which these awards are an indication. The excellent work which you have done since 1920 and the magnificient example which your fearless devotion has set to your subordinates have fully earned for your promotion to the title of Rai Bahadur.

১৯২৬ সালের ১লা জুলাই নলিনীনাথ ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে বেঙ্গল পুলিসে কলিকাতায় অবস্থিত ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সি, আই, ডি'তে Offg. Special Superintendent নিযুক্ত হন এবং তিনি এখনও সেই স্থানেই কার্য্য করিতেছেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর নলিনীনাথ পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। নিষ্ঠুর কৃতান্ত কেবলমাত্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ক্ষান্ত হয় নাই পরন্তু তাঁহার কন্যা জাগাতাকে তাঁহার স্নেহময় বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাঁহার হৃদয়কে চিরদিনের জন্য অন্ধকারময় করিয়া রাখিয়াছে।

১৩১৪ সালের ১৬ই শ্রাবণ নলিনীনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিকা সুন্দরীর জন্ম হয়। নলিনীনাথ ১৩২৬ সালের ২৮শে বৈশাখ বহু অর্থ ব্যয়ে কন্যার বিবাহ কুচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষের পুত্র তপস্তোষ ঘোষের সহিত দিয়াছিলেন। তপস্তোষ নারায়ণগঞ্জের

সাবডিপুটী ছিলেন। তিনি ১৩২৮ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৩৩২ সালের ২৫শে চৈত্র লতিকা সুন্দরীও স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন। এইক্ষণে নলিনীনাথের এক কন্যা ও এক পুত্র বর্ত্তমান, কন্যা ললিতা ১৩২৩ সালের ২৬শে আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন, পুত্র রবীন্দ্রনাথের জন্ম তারিখ ৩০শে আষাঢ়, ১৩২৫।

নলিনীনাথের চরিত্র সমালোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। সুতরাং তাহা হইতে আমরা বিরত থাকিলাম, তবে এক কথায় বলা যায় এবং তাহা না বলিলেও তাঁহার প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইবে বলিয়া মনে হয়—চাকরীস্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে তিনি এক শ্রেণীর লোকের বিরাগভাজন হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সরলতা ও অমায়িকতা এবং দেশপ্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বহুপোষক। গ্রামের সকল হিতেকর কার্য্যের মধ্যে তিনি আছেন এবং অন্যান্য উচ্চবেতনের কর্ম্মচারীদের ন্যায় জন্মপল্লীকে ভালবাসিতে লজ্জা বোধ করেন না, এজন্য তিনি মহেশ্বরপাশার অন্যতম গৌরব।

রায় শ্রীযুক্ত শশিভুষণ মজুমদার বাহাদুর।

(শ্রীযুক্তা রেণুকা মজুমদার, বি, এ, লিখিত)

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন যশোহর জেলার অন্তর্গত খুলনা মহকুমার মহেশ্বরপাশা গ্রামের বিখ্যাত মজুমদার বংশে শশিভূষণের জন্ম হয়। পরে খুলনা মহকুমা জেলায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভবনাথ মজুমদার অতিশয় সহৃদয়, সন্তানবৎসল ও সহিষ্ণু ছিলেন;



রায় শ্রীযুক্ত শশি ভূষণ মজুমদার বাহাদুর।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

CamScanner

সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। মাতা মনোমোহিনী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সন্তানবৎসলা ছিলেন। যদিও তিনি কোপনস্বভাবা ছিলেন এবং কখন কখন সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে অনেক সদ্গুণও ছিল। অন্যায়, অসত্য ও পাপের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। ইঁহাদের গুরুঠাকুর বংশ শাক্ত ছিলেন, তাঁহারা মদ্যপান করিতেন। শশিভূষণের পিতা একবার গুরুঠাকুরের প্রসাদরূপে তাঁহার প্রদত্ত সুরা পান করিয়াছিলেন, ইহাতে মনোমোহিনী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীকে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে আর কখনও সুরা পান করিবেন না। তিনি জীবনে আর কখনও সুরা স্পর্শ করেন নাই। শশিভূষণের পিতা খাইতে ও সকলকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। নিজে হাটে গিয়া ভাল মাছ, ফল, তরকারি প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া আনিতেন এবং সকলকে খাওয়াইয়া ও নিজে খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি শশিভূষণকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২৫৲ টাকা করিয়া মাসিক খরচ পাঠাইতেন। এদিকে শশিভূষণ প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন; তিনি পিতাকে লিখিলেন এত টাকার প্রয়োজন নাই, কম করিয়া টাকা পাঠাইলেই হইবে। ইহাতে তাঁহার পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সকলের নিকট পুত্রের সদ্বিবেচনার উল্লেখ করিতেন।

গ্রামের পাঠশালায় শশিভূষণের বিদ্যারম্ভ হয়। নয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। তিনি দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন, এইজন্য কোন কোনও আত্মীয় তাঁহার নাম "প্রিয়দর্শন" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫ বৎসর বয়সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সে গৌরবর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এগার বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ডাক্তার স্বর্গীয়

সারদানাথ গুহ মজুমদারের সহিত শ্রীহট্টে গিয়া জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে প্রায় তিন বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। শ্রীহট্টে বাসকালে একবার তাঁহার জলবসন্ত হয়, গ্রামে সংবাদ রটিল আসল বসন্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এ কথা তাঁহার পিতামাতা ব্যতীত আর সকলেই শুনিয়াছিলেন। যখন তিনি গৃহে ফিরিলেন তখন সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ঐ মিথ্যা সংবাদ তাঁহার পিতামাতার নিকট প্রকাশ করিলেন। ইহার পর তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হয় ও একবৎসর কাল পড়াশুনা বন্ধ থাকে। আরোগ্য-লাভ করিবার পর তিনি কলিকাতায় সিটি স্কুল, হেয়ার স্কুল ও পরিশেষে স্বর্গীয় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেসিডেন্সি ইন্‌ষ্টিটিউসনে পড়েন এবং এই স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এই প্রেসিডেন্সি ইন্‌ষ্টিটিউসান পরে রিপন কলেজে পরিণত হয়। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হইয়া তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন। গ্রামের স্বর্গীয় দুর্গাবর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় কালীবর ভট্টাচার্য্যও ঐ বৎসর তাঁহার সহিত একত্রে শিবপুর কলেজে ভর্ত্তি হন। শশিভূষণ ও কালীবরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়। কালীবর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন; দুজনেই কলেজে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তৃতীয় বৎসরেও আর দুই বৎসরের জন্য ইঁহারা উভয়ে বৃত্তি লাভ করেন।

কি উপায়ে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করা যায় এ সম্বন্ধে শশিভূষণ পাঠ্যাবস্থা হইতেই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। এই চিন্তা সার সুরেন্দ্র-নাথের অগ্নিময়ী বক্তৃতার ভিতর দিয়া তাঁহার মধ্যে সংক্রামিত হয়। শশিভূষণ বুঝিয়াছিলেন যে স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত দেশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। দেশের ভবিষ্যৎ আশা বালকবালিকাগণ; তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা প্রধানতঃ তাহাদের জননী ও অন্যান্য আত্মীয়াদিগের উপরই নির্ভর করে।

এইজন্য দেশের সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। যে মুহূর্ত্তে তিনি এই সত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিলেন তখন হইতেই তিনি গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইলেন। শিবপুর কলেজের দীর্ঘ অবকাশের সময় এবং অন্য সময়ে যখনই গ্রামে আসিতেন নিজে পণ্ডিত-দিগের সহিত নিয়ম মত বালিকাস্কুলে পড়াইতেন। বালিকারা যাহাতে নিয়মমত স্কুলে আসে তাহার জন্য নিজব্যয়ে মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে জলযোগ দ্বারা প্রীত করিতেন এবং নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য উপহার দিতেন। তিনি স্বর্গীয় কালীবর ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় যদুনাথ ঘটক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। বালিকাদিগকে একদিকে যেমন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়ান হইত অন্যদিকে তাহাদিগকে চরিত্রগঠন, সংসারের কর্ত্তব্যসাধন, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যশিক্ষা, দেশের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন এবং অন্যান্য সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ও বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই নীতি অবলম্বন করিবার পর স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল এবং বালিকাদিগের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিল। ইহার ফলে উচ্চশ্রেণীর কয়েকজন বালিকা পরে সংসারে প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিল। দুঃখের বিষয় কালীবর যদুনাথ অকালে সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যাহা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল। গ্রাম এবং বিদ্যালয়ের পক্ষে ইঁহাদের মৃত্যু বড়ই দুর্ভাগ্য।

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িবার সময় শশিভূষণ প্রথম ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কলেজের কয়েকজন ছাত্র মিলিত হইয়া শিবপুরে একটী প্রার্থনা সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন ইঁহারা সেখানে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। শশিভূষণ এই সমাজের সভ্য হইলেন এবং ক্রমে

ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ দেখিতে পাইলেন। তখন হইতে তিনি বুঝিলেন যে কেবল প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু দেশে তাহা সম্ভবপর নহে যেহেতু বালিকাদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হয় এবং তাহারা শ্বশুরালয়ে গিয়া আর শিক্ষার সুযোগ পায় না এবং অল্প বয়সে সন্তানের জননী হওয়াতে ইহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়।

এইজন্য বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহা ব্যতীত স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলন, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ প্রভৃতি সংস্কারেরও প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজে একদিকে নিরাকার ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপাসনা করা হয়। অন্যদিকে মহিলাদিগকে উচ্চশিক্ষা, সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা ও উপযুক্ত সম্মান ও স্বাধীনতা দান করা হয়। পিতামাতা, পুত্রকন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সকলে একত্রে প্রাণ খুলিয়া স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা করেন। এই সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম দ্বারা আদর্শ পরিবার গঠিত হয় ইহাই তিনি বুঝিলেন এবং নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার শিবপুর কলেজের পড়া শেষ হইয়া আসিলে শেষ পরীক্ষার (Licentiate in Engineering) জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় পরীক্ষার দুইমাস পূর্ব্বে তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। এই রোগে তিনি এক বৎসর ভুগিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। ঐ বৎসর তিনি ঢাকা নিবাসী জমিদার ও ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট খ্যাতনামা স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা জ্ঞানদার পাণিগ্রহণ করিলেন। ব্রজসুন্দর মিত্র পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্ববিধ উন্নতির, সর্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যের ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। শিক্ষাবিস্তার,

বিধবাবিবাহ প্রভৃতি ও অন্যান্য সংস্কার কার্য্যের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি গরীবের বিশেষতঃ অসহায়া বিধবাদিগের মা বাপ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার গৃহ দরিদ্র ছাত্র ও নির্য্যাতিত ব্রাহ্মদিগের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের তিনি প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন। শশিভূষণের বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয় এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইন (Civil Marriage Act) মতে রেজেষ্টারি করা হয়। বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর ও তাঁহার পত্নীর বয়স ২৩ বৎসর ছিল। তাঁহার পত্নী কলিকাতা বেথুন কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি, উচ্চ চরিত্র, আত্মত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, মিষ্ট স্বভাব ও কোমল হৃদয় কলেজের সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এমন কি কলেজের কর্তৃপক্ষ হোষ্টেলের কঠোর নিয়ম সকল হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

বিবাহের সংবাদ যখন শশিভূষণের বাড়ীতে পৌঁছিল সেখানে স্বভাবতঃ অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার জননী ভৈরব নদীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া ধাবিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন।

বিবাহের পর শশিভূষণ চাকরী লইতে বাধ্য হইলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল ডাউনিং সাহেবের সুপারিশে Bengal Public Works Departmentএর Upper Subordinate Establishmentএ অস্থায়ী ওভারসিয়ারের পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি উড়িষ্যায় প্রেরিত হইলেন; বেতন মাসিক ৮০৲ টাকা ও ঘোড়া রাখিবার খরচ ১৫৲ টাকা, মোট ৯৫৲ টাকা। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে কলেজের শেষ পরীক্ষা পাশ না করিলে তাঁহাকে কার্য্যে স্থায়ী করা হইবে না, পরীক্ষা দিবার জন্য যথাসময়ে তাঁহাকে ছুটী দেওয়া হইবে। এই সময়ে এই শেষ পরীক্ষা পাশ না করিলে ঐ পদে কাহাকেও নিযুক্ত

করা হইত না,-শশিভূষণই সর্ব্বপ্রথম পাশ না করিয়াও ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন। অস্থায়ী কার্য্যের নিয়ম ছিল এক মাসের নোটিসে যে কোন পক্ষ কার্য্যের অবসান করিতে পারিবেন অর্থাৎ তিনি ছাড়িয়া আসিতে পারিবেন অথবা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

উড়িষ্যায় গিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিলে তাঁহাকে জগতসিংপুর নামক স্থানে জলসেচন বিভাগে (Irrigation Department) পাঠান হইল। জগতসিংপুর কটক সহর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। কটক সহরের পাদদেশে মহানদী প্রবাহিত। ঐ নদীতে পাথরের বাঁধ দিয়া জল উচ্চভূমিতে রাখা হইয়াছে এবং বাঁধের উপরের দিকে নদীর পাড়ে কবাট দেওয়া পোল (sluice) প্রস্তুত করা হইয়াছে, ঐ পোল হইতে খাল প্রস্তুত করিয়া সুদূর মফঃস্বলেও জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জলের প্রয়োজন হইলে ঐ পোলের কবাট খুলিয়া দেওয়া হয় এবং নদী হইতে জল খালে প্রবেশ করে। এই সমস্ত খাল দুই পার্শ্বের জমি অপেক্ষা উচ্চ ভূমি দিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং খালের দুই ধারের বাঁধে পাইপ বসাইয়া তাহা খুলিয়া দিলে জল শস্য ক্ষেত্রে যাইতে পারে। এই খালগুলি হইতে আবার ছোট ছোট শাখা খাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সমস্ত খাল ও শাখা খাল দ্বারা যতদূর সম্ভব সমস্ত মৌজাগুলি ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে এবং তাহা হইতে বহু জমিতে জল সেচন করা হয়।

শশিভূষণ কর্ম্মস্থলে গিয়া দেখিলেন যে এই জলসেচন কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের মধ্যে দারুণ আন্দোলন ও উত্তেজনা চলিয়াছে। কোনও প্রজাই শস্যক্ষেত্রে জল লইতে প্রস্তুত নহে। জল না লইলে গবর্ণমেণ্টের জলকর আদায় হয় না এই কারণে দুই তিন বৎসর জলসেচন একপ্রকার বন্ধ থাকায় সরকারের বাৎসরিক দেড়লক্ষ টাকা লোকসান হইতেছিল। এস্থলে জলসেচন বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক নচেৎ শশিভূষণের

কার্য্যের গুরুত্ব ও সাফল্যের পরিমাণ বুঝা যাইবে না। এই জলসেচন (Irrigation) কার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যেক মৌজার নকসায় (Caddastral Survey Map) কোন্ কোন্ জমিতে জল পৌঁছিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তৎপরে ঐ জমির মাপ অনুসারে কাহার কত জলকর দিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহার পর প্রজাদিগের শস্যের জন্য জল প্রয়োজন হইলে তাহারা জল লইবার কবুলিয়তে (water lease form) সহি করিয়া দেয় তখন জলসেচন করা হয় এবং সেচন কার্য্য শেষ হইয়া গেলে জলকর আদায় করা হয়। জলসেচন কার্য্যে দুইটী বিভাগ আছে। একটী কর আদায়ের বিভাগ (Canal Revenue Department) আর একটী জলসেচনের জন্য এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল এই শেষোক্ত বিভাগ কেবল জলসেচন করিবে [illegible] সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বোক্ত বিভাগে হইবে। প্রজাওয়ারি খতিয়া[illegible] উপরেই অন্য সমস্ত কার্য্য নির্ভর করে। এই সর্ব্বপ্রথম কার্য্যে [illegible] ডিপার্টমেণ্টের অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। যে সকল শস্যক্ষেত্রে কখনও জল পৌঁছিবে না, এমন কি পুষ্করিণী, ঘরবাড়ী, গোচারণের মাঠ প্রভৃতিও ইহারা খতিয়ানভুক্ত করিত এবং প্রজাগণ নিরর্থক উহার জন্য জলকর দিতে বাধ্য হইত। কেবল যাহারা উৎকোচ দিত তাহারাই এই জুলুম হইতে নিষ্কৃতি পাইত। গরিব নিরক্ষর প্রজার ওজর আপত্তি কেহ গ্রাহ্য করিত না। এই অত্যাচার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রজাগণ তখন দলবদ্ধ হইয়া জল লইতে অস্বীকার করিল। এই সময়ে আর একটী ঘটনা দ্বারা প্রজাদিগের অসন্তোষ ও উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাইল। জগতসিংপুর এলাকার মধ্যে একটী খাল আছে তাহা গিয়া একেবারে সমুদ্রে পড়িয়াছে, দেশের বৃষ্টির জল নিষ্কাষণের উদ্দেশ্যে উহা খনন করা হয়। সে বৎসর বৃষ্টি খুব কমই হইয়াছিল। প্রজাগণ সকলে মিলিয়া ঐ খালে একটী বাঁধ দিয়া উপরের দিকে জল আটক করিয়া সেই জল

শস্যক্ষেত্রে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। এই সংবাদ এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বড় সাহেব শুনিতে পাইয়া তাঁহার লোকজন লইয়া ঐ বাঁধ কাটিয়া দিতে গেলেন, কারণ উহা দ্বারা নাকি জল নিকাশের বাধা হইয়াছে। প্রজাগণ জোড়হস্তে সাহেবকে ঐ বাঁধ তখন কাটিতে নিষেধ করিল কিন্তু সাহেব তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বাঁধ কাটিতে হুকুম দিলেন। লোকজন কোদাল লইয়া কাজ আরম্ভ করিল। তখন প্রজাগণ ক্ষেপিয়া গিয়া তাহাদের জমিদারের আদেশ অনুসারে সাহেবের লোকজনদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। সাহেবকেও ছাড়িল না; প্রহার করিয়া সাহেবের পা খোঁড়া করিয়া দিল; তাঁহার লোকজনদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও খাটিয়ায় করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ঐ জমিদারকে পুলিশ যথাসময়ে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং তাহার জেল হইয়াছিল। এইরূপ কথিত আছে যে ঐ সাহেব প্রায়ই জেলখানায় গিয়া ঐ হতভাগ্য জমিদারকে বেত্রাঘাত করিতেন। বেচারা অধিক দিন বাঁচে নাই।

গবর্ণমেণ্ট অবশেষে বুঝিলেন নিয়ম সংস্কারের প্রয়োজন। তখন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে যাঁহারা জলসেচন করেন সেই বিভাগ অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বারা খতিয়ান কার্য্য করা হইবে। ঠিক এই সময়ে শশিভূষণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল প্রজাদিগের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া যে এইবার তাহাদের উপর সুবিচার করা হইবে—যে সব ক্ষেত্রে জল যাইবে কেবল সেই সকল জমিই কবুলিয়তভুক্ত করা হইবে অন্য সমস্ত জমি বাদ দেওয়া হইবে। কিন্তু এ কথা কে শোনে। তিনি প্রজাদিগকে ডাকাইলেন যাহাতে তাহাদের সম্মুখে দেখাইয়া দিতে পারেন কোন্ কোন্ ক্ষেত্র বাদ দেওয়া হইবে কিন্তু একটী প্রাণীও উপস্থিত হইল না। অবশেষে অনেক কষ্টে তাহাদের সহিত অবসর সময়ে মিশিয়া, আলাপ করিয়া, সমবেদনা

দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তাহারা প্রকৃতপক্ষে খালের জলের খরিদ্দার স্বরূপ, কাগজপত্র দেখিবার তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এইরূপে তিনি তাহাদের কাহারও কাহারও মন ফিরাইতে সমর্থ হইলেন। তিনি কয়েকটী মৌজা তদারক করিয়া খতিয়ান প্রস্তুত করাইলেন এবং প্রজাদিগের মধ্যে পরচা (কাহার কত জমি জলকর ভুক্ত করা হইল তাহার তালিকা) বিতরণ করা হইল। তখন তাহারা বুঝিল এইবার সরকার তাহাদের উপর ন্যায় বিচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার পরই জলসেচনের সময় উপস্থিত হইল এবং ঐ পরচার সহিত মিলাইয়া কয়েকটী মৌজার (যে কয়েকটীর দলিল সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন) প্রজাগণ জলকর কবুলিয়ত সমাধা করিল এবং তাহাদিগের মৌজায় জল দেওয়া হইল। জল দিবার সময় যখন যে প্রজার জলাভাব হইল শশিভূষণ ঘোড়ায় চড়িয়া নক্সা হস্তে জল কাদার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তখন প্রজারা সন্তুষ্ট হইল এবং এই সংবাদ অন্যান্য মৌজায় রাষ্ট্র হইলে, পরে ক্রমে ক্রমে স্ব ইচ্ছায় তাহারা দল বাঁধিয়া জলকর কবুলিয়ত করিতে লাগিল। নূতন নিয়ম অনুসারে কাজ করিয়া তিন বৎসর পরে দেখা গেল উড়িষ্যায় জলসেচন বিভাগে বৎসরে যে দেড়লাখ টাকা লোকসান হইতেছিল তাহা কাটিয়া গিয়া আরও দেড়লাখ টাকা লাভ হইতে লাগিল। সকলের শ্রম সার্থক হইল। এই কার্য্যের জন্য শশিভূষণকে ভীষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। রৌদ্র বৃষ্টি নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে মাঠে মাঠে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ঘুরিতে হইত। এমন অনেক দিন গিয়াছে প্রত্যূষে কাজে বাহির হইয়াছেন, গাছতলায় বসিয়া কিছু আহার করিয়া আবার কাজ করিয়াছেন এবং রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছেন। এই দারুণ পরিশ্রমে কখনও তিনি অসন্তুষ্ট বা পরাঙ্মুখ হন নাই, ঠিক নিজের কার্য্যের মতই সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

প্রায় এক বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট হইতে চিঠি আসিল যে কার্য্যে স্থায়ী

হইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। তখন তাঁহার উপরের কর্ম্মচারী এই বলিয়া রিপোর্ট করিলেন যে শশিভূষণকে ঐ সময়ে একদিনের জন্যও সরাইয়া দিলে সরকারি কার্য্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে এবং ইহাও লিখিলেন যে এইরূপ লোককে উৎসাহিত না করিলে উড়িষ্যায় জলসেচন কার্য্য কখনও সাফল্যলাভ করিবে না। এই রিপোর্টের ফলে অল্পদিন পরেই তাঁহাকে পরীক্ষায় পাশ করা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল এবং কার্য্যে স্থায়ী করা হইল। বলা বাহুল্য শশিভূষণই সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষায় পাশ না করিয়াও এই বিভাগে স্থায়ী হইয়াছিলেন। ইহার পর অসাধারণ দ্রুততার সহিত তাঁহার প্রমোশন হইতে লাগিল। যাঁহারা গ্রেডে তাঁর অপেক্ষা উচ্চে বা senior ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকেই কলেজে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এগার জনকে তিনি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং একবার একসঙ্গে পাঁচজনকে এইরূপে টপকাইয়া গিয়াছিলেন; ইহার ফলে তিনি অনেকের ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শশিভূষণ কটক সহর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে কর্ম্ম করিতেছিলেন। সেখানে তিনি ছয় বৎসর ছিলেন। সমাজ ও বন্ধুবান্ধব পরিবর্জ্জিত হইয়া ছয় বৎসর মফঃস্বলে থাকা সহজ নহে। এইজন্য তাঁহাকে কটক সহরে বদলি করিবার জন্য তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে অনুরোধ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিন পরেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল; জলসেচন বিভাগ হইতে তিনি কটক সহরে বিল্‌ডিং বিভাগে বদলি হইলেন। যখন এই সংবাদ জগতসিংপুরে রাষ্ট্র হইল, দলে দলে প্রজাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেখানে থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ জগন্নাথদেবের নিকট এই বদলি বন্ধ করিবার জন্য পূজা মানৎ করিল। জগতসিংপুরের

জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাদিগের বালকবালিকা পর্য্যন্ত সকলেরই তিনি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার এলেকা (jurisdiction) লম্বায় প্রায় ৫০ মাইল ও চওড়ায় প্রায় ১০ মাইল ছিল। যখন ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি কাজ দেখিতে যাইতেন বালকবালিকার দল দৌড়াইয়া কাছে আসিত ও "হেইতি ছছিবাবু যাউছন্তি" বলিয়া চীৎকার করিত। সরকারী কার্য্যের প্রথম ছয় বৎসর জগতসিংপুরে থাকিয়া বাস্তবিকই স্থানটীর উপর তাঁহার মায়া হইয়া গিয়াছিল, এখান হইতে চলিয়া যাইতে তাঁহাদেরও কষ্ট হইতেছিল। অবশেষে একদিন এই মায়া কাটাইয়া তাঁহারা জগতসিংপুর ত্যাগ করিলেন। বহু প্রজা তাঁহাদিগকে শেষ বিদায় দিবার জন্য প্রায় পাঁচ মাইল পথ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। অনেকে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সরকারী খালের জল দিয়া তাহাদের উপকার করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাহারা শশিভূষণের এত অনুরক্ত হইয়াছিল তাহা নহে। তাঁহার পত্নী তাহাদিগের সুখদুঃখে সর্ব্বদা সহানুভূতি দেখাইতেন। রোগীকে ঔষধ, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং দরিদ্র রোগীকে পথ্যপ্রদান, অভাবগ্রস্তকে অর্থসাহায্য প্রভৃতি কার্য্যে তিনি অনেক সময় ব্যাপৃত থাকিতেন। সকলেই তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিত; শশিভূষণকেও তাহারা "বাপো" বলিয়া ডাকিত।

জগতসিংপুরে যাইবার এক বৎসর পরে সে অঞ্চলে বিষম অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। অধিকাংশ প্রজাই গরিব, এক বৎসর জলাভাব হইলেই অজন্মা হয়। খালের জল বিনা তাহাদের চাষ আবাদ সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। কিন্তু পূর্ব্বলিখিত সরকারী কর্ম্মচারীর অত্যাচারে তাহারা মরিয়া হইয়া জল লওয়া বন্ধ করিয়াছিল। সে বৎসর বৃষ্টিরও অভাব হইল, কাজেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে জঙ্গলের শাক পাতা পর্য্যন্ত দুর্লভ হইল। ইহা দেখিয়া শশিভূষণের পত্নী আর

স্থির থাকিতে পারিলেন না, সাধ্যানুসারে একটী অন্নসত্র খুলিলেন। ইহার জন্য নিজের সাংসারিক খরচ যথাসম্ভব কমাইতে হইল। এক হত-ভাগ্য একদিন এত ভাত খাইল যে উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া দুইদিন পরে তাঁহার বাড়ীতেই তাহার মৃত্যু হইল। প্রথম প্রথম লোকগুলি ক্ষুধার তাড়নায় ভাত চিবাইবার দেরী সহ্য করিতে পারিত না,মুখে দিয়াই গিলিয়া ফেলিত। একটী স্ত্রীলোক পথের ধারে পড়িয়াছিল। তাহাকে ইঁহাদের গৃহে আসিতে বলা হইল কিন্তু সে অস্বীকৃত হইল। অতঃপর তাহাকে ঐ পথের ধারেই অন্নজল পাঠান হইল। দুই তিন দিন পরে একদিন প্রাতে দেখা গেল তাহাকে শিয়াল কুকুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। ধানকাটা আরম্ভ হইলে এই অন্নকষ্ট ক্রমে দূর হইল।

বিবাহের অল্পকাল পরেই বাড়ীর সঙ্গে শশিভূষণের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল এবং জগতসিংপুরে ও পরে অন্যান্য কর্ম্মস্থলে তাঁহার জননী, মাতামহী, ভ্রাতারা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননী তাঁহার পত্নীর সেবা ও যত্নে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মনে হয় সকল পুত্রবধূর মধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছিলেন। তিনি শশি-ভূষণকে একবার সস্ত্রীক বাড়ী যাইতে বলেন, তদনুসারে শশিভূষণ তাঁহার পত্নী ও শিশু কন্যাকে লইয়া বাড়ী গেলেন। ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী একদিন জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া শশিভূষণের সহিত সকলকে এক পংক্তিতে আহার করাইলেন অর্থাৎ প্রমাণ করিলেন যে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হয় নাই।

কটক সহরে তিনি ছয় বৎসর কাল কর্ম্ম করেন। সহরে আসিয়া তাঁহারা অনেক ব্রাহ্মপরিবার পাইয়া সুখী হইলেন। এখানেও তাঁহাকে সরকারী কার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতিও অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা সহরে বহু বন্ধুবান্ধব লাভ করিয়া-

ছিলেন এবং সকলের ভালবাসাও পাইয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ তিনি দ্বারভাঙ্গা জেলার পুষা নামক স্থানে বদলি হইলেন। পুষায় একটী সরকারী কৃষিকলেজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমেরিকার একজন ধনী অনেক অর্থ দান করেন। তাঁহার নাম ফিপ্‌স্‌ (Phipps); তাঁহার নাম অনুসারে বাড়ীটীর নাম Phipps' Laboratory দেওয়া হয়। এই বাড়ীটীর জন্য দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। ইহা ব্যতীত অন্য অনেক বাড়ীও নির্ম্মিত হইতেছিল, সে সব গুলির ব্যয় আরও দশ লক্ষ টাকা। শশিভূষণ ঐ কলেজ বাড়ী প্রস্তুত করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুষায় কাজ করিতে করিতে পুনরায় [illegible] বিভাগে তাঁহার ডাক পড়িল। তখন গবর্ণমেণ্ট পুষার কার্য্য ঠিকা এঞ্জিনিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া শশিভূষণকে মেদিনীপুরে বদলি করিলেন। মেদিনীপুর সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে লছমাপুর নামক স্থানে খালের উপর তাঁহার বাসা (quarters) [illegible]ল। এই স্থানটী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়ার আকর। [illegible] মাসে পরিবারের সকলেই এখানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ[illegible]ন। তাঁহার পত্নীর অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইল, জ্বরের সহি[illegible] তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার হইল। মফঃস্বলে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা অসম্ভব, শশিভূষণ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। শশিভূষণ Secretary, Public Works Department কে একখানি অর্দ্ধ-সরকারী (demi-official) পত্র লিখিয়া নিজের বিপদের কথা জানাইলেন এবং কলিকাতায় বদলি হইবার অনুরোধ জানাইলেন। এই সদাশয় সাহেবের নাম Mr. W. A. Inglis। শশিভূষণ যখন কটক সহরে ছিলেন তখন ইনি সেখানে Superintending Engineer ছিলেন এবং কার্য্যোপলক্ষে প্রায় প্রতিদিনই ইহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। ইনি শশিভূষণের কার্য্যে বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার চিঠির উত্তরে Inglis সাহেব অতি শীঘ্র তাঁহাকে কলিকাতায় বদলি

করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সুচিকিৎসার দ্বারা তাঁহার পত্নী আরোগ্য হইলেন কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। সেই বৎসর (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) হইতে প্রায় ষোল বৎসর, পেন্সান লওয়া পর্য্যন্ত শশিভূষণ মোটের উপর কলিকাতাতেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

পুষায় বাসকালে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদোন্নতি (Promotion) হয়। তিনি Upper Subordinate Grade হইতে Engineering Gradeএ উন্নীত হন। পূর্ব্বে তিনি Subordinate (নিম্ন কর্ম্মচারী) gradeএ ছিলেন, এখন প্রথম শ্রেণীর Gazetted officers' gradeএ উঠিলেন। কলিকাতায় প্রথমে তিনি Assistant Engineer ছিলেন কিন্তু শীঘ্রই Executive Engineerএর পদে উন্নতিলাভ করিলেন এবং Third Calcutta Divisionএর ভার প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধের সময় অনেক সাহেব কর্ম্মচারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হয়, ইহাতে কর্ম্মচারীর অভাব হইয়া পড়ে। First Calcutta Divisionএর জন্য এঞ্জিনিয়ার আবশ্যক কিন্তু লোকের অভাব। তখন শশিভূষণ বলিলেন তিনি Third ও First Calcutta Division দুইটী চালাইতে প্রস্তুত আছেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব জানিবামাত্র মঞ্জুর করিলেন। দুই বৎসর কাল শশিভূষণ এই দুই জনের কার্য্য একলা চালাইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেন কিন্তু বিপর্য্যয় পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। এই দ্বিগুণ কার্য্য স্ব-ইচ্ছায় গ্রহণ করিবার একটু কারণ ছিল। গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেন First Calcutta Divisionটী এত দায়িত্বপূর্ণ যে উহা সর্ব্বদা ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীর হাতে রাখা প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছিল। শশিভূষণ এবং অন্যান্য এদেশীয় কর্ম্মচারী এই নিয়মের বিরোধী ছিলেন। এখন সুযোগ পাইয়া শশিভূষণ গবর্ণমেণ্টের ধারণা ভুল প্রমাণ করিতে সংকল্প করিয়া তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। গবর্ণমেণ্টও অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে বাধ্য হইলেন।

প্রমাণ হইয়া গেল যে সুযোগ দিলে এদেশের এঞ্জিনিয়ারও কর্ম্মে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। দুই বৎসর পরে শশিভূষণ দুইজনের কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে First Calcutta Divisionএর কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। কলিকাতার P. W. D. Division গুলির কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর। তাহাতে দুইটী ডিবিসানের কেবল আফিসের কার্য্যই (Correspondence) একজন কর্ম্মচারীর পক্ষে নিয়মমত চালান প্রায় অসম্ভব। যত সরকারী বিভাগ আছে সকল গুলির সহিতই কারবার, যথা :—Imperial and Provincial Government Departments namely, Civil, Military, Police, Judicial, Criminal, Educational, Jail, Medical, Excise, Customs ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত বাহিরের কার্য্যও (Outdoor works) কলিকাতার প্রায় বারো আনা, হাওড়া ও যশোহরের সমস্ত এবং ২৪ পরগণার কিয়দংশের অসংখ্য বিল্‌ডিং ও রাস্তার মেরামত কার্য্য এবং বহুসংখ্যক নূতন বিল্‌ডিং প্রস্তুতের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। ইহার উপর Accounts Department সর্ব্বদা শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে কোথায় হিসাবে এক পাই পয়সার ভূল হইয়াছে। একবার মেডিকেল্ কলেজের বাড়ীগুলির মিউনিসিপাল ট্যাক্স্ দিবার সময় প্রায় দশ হাজার টাকার মধ্যে দুই পয়সা অধিক দেওয়া হইয়াছিল, ইহার জন্য বোধ হয় Accounts Departmentএর সঙ্গে দুই টাকারও অধিক ব্যয়ের Correspondence হইয়া গেল। শশিভূষণ অবশেষে দুইটী পয়সা নিজ হইতে দিয়া হিসাব ঠিক করিয়া শান্তি পাইলেন।

এই ডবল কার্য্য করিবার সময়ও তাঁহার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী গভর্ণমেণ্টের নিকট যে বাৎসরিক গোপণীয় রিপোর্ট (annual confidential report) পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে প্রতিবারই এইরূপ মন্তব্য লিখিয়াছিলেন :—

"I am quite statisfied with his work."

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

যখন Royal Commission on Public Services কলিকাতায় আসে তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট শশিভূষণকে বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের Provincial Engineering Service এর পক্ষ হইতে Co-opted member নিযুক্ত করেন। কমিশনের অধিবেশনে যোগ দিয়া তিনি ঐ Serviceএর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যের দুইটী বিভাগ ছিল, যাঁহারা বিলাত হইতে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন তাঁহারা Imperial Service ভুক্ত হইতেন আর যাঁহারা ভারতীয় কলেজ হইতে শিক্ষা পাইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা Provincial Service ভুক্ত হইতেন। দুই Serviceএর কর্ম্মচারীগণ একই কার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদের দায়িত্বও একই ছিল কিন্তু Provincial Serviceএর বেতন অনেক কম ছিল। এই সময়ে সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় India Council এর একজন মেম্বার ছিলেন। ইঁহার সহিত শশিভূষণের শ্বশুর বাড়ীর দিক হইতে পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল এবং তিনি শশিভূষণকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের দুই ভগিনী শশিভূষণের পত্নীর সহপাঠিনী ছিলেন। Provincial Engineerদের পক্ষ হইতে শশিভূষণকে কৃষ্ণগোবিন্দের নিকট তাঁহাদের প্রতি এই অবিচারের প্রতীকারের সাহায্য প্রার্থনা করিবার ভার অর্পণ করা হয়। শশিভূষণ এ বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বিলাতে গিয়া Provincial Engineering Service উঠাইয়া দিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন এবং ইহা উঠিয়া যায়। ইহার ফলে Provincial Engineerগণ সকলেই Imperial Serviceএ উন্নীত হন এবং তাঁহাদের বেতন অনেক বৃদ্ধি পায়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমরের সময় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে

Munition Board কর্ত্তৃক যুদ্ধের গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটী বড় বড় কারখানা (factory) স্থাপিত হয় এবং ইসাপুরের বন্দুকের কারখানাও ঐ বোর্ডের হস্তে দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত কারখানা Munition Boardএর নিকট হইতে লইয়া সামরিক বিভাগের হস্তে প্রদান করিবেন এইরূপ স্থির হয়। কারখানাগুলির সে সময়ের অবস্থা কিরূপ এবং কি কি সর্ত্তে বোর্ডের নিকট হইতে সেগুলি লওয়া যাইতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য তিন জন সভ্য লইয়া একটী কমিটি গঠন করা হয়। তাহার মধ্যে একজন Munition Boardএর সভাপতি (President), একজন Garrison Engineer of Fort William, আর একজন P. W. D. officer। ভারত গবর্ণমেণ্ট শশিভূষণকে এই কমিটির শেষোক্ত সভ্যরূপে মনোনীত করেন। যথাসময়ে ইহারা কারখানাগুলি পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট দিলেন। কমিটির এই রিপোর্ট সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছিলেন।

শশিভূষণ ২৯ বৎসর কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কখনও কখনও তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। একবার তাঁহার কলেজের একজন শিক্ষকও P. W. D. তে কার্য্য পাইয়া তাঁহার অধীনে আসিয়া পড়েন। কিন্তু শশিভূষণ উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সহিত বেশ সদ্ভাবেই কার্য্য চালাইয়াছিলেন, তাঁহারাও রীতিমত তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে অহরহ নানা শ্রেণীর লোককে নানা বিষয়ে ও আপদে বিপদে পরামর্শ দিতে হইত। তাহার মধ্যে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না; কিন্তু পরামর্শ দিবার সময় তিনি তাঁহার পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুর ন্যায়

ব্যবহার করিতেন। এইরূপে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী হইতে সর্ব্বনিম্ন চাপরাসী পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার শত্রু ছিলেন না।

শশিভূষণ প্রায় ২৫ বৎসর হইল কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন কিন্তু ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। এই সমাজের তিনি একজন ট্রাষ্টি ও সহকারী সভাপতি।*

---

* শশিভূষণ বেতন ও ভাতা লইয়া মাসিক ৯৫৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া মাসিক ১৩০০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম শেষ করেন। নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততা সহকারে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিলে কর্ম্মজীবনে কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করা যাইতে পারে শশিভূষণের জীবন তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই কৃতকার্য্যতার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় তিনি সর্ব্বদাই সরকারী কার্য্যগুলি ঠিক নিজের কার্য্য মনে করিয়া সম্পন্ন করিতেন।

প্রায় ৬ বৎসর হইল তিনি তাঁহার পরিশ্রমে উপার্জ্জিত পেন্‌সান ভোগ করিতেছেন।

শশিভূষণের চারি কন্যা ও এক পুত্র দেবকুমার। দেবকুমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ। তিনি বর্ত্তমান ১৯২৯ সনে আই, এস্, সি, পরীক্ষায় পাস্ করিলেন। কন্যাগণ সকলেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত চট্টগ্রাম নিবাসী ডাঃ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন গুপ্তের বিবাহ হইয়াছে। তিনি এডিনবরার এম্, ডি ; এফ্, আর, সি, এস্, চট্টগ্রামের খ্যাতনামা স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেন গুপ্তের ভাগিনেয়। দ্বিতীয় জামাতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুত সুধীর রঞ্জন দাশ, ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের খুল্লতাত পুত্র। তৃতীয় জামাতা স্বনামধন্য স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু (প্রথম বাঙ্গালী র‍্যাংলার) মহাশয়ের পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুত অশোকমোহন বসু। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রেণুকা এই জীবনীর লেখিকা। তিনি কৃতিত্বের সহিত বি, এ, পাশ করিয়াছেন।—গ্রন্থকার।

স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী মজুমদার। *

৺কুঞ্জবিহারী মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা ১২৫৮ সালের চৈত্র মাসে মহেশ্বরপাশাস্থ বিখ্যাত গুহ মজুমদার বংশে ৺হলধর মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মাতার নাম ৺রাসমণি দেবী। ৺রাসমণি দেবী অতি শুদ্ধশীলা, স্নেহময়-স্বভাব-বিশিষ্টা ছিলেন। হলধর মজুমদার মহাশয়ও উদারচেতা এবং শিষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাবুদের জমিদারীর ভিতর পাটিলীদহ নামক স্থলে কার্য্য করিতেন এবং উহারই আয়ে অনেকটা স্বচ্ছল ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তখনকার জীবন বর্ত্তমান জীবনের মত একান্ত স্বার্থপর ও ভোগসর্ব্বস্ব ছিল না। লোকে তখন ইষ্টকালয় এবং অলঙ্কার গঠন অপেক্ষা অন্নদান এবং পূজাপার্ব্বণাদিকে অধিকতর কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ৺হলধর মজুমদার মহাশয়ের পিতা ৺রামলোচন মজুমদার মহাশয় দুর্গোৎসবাদি করিতেন। ৺হলধরও নিজের আয়ে ইহার অনেকটা বজায় করিয়া রাখেন। কুঞ্জবিহারীর বয়ঃক্রম যখন ৯।১০ বৎসর তখন তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। জননীহীন সংসার অকুল সমুদ্রস্বরূপ। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্নকুমার এবং পিতা হলধর কালগ্রাসে পতিত হন। এইরূপে বাল্যকাল হইতেই ভগবান তাঁহাকে দুঃখ শোকের অগ্নিতে দাহ করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ করিয়া লন। বাল্যের এই সকল কঠোর অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি পর জীবনের চিরদারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতির ভিতরও অক্ষুব্ধ, অটল গিরির ন্যায় অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

---

* ৺কুঞ্জবাবুর জীবনী সংগ্রহে তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মজুমদারই একান্ত সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।—গ্রন্থকার।

তৎকালে এই দেশে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সবে মাত্র সূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বিদ্যালয় এখনকার মত অসংখ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। এখন যেখানে ষ্টীমারঘাট, ঐখানে নীলকরদের পরিত্যক্ত কুঠীর এক গৃহে এক মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৺কুঞ্জবিহারী উক্ত বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া শ্রীধরপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য গমন করেন। তখন মাইনর পাশ করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া যাইত। তিনি শ্রীধরপুর স্কুলে পড়িতে থাকেন। তথায় এক জ্ঞাতি সম্পর্কে পিসিমাতার বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা চালাইতেন। তৎকালে মঙ্গলকোট নিবাসী জুনিয়র-সিনিয়র স্কলার সুপণ্ডিত ৺প্রিয়শঙ্কর ঘোষ মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করিতেন। প্রিয়শঙ্করবাবু প্রকৃতই বিদ্যানুরাগী আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। আর আদর্শ শিক্ষকদের এক বিপত্তি যে ভাল ছেলে পাইলে তাঁহারা আপন পুত্রাপেক্ষা তাহাদের ভালবাসিয়া ফেলেন। এই জন্যই অর্জ্জুন অশ্বত্থামা অপেক্ষা দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। মেধাবী, পূতচরিত্র, আর্য্যস্বভাব বালক কুঞ্জ-বিহারী অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রিয়শঙ্কর বাবুর বিশেষ স্নেহপাত্র হইয়া পড়িলেন। যেখানে শিক্ষক এইরূপ ছাত্রের উপর সন্তুষ্ট, সেখানে বিদ্যা-লাভ অবশ্যম্ভাবী। তাই যথাকালে কুঞ্জবহারী বৃত্তি লাভ করিয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ফ্রিচার্চ্চ কলেজে এফ, এ, পড়িতে গেলেন। পুরাতন ফ্রিচার্চ্চ কলেজ ও জেনারেল এসেম্ব্লী কলেজ মিশিয়াই বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজ হইয়াছে। উভয় কলেজই মিশনারী পরিচালিত। সে সময়কার কলেজের অবস্থা এখনকার মত ছিল না। তখন অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় সমূহের শ্রেষ্ঠরত্ন যাঁরা তাঁরাই ঐ সকল কলেজে অধ্যাপনার ব্রত গ্রহণ করিয়া এদেশে আসিতেন। তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই উন্নত আদর্শে শিক্ষিত ও দীক্ষিত, তাই তাঁহারা ছাত্রদের

CamScanner

উপর এমন একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেন যাহাতে তাহাদের জীবন চিরন্তন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। ফাইফ, ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি মহাত্মাগণ তখন ক্রিচার্চের অধ্যাপনায় নিযুক্ত। তাঁহারা ছেলেদিগকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, অবাধভাবে তাহাদের সহিত মিশিতেন, ছাত্র শিক্ষকের ভিতর যে একটা অকারণ ভীতির ব্যবধান দেখা যায় তাঁহারা সেই ব্যবধান রাখিতেন না। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষায় কুঞ্জবিহারী তাঁহাদের বিশেষ স্নেহভাজনরূপে ক্রমে এফ, এ, ও বি, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উভয় পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এফ, এ পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বি, এ, পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া পদার্থ-বিদ্যার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক চল্লিশ টাকা হিসাবে বৃত্তি লাভ করিয়া পদার্থ-বিদ্যায় এম, এ, পড়িতে প্রবৃত্ত হন। মহেশ্বরপাশা গ্রামে তিনিই প্রথম বি, এ। এই সময়কার একটী ঘটনা বিবৃত করিব।

বি, এ, পাশ করার পর (খুব সম্ভব) ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব তাঁহাকে বলেন, "তুমি আর এম, এ, পড়িও না। লাহা বৃত্তি লইলে এম, এ, পাশ করিতে পারে না। আমি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে যাইতেছি। তুমি একাউন্ট বিভাগে চাকুরী গ্রহণ কর, তথায় আমার বিশেষ বন্ধু এক ব্যক্তি আছেন, তাঁহাকে বলিয়া তোমাকে ভাল চাকুরী দিব।" কুঞ্জবিহারী এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন, বলিলেন "আমি স্বাধীন ব্যবসা করিব"। পরে সেই স্থানে ৺কৃষ্ণলাল দত্ত (K. L. Datta) যান এবং তিনি Registrar হইয়া কার্য্য হইতে অবসর লন। কুঞ্জবিহারীর যে আজীবন দারিদ্র্য ভোগ করিতে হইয়াছিল, এখানেই তার সূত্রপাত।

যথা সময়ে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের কথা সত্যে পরিণত হইল। যিনি

আজীবন কৃতিত্বের সহিত সকল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, এইবার তিনি জীবনে প্রথম অকৃতকার্য্য হইলেন। পরে তিনি কোন সময় বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ায় আমার হৃদয়ে একটু দর্প হইয়াছিল, তাই দর্পহারী মধুসূদন এইরূপে আমাকে শিক্ষা দিয়া জীবনে মহাপতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যাঁহারা আত্মদোষ এইরূপে দেখিতে পারেন এবং অকরুণার ভিতরও যাঁহারা করুণাময়ের করুণা প্রত্যক্ষ করেন বাস্তবিক তাঁহারাই বিদ্বান এবং এই সকল লোকোত্তর মহাত্মার চরণ স্পর্শে ধরিত্রী ধন্যা হন।

আর পড়াশুনা হইল না। তখন তাঁহাকে চাকুরীতে বাহির হইতে হইল। তাঁহার এই প্রথম কাজও শিক্ষকতা এবং তাঁহার জীবনের শেষ কাজও এই শিক্ষকতা।

ইহার কিছুকাল পরেই তিনি জাহানাবাদে শিক্ষক হইয়া যান। তাহার পর কালিয়ায় আইসেন। সুপ্রসিদ্ধ ৺সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয় এই সময়ে তাঁহার ছাত্ররূপে কালিয়া বিদ্যালয় হইতে পাশ করেন। পরে কুচবিহার রাজার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে গমন করেন। পরে নিজের ক্ষমতায় প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন এবং রাজকুমারের শিক্ষক হয়েন। বিদ্যা ও চরিত্র প্রভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে বহু উন্নতি লাভ করেন এবং মাসিক আড়াই শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান। প্রায় ষোল বৎসর কাল সমান প্রতিপত্তির সহিত তিনি উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। এই কালের ভিতর বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহার ছাত্ররূপে উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পাশ করিয়া যান। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক এবং দেশনেতা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সময়ে তাঁহার ছাত্ররূপে কুচবিহার স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্তই ছিলেন। আজন্মগত সংস্কারের ফলে

তিনি সর্ব্বদাই যেন যোগযুক্ত থাকিতেন। জাগতিক সুখ দুঃখ তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে পারিত না, কারণ তিনি কর্ম্মকেই দেখিতেন ; কর্ম্মের ফলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। সঞ্চয় তিনি জানিতেন না। যাহা অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, নিজের সংসার এবং আত্মীয়, অসহায় সকলের জন্য ব্যয় করিয়া দিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না।

ষোল বৎসর পরে দৈবগতিকে কুচবিহারের এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আবার চিরদারিদ্র্য বরণ করিতে হয়, এবং এই সময় হইতে তিনি কলিকাতার রিপন কলেজের স্কুল, মূলঘর, লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় যখন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহাকে অধ্যাপকরূপে বরণ করেন। তিনি এখানেও দুই বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। তিনি সকল বিষয়েই সমান পণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজী, সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান সকলই পড়াইতে পারিতেন, এখনকার মত একদেশদর্শিনী বিদ্যা লইয়া তিনি বিদ্বান ছিলেন না। তাঁর ইংরাজীর এক বিশেষত্ব ছিল যে উহার ভিতর latinized learned expression একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। অতি সহজ, সরল ভাষায় তিনি লিখিতে পারিতেন। ইহা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

তিনি দৌলতপুর কলেজ হইতে পুনরায় লক্ষ্মীপাশায় যান, সেখান হইতে কলিকাতায় যান। সেখান হইতে বাগেরহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে ১৯০৮ সালে গমন করেন। ঐ সময় বাগেরহাট স্কুলের অবস্থা অতি ভয়ানক। বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ অবস্থা। ছাত্রসংখ্যা ৩০০ প্রায় এবং ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দেশ-প্রসিদ্ধ। তিনি এই অবস্থায় বাগেরহাট যাইয়া অতি অল্পকালের ভিতরই বিদ্যালয়ের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫৫০ হয়। বিদ্যালয়ে

সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং বাগেরহাট স্কুলের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিক ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। এই কার্য্যের জন্য তাঁহার কখনও বেত্র ব্যবহার করিতে হয় নাই। তাঁহার চেহারার ভিতর এমন একটী মধুর গম্ভীরভাব ছিল, যে ছেলেরা তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া এবং ভাল না বাসিয়া পারিত না। তিনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেই কোলাহলমুখর বিদ্যালয়খানি কি এক অজ্ঞাতশক্তিপ্রভাবে শান্ত নীরব হইয়া যাইত। তাঁহার পড়াইবার এইরূপই কৌশল ছিল যে অতি দুর্মেধা বালকও আপনাকে অবজ্ঞা করিতে পারিত না এবং যত্নের সহিত পড়াশুনা না করিয়া থাকিতে পারিত না। সম্মুখে আসিলেই ছেলেরা আপনাদের কেমন বড় মনে না করিয়া পারিত না এবং বড় হইবার জন্য একটা স্বাভাবিক চেষ্টা তাহাদের ভিতর জাগিয়া উঠিত।

বাগেরহাটে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতে করিতে বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের চৈত্রের শেষভাগে আন্ত্রিক পীড়ায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া সাধনোচিতধামে গমন করেন। সপ্তাহকাল পীড়ায় ভুগিবার পর তিনি স্বীয় পত্নী, জ্যেষ্ঠ পুত্র (অধুনা মৃত), এক কন্যা এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া খুলনায় আগমন করেন। সায়ংকালে খুলনার ঘাটে নৌকা থামিলে ঐখান হইতে রায়সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে পাল্কীতে আগমন করেন এবং ঐ রাত্রিতেই সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নানাবিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে ক্ষণকাল বিরত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

কুঞ্জবিহারীর জীবন সাধারণ এবং তাহাতে আড়ম্বরের লেশ ছিল না, আত্মসুখ, আত্মোপভোগ এ সকল কথা তিনি জানিতেন না। তাঁহার বেশভূষা সাধারণ অপেক্ষাও সাধারণ ছিল, অপরকে সুখী করিয়া তিনি সুখী হইতেন, কাহারও প্রাণে ক্লেশ দেওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি কর্ম্ম করিয়া যাইতেন, ফল অর্পিত ছিল ভগবানে, তাই বিপদ

তাঁহাকে দুঃখ দিতে পারিত না, সম্পদ তাহাকে হর্ষোৎফুল্ল করিতে পারিত না, তিনি পুণ্যচরিত্র, বিগতপাপ, অনহঙ্কার, শান্ত, জিতক্রোধ ছিলেন, তাঁহার প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য, তাঁহার কোমল মাধুর্য্য, তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল বটে কিন্তু তবুও তিনি উপযুক্তক্ষেত্রে তেজস্বী ছিলেন। মহেশ্বরপাশার বড় রাস্তা যাহা নগরের ঘাটে চলিয়াছে, যেখানে রেল লাইন পার হইয়াছে সেখানে বর্ত্তমানে একটী গেট হইয়াছে, পূর্ব্বে লোকের যাতায়াতের জন্য দুটী সিঁড়ী দেওয়া ছিল, এই সিঁড়ি কুঞ্জবিহারীর তেজস্বীতাতেই হইয়াছিল। যখন এদেশে প্রথম লাইন হয়, এবং কর্ত্তৃপক্ষ একজন সাহেবের তত্ত্বাবধানে এখানে কোনরূপ সিঁড়ির ব্যবস্থা না করিয়া তার টানিয়া যাইতেছিল, তখন কুঞ্জবিহারী সাহেবকে বুঝাইলেন, মহেশ্বরপাশাবাসীর সর্ব্বকার্য্যে নদীতে যাওয়ার বিশেষতঃ শ্মশানে শব লইয়া যাওয়ার একমাত্র পথ। পল্লীবধূগণ এই পথেই নদীতে জল আনিতে যায়েন, সুতরাং এখানে লাইন পারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সাহেব কিছুতেই বুঝিলেন না, তখন কুঞ্জবিহারী নিজহস্তে তার কাটিয়া দেন এবং সাহেবের ঔদ্ধত্যের জন্য তাহাকে গালি দেন, ইহাতেই সাহেবের সমুচিত শিক্ষা হয় এবং পারাপারের জন্য দুইটী সিঁড়ির ব্যবস্থা হয়।

কুঞ্জবিহারী স্কুলপাঠ্য কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন :—First Book, Notes to Citizen of India, Rudiments of English Grammar, Junior Trarslation, Beginners' Translation প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

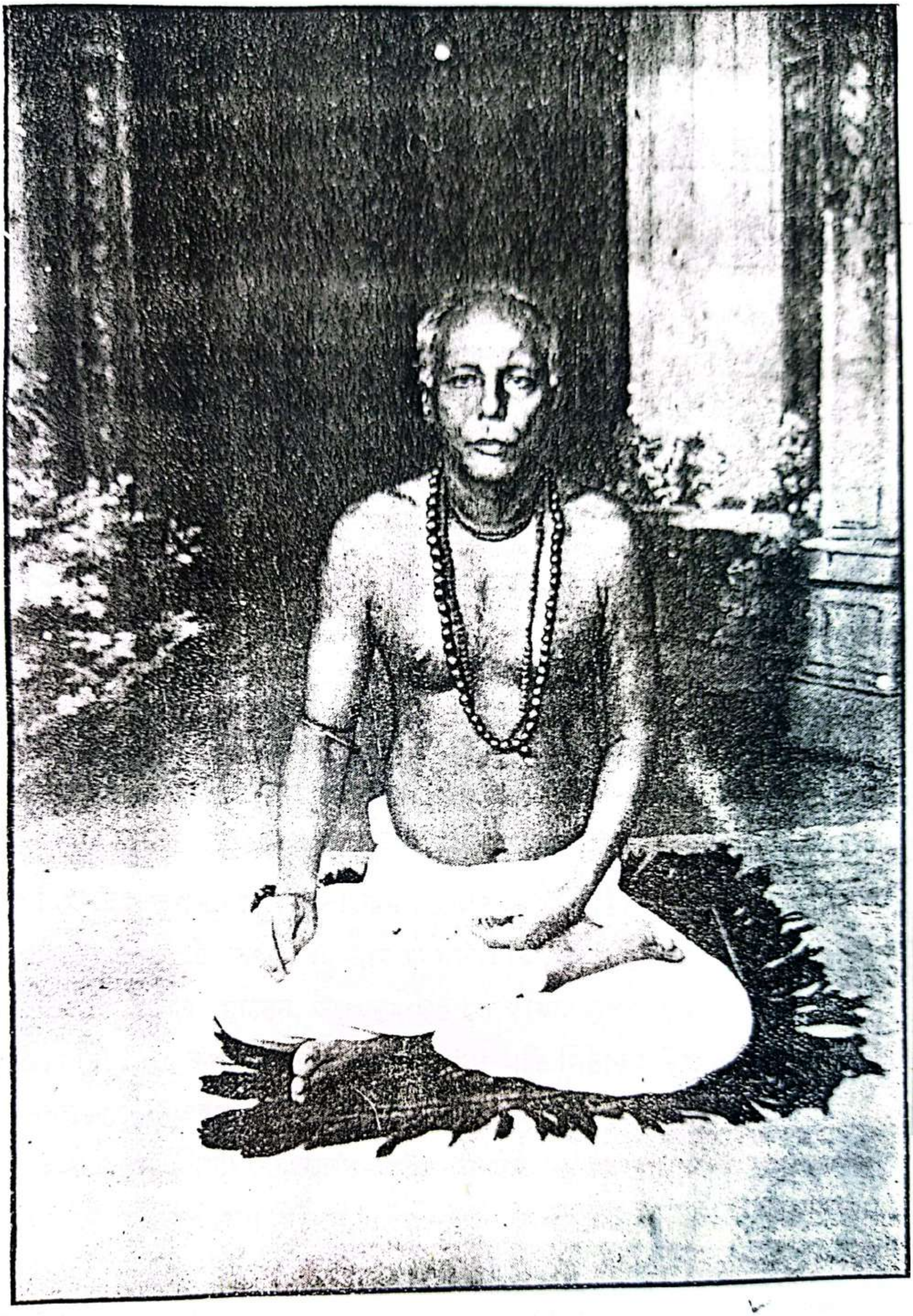
স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ মজুমদার।

(শ্রীগোপাল চন্দ্র মজুমদার বি, এ, লিখিত)।

৺উপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় মহেশ্বরপাশা নিবাসী ৺রামলাল মজুমদার মহাশয়ের পুত্র। রামলাল নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠতার জন্য সকলেই তাঁহার সম্মান রিত, রামলালের পত্নীও সর্ব্বাংশে স্বামীর অনুরূপ ছিলেন।

উপেন্দ্র নাথ মাতা পিতার সকল সদ্‌গুণেরই অধিকারী হইয়াছিলেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভিতর সত্যপরায়ণতা, চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উদ্বোধক বৃত্তি সমূহ পরিলক্ষিত হইত। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পথে শিক্ষালাভ অধিক দিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, এমন কি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্ব্বেই তিনি পাঠত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু যে বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার সদ্‌বৃত্তির উন্মেষক, তাহা তিনি উত্তর কালে প্রভূত পরিমাণে অর্জ্জন করিয়া ছিলেন।

ঐ সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের পূর্ণযোগ, তৎকালে সমস্ত সভ্যসমাজে এক ভাব আসিয়াছিল যে হিন্দু ধর্ম্ম পৌত্তলিকতাদি নানা দোষদুষ্ট, নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনাই আর্য্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, জাতিভেদাদি কল্পিত শ্রেণীবিভাগ মাত্র এবং উহার কোন সার্থকতা নাই। বস্তুতঃ তৎকালে হিন্দুসমাজের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে ঐরূপ একটী ভাব দেশের মধ্যে না আনিলে খৃষ্ট ধর্ম্মের দ্বারা সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। যাঁহারাই একটু যুক্তিতর্কের ধার ধারিতেন, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থার প্রতি আস্থাহীন না হইয়া পরিতেন না, কারণ তখন আর্য্যধর্ম্মের অন্তর্নিহিত যে চিরন্তন সত্য তাহা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণে সেই যুগের বহু সচ্চরিত্র এবং ধর্ম্মপ্রাণ



স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ মজুমদার [পৃষ্ঠা ২২৪

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য)

ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিই ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথও নিজে একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া পড়েন। বানরীপাড়া নিবাসী স্বনামখ্যাত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ও এই সময়ে একজন ব্রাহ্মপ্রচারক ছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী কর্ম্মীরূপে প্রচারাদি করিতেছিলেন। এই সূত্রে গোস্বামীপ্রভুর সহিত উপেন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ পরিচয় এবং গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ঐ বন্ধুত্বসূত্রে মনোরঞ্জন বাবু উপেন্দ্রনাথের সহিত মহেশ্বরপাশায় আগমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারের নিমিত্ত বক্তৃতা আন্দোলন প্রভৃতি করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উপেন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে কর্ম্ম চেষ্টায় গমন করেন, পরে সেখান হইতে ফিরিয়া পুরুলিয়া ব্যাঙ্কে কার্য্য গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিবার পর উপেন্দ্রনাথের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়, ঐ সময়ে ঐ যুক্ত গোস্বামী প্রভু গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে মানস-সরোবর তীরবাসী জনৈক সিদ্ধ পরমহংসের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ব্রাহ্মসভার সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া উগ্র তপশ্চরণে রত থাকেন। ঢাকার অন্তর্গত গেণ্ডারিয়া তাঁহার আশ্রম ছিল, ঐ সময়ে বহু ব্রাহ্মভক্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন, উপেন্দ্রনাথও গোস্বামীপ্রভুর কৃপালাভ করেন। গোস্বামীপ্রভুর কৃপালাভের পর উপেন্দ্রনাথ অতি নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন আরম্ভ করেন এবং নিজের চরিত্রগত বিশেষত্বের ফলে অনতিকাল মধ্যেই তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম হইয়া উঠেন। উপেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই ভগবানে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, এইক্ষণ সদ্গুরু লাভে ঐ ভক্তিভাব আরও শতগুণে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাঁহার সমস্ত দিবসের কার্য্যকেই তিনি ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। ভগবানে অর্পিত বুদ্ধি হওয়ায় তাঁহার অহঙ্কার লুপ্ত হইয়াছিল, তাই,

জগতের যা কিছু ঘটনা পরম্পরা, যা কিছু কার্য্যপরম্পরা সে সমস্ত লীলাময়েরই লীলা এই বিশ্বাস লইয়া তিনি সর্ব্বদা চলিতে পারিতেন এবং এই বিশ্বাস তাঁহাকে সমদর্শী ও সর্ব্বভূতে সমভাবসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল অফিসের কার্য্য হইতে যে সময়টুকু অবসর পাইতেন, তাহা সাধনভজন, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, ভগবানের নাম ও মহাত্মানুকীর্ত্তনেই ব্যয়িত হইত। তিনি গ্রন্থসাহেব পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। গুরুমুখীতে তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। মহাত্মা তুলসীদাসের রামায়ণও তাঁহার প্রিয়গ্রন্থ ছিল। ভগবদ্‌গ্রন্থ পাঠকালে তাঁহার যে উচ্ছ্বাস হইত, তাহা সাধারণ মানবের মধ্যে একান্তই দুর্লভ. তিনি যে উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গোস্বামী প্রভুরা ভগবন্নামের মাহাত্মকীর্ত্তন করিয়া উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্।" মহাপুরুষের আশ্রয়ে ভগবানের মধুর নামের স্মরণ লওয়ায় উপেন্দ্রনাথের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া অতি নির্ম্মলভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা, সত্যপরতা, সংযম বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি লোকের গুণ ব্যতীত কখনও দোষ দর্শন করিতেন না এবং তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই অনাবিল আনন্দে পূর্ণ থাকিত, নিজে সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া অপর সকলকে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া তিনি জীবন-পথে চলিতেন। তাঁহার এই আচরণ, যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত, তাহাকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিত। কি দেশের কি বিদেশের যিনি যখন তাঁহার পুরুলিয়াস্থ ভবনে আগমন করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার আপন পরবোধ শূন্য ব্যবহার দর্শনে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। পুরুলিয়াস্থ যাবতীয় নরনারী তাঁহার উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। সহরের যে কোন লোককে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয়তার অবিসংবাদী প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি যদি কখনও উৎকোচ গ্রহণ

করিতেন, তবে অজস্র অর্থের স্বামী হইতে পারিতেন, কিন্তু অর্থ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্লোভ ছিলেন, ন্যায্য উপায়ে যাহা আয় হইত, তদতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও তিনি কখনও কামনা করিতেন না।

সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়াই তিনি চলিতেন, রোগ, শোক, মোহ কিছুই তাঁহার অটল স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারিত না, রত্নপ্রতিম তাঁহার মধ্যম পুত্র গৌরগোপালের অকাল মৃত্যুতেও তাঁহার বিন্দুমাত্র শোক বা মোহ উপস্থিত হয় নাই। সংসারের সকলপ্রকার আপদবিপদের ভিতরেও তিনি স্থির ও ধীর থাকিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় লোকোত্তর চরিত্রবিশিষ্ট সৎপুরুষ যেকুলে এবং যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সেই কুল এবং দেশ ধন্য। তাঁহার হৃদয় স্বভাবতই দয়া-প্রবণ ছিল, পরোপকার প্রবৃত্তি তাঁহার অতি প্রবল ছিল, তাঁহার বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণেন্দুর বিবাহে তিনি বরপণ এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। কন্যার পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহাকে কন্যার অলঙ্কার পর্য্যন্ত দিতে নিষেধ করেন এবং মাত্র খদ্দরের কাপড় এবং শঙ্খবাদ্য সহকারে পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার পুত্র কৃতী, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীন কার্য্যও করিতেছিলেন, কিন্তু সদাশয় উপেন্দ্রনাথ এক পয়সাও গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার এই উদারতা বঙ্গবাসী মাত্রেরই অনুকরণীয়। বরপণ লোলুপ বঙ্গদেশে না জানি এইরূপ মহাত্মা আর কয়জন আছেন!

এইরূপে 'জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ ও নারায়ণে ভক্তি' অভ্যাস করিয়া ভগবদর্পিত বুদ্ধি এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বিগত ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জ্বররোগে পুরুলিয়ায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদে পুরুলিয়াবাসী মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার আরোগ্য

কামনায় সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ স্থানীয় কতিপয় মাঁড়য়ারী ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া যান, কিন্তু যে কার্য্য করিতে উপেন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়াছিল, তাই শ্রীভগবান তাঁহার এই চিহ্নিত **দাসটীকে তাহার অভয়** চরণে আশ্রয় দিলেন।

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী উপেন্দ্রনাথের গুরু ভাই। উপেন্দ্রনাথ পুত্রগণের দীক্ষা কুলদানন্দের নিকটেই দেওয়াইয়াছেন, কিন্তু সাধন ভজনের যাবতীয় কার্য্য তিনি নিজেই তাহাদিগকে শিখাইয়াছেন।

বর্ত্তমানে উপেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমানের মধ্যম পুরুলিয়া ব্যাঙ্কে কার্য্য করিতেছেন। তৃতীয় আই, এ, পড়িতেছেন। চতুর্থ এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছেন। কনিষ্ঠ স্কুলে পড়েন।

সংক্ষেপে আমরা উপেন্দ্রনাথের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলাম। তাঁহার ত্যাগ, সত্যপরায়ণতা, সংযম, ভগবদ্‌ভক্তি, সর্ব্বভূতে প্রেম ও দয়ার্দ্রতার যুগপৎ সম্মেলন যাঁহারা সৎপুরুষ তাঁহাদের চরিত্রেই দৃষ্ট হয়। আমাদের বহুভাগ্য যে এই মহেশ্বরপাশার ইতিবৃত্তে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন একজন মহাপুরুষের চরিত্র কীর্ত্তন করিবার অবসর আমরা প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার সাত্বিক চরিত্র প্রভাব যেন তাঁহার গ্রামের ভিতর যাহা কিছু সত্য, শিব ও মহান্ তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে পারে। ওঁ শান্তি!

স্বর্গীয় কালীবর ভট্টাচার্য্য।

(অবসর প্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মজুমদার বাহাদুর লিখিত।)

মহেশ্বরপাশা গ্রামে কালীবর ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দুর্গাবর ভট্টাচার্য্য তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং যাজন ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া তাঁহাকে পূজাপার্ব্বণের নৈবেদ্য ইত্যাদি শিষ্যবাড়ী হইতে নিজ মস্তকে বহন করিয়া গৃহে আনয়ন করিতে দেখা যাইত। ইহাতে তিনি একটুও অপমান বা লজ্জা বোধ করিতেন না।

কালীবরের মাতা খুলনার উকিল স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহোদরা ভগ্নী ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চক্রবর্ত্তী বংশ প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন সুতরাং খুব সম্ভবতঃ কালীবরের মাতার মধ্যেও এই গুণটী বর্ত্তমান ছিল। পিতা মাতা দুজনেরই তীক্ষ্ণবুদ্ধি শক্তি যে কালীবরও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। যে বৎসর তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন সেই বৎসরই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় ও দুজনে একত্রে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করি এবং দুজনেই কলেজে দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি লাভ করি। কলেজের হোষ্টেলে আমরা একই বাসায় স্থান পাইলাম। এই সময় একত্রে বাস এবং একত্রে এক ক্লাসে পাঠ করায় অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইলাম এবং আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল।

তখন কতিপয় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছাত্র মিলিত হইয়া কলেজে একটী প্রার্থনা-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং প্রতি বুধ কি বৃহস্পতিবার কলেজের অনতিদূরে এক গৃহস্থের বহির্ব্বাটীর কামরায় সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরোপাসনা হইত। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে কোন কোন ব্রাহ্ম আচার্য্যও আসিয়া উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইহার পূর্ব্বে কালীবর এবং আমি ঘোর ব্রাহ্ম বিদ্বেষী ছিলাম। স্বগ্রামের স্বর্গীয় হৃদয়নাথ ঘোষ, বি, এ, সেনহাটীর স্বর্গীয় ব্রাহ্ম প্রিয়নাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। হৃদয়কে এইজন্য আমরা অনেক উৎপীড়ন করিতাম। পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় অকালে যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হৃদয়ের সঙ্গে আমার মাতুলালয়ের দিক দিয়া সম্পর্ক ছিল; পরে যখন আমি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিয়া ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিলাম তখন নিমন্ত্রণ পত্রে হৃদয়ই স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। হৃদয় অতি উদার চরিত্রের লোক ছিলেন। যাহা হউক কালীবর এবং আমি অল্প দিনের মধ্যেই কলেজের ঐ প্রার্থনা সমাজে যোগ দিলাম এবং রীতিমত উহার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইলাম। ইহার পরে কলেজের ছোট খাটো ছুটীতে আমরা দুই জনে অন্যান্য পুরাতন সভ্যের সহিত কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও বক্তৃতাদিতে যোগ দিতে আরম্ভ করি এবং ব্রাহ্মসমাজের পূজাপদ্ধতি, রীতি নীতি, সংস্কার প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকি।

ক্রমে আমরা কলেজের পুরাতন (Senior) ছাত্র হইয়া পড়িলাম এবং আমাদের দল বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কলেজের ছাত্র সংখ্যা তখন প্রায় আড়াই শত। ইহাদের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ একটী

দলও ছিল। পরে ইহাদের কুকীর্ত্তির কথা আমরা অবগত হই। আমরা পল্লীগ্রামের ছাত্র, আমাদের ধারণাই ছিল না যে অন্ততঃ পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রেরা এতটা অধঃপাতে যাইতে পারে। ঈশ্বর কাহার দ্বারা কি কার্য্য সম্পন্ন করান আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা কি করিয়া বুঝিব। এই সময়ে কলেজে একটী রোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল। একটী ছাত্রের কলিকাতা বাগবাজারে বিবাহোপলক্ষে কলেজের অনেক ছাত্র এবং দুর্নীতিপরায়ণ দলও গোপনে অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া রাত্রের হাজিরা (Roll call) দিবার পরে কলিকাতায় যায়, কলেজের নিয়ম অনুসারে বিনা লিখিত অনুমতিতে কেহ সীমানার বাহিরে যাইতে পারে না। এই জন্য রাত্রের হাজিরা দিয়া তাহারা গোপনে রওনা হইয়াছিল। ঐ দলের মধ্যে কোন অকথ্য কারণে কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী একটী ছাত্রের উপর অন্যদের আক্রোশ ছিল। ইহারা প্রথমে পরামর্শ করিয়াছিল যে ঐ ছাত্রটীর হাত পা বাঁধিয়া নৌকা হইতে গঙ্গায় ফেলিয়া দিবে কিন্তু মাঝিদের ভয়ে তাহা পারে নাই। পরে বিবাহের বাটীতে গিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঐ ছাত্রটীকে একজন বলিল, বড় গরম, চল একটু বাহিরে গিয়া হাওয়া খাইয়া আসি। সে কোন সন্দেহ না করিয়া উহার সঙ্গে বাহিরে গেল। তখন হঠাৎ একটা গুণ্ডা আসিয়া তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ছুরির আঘাত করিতে লাগিল। যে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল সে ভান্ করিয়া ঐ গুণ্ডাকে আক্রমণ করিতে গেল কিন্তু ইতি মধ্যে সে গুণ্ডা পলায়ন করে। ঐ গুণ্ডা ছাত্রটীর পিঠের এক যায়গায়, হাতে ও মুখে জখম করিয়াছিল, এই কাণ্ডের পর বিবাহান্তে ঐ ছাত্রটী ব্যতীত আর সকলে রাত্রেই কলেজে ফিরিয়া আসিল, কারণ ভোর ৬টার সময় আবার হাজিরা দিতে হইবে। ঘটনাক্রমে যখন উহারা ফিরিয়া আসিল তখন কালীবর ও আমি যে কামরায় ছিলাম, উহারা সেই ঘরে প্রবেশ করিল,

CamScanner

তখন রাত্রি ২টা হইবে, উহাদের সঙ্গে ছুরি মারার সময় যে রাস্তায় উপস্থিত ছিল, সেও আসিয়াছিল এবং তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল, আমি তাহাদের গোলমালে জাগিয়া পড়ি, কিন্তু চুপ করিয়া থাকি, তাহাদের কথাবার্ত্তায় সব ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলাম এবং তাহারা চলিয়া গেলে কালীবরকে জাগাইয়া সমস্ত বলিলাম। সকালের হাজিরার সময় আঘাত প্রাপ্ত ছেলেটী অনুপস্থিত হইল কারণ সে রাত্রিতেই ভবানীপুর নিজবাটীতে গিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে। তাহার অভিভাবক কলেজের অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করেন। কলেজে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অধ্যক্ষ সাহেব অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন, সেইদিন হইতে যে পর্য্যন্ত এই ঘটনার তদন্ত চলিল প্রাতে ৬টায় এবং রাত্রি ৮টায় তাঁহার সাক্ষাতে কলেজ হলে গিয়া হাজিরা দিতে হইত। কি প্রকারে আমার মনে নাই, সাহেব জানিতে পারিলেন কালীবর, আমি ও অন্য একটী ছাত্র এই ঘটনা সম্বন্ধে কিছু অবগত আছি। একদিন ক্লাসে (final year) শেষ ঘণ্টায় আমরা ড্রয়িং করিতেছি, (তখন কোন অধ্যাপক ক্লাসে থাকিতেন না) এমন সময়ে অধ্যক্ষ সাহেব হঠাৎ হলে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে আমরা অত্যন্ত ভয় করিতাম, আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঘটনাটি সম্বন্ধে আমি কি জানি। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম এবং তাহাদের কথোপকথনে যাহা শুনিয়াছিলাম ক্লাসে সকলের সম্মুখে বলিয়া দিলাম, পরে কালীবরকেও ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং একই রকমের উত্তর পাইলেন। তৃতীয় ছাত্রটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন উহাদের চরিত্র সম্বন্ধে কি জানে, উত্তর পাইলেন, চরিত্র মন্দ। বাস্, সেইদিনই হুকুম বাহির হইল, ঐ দলের সকলকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া (rusticate) হইল, এবং গবর্ণমেণ্টএর নিকট রিপোর্ট গেল উহাদিগকে কখনও কোন সরকারী কার্য্য যেন দেওয়া না হয়। যে

ছাত্রটীকে ছুরী মারিয়াছিল, তাঁহার ২০৲ টাকা জরিমানা হইল—অপরাধ ছুটী না লইয়া কলেজের বাহির হইয়াছিল। এই সব ছাত্ররা অনেকেই আর দুই তিন মাসের মধ্যে ওভারসিয়ারের শেষ সার্টিফিকেট লইয়া চলিয়া যাইত. সকলেই শেষ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশের ছাত্রদের চরিত্র এইরূপ ছিল না।

এই ব্যাপারের পরে কালীবর ও আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত কলেজের বাহিরে বা কলিকাতায় যাই নাই, আমাদের কামরায় রাত্রে কেহ থাকিতেও চাহিত না, পাছে কেহ আসিয়া ছুরি মারে এই ভয়ে। আমার মনে পড়ে, দরজা বন্ধ করিয়া তাহার হুড়কায় দুখানা কর্ত্তাল এমন ভাবে ঝুলাইয়া রাখিতাম যে একটু ধাক্কা দিলেই নিম্নে পড়িয়া শব্দ করিয়া আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিবে।

সুখের বিষয় এই ঘটনার পর কলেজের সে ভীষণ দলটী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। এই দলের নাম ছিল গোবিস্ ক্লাব (Gobys club); ইহার সভ্য হইবার প্রথম যোগ্যতা এক বোতল মদ্য জল না মিশাইয়া এক বৈঠকে পান করিতে হইবে কিন্তু টলিবে না। ২য় যোগ্যতা কলেজ হোষ্টেলের তেতালা হইতে যে জল নিকাশের নল ছিল, তাহা বাহিয়া ছাদে উঠিতে হইবে! কি ভীষণ দল, এই দুইটি নিয়ম হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

আমরা যখন কলেজে প্রবেশ করিলাম তাহার পূর্ব্ব হইতে আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু যদুনাথ ঘটক গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যদু নাথের বাটী কালীবরের বাটীর সংলগ্ন বলিলেই হয়, মধ্যে একটী রাস্তার ব্যবধান মাত্র। তিনি অতি উচ্চচরিত্রের লোক ছিলেন এবং সুন্দর কবিতা লিখিতেন। কালীবর যদুনাথ এবং আমি বালিকা বিদ্যালয়টীর উন্নতিকল্পে যাহা যাহা করিয়াছিলাম এই পুস্তকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দৌলতপুর স্কুলে আমরা দুইজনে এবং হৃদয়

নাথ একটী নৈতিক সভা স্থাপন করি, এবং তাহাতে অনেক ছাত্র যোগদান করে। কলেজের আড়াইমাস ছুটীর সময় যখন কালীবর এবং আমি বাড়ী যাইতাম এই সভার কার্য্যে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতাম, সপ্তাহে একদিন ইহা বসিত। আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ, বক্তৃতা ইত্যাদি নিয়ম মত চলিত। পরীক্ষা লইয়া পারিতোষিকও দেওয়া হইত। একবার পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে তখনকার খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বি, দে, সভাপতি ছিলেন এবং অতিসুন্দর উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এই সভার কার্য্য দেখিয়া তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভও করিয়াছিলেন।

ক্রমে কালীবর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষা (Licentiate in Engineering) কৃতিত্বের সহিত পাশ করিলেন এবং কলেজের নিয়মানুসারে একবৎসরের জন্য কার্য্য শিক্ষার্থে বাঁকীপুর পূর্ত্তবিভাগে প্রেরিত হইলেন, তখন মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া ভাতা পাইলেন, এই সময়ে একদিন আমি তাঁহার পিতা দুর্গাবর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলাম যে শীঘ্রই তাঁহার দুঃখকষ্টের অবসান হইবে। ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—বামুনে কপাল, না অাঁচালে বিশ্বাস নাই। অত আশা করা ঠিক নয়। বাস্তবিকই তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। কার্য্যশিক্ষা শেষ হইয়া আসিল, গভর্ণমেণ্ট মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে একটী চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া হুকুম পাঠাইলেন, এমন সময় কালীবর নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন, ডবল নিউমোনিয়া—শীতকাল, বাঁকিপুরের ভীষণ শীত, বড়ই বিপদ। মাতুল কুঞ্জবাবু বাঁকিপুরে ছুটিলেন। যথাসাধ্য চিকিৎসা চলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না, তাঁহার জীবনলীলা অঙ্কুরেই সাঙ্গ হইল, যখন এই সংবাদ জানিলাম, আমার মনে হইল কে আমার দক্ষিণ হস্তখানি কাটিয়া ফেলিয়াছে। কালীবরের পিতা ছেলেকে কলেজে পাঠাইবার সময় আমাদের নিকট তমসুখ দিয়া

২০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, কালীবরের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র আমরা সেখান ছিড়িয়া ফেলিলাম। আমি বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, যাওয়া মাত্র তিনি বলিলেন—দেখলে, আমি সেদিন যে কথাটা বলেছিলাম, তাহা হাতে হাতে ফলিল কি না? আমি আর কি বলিব, নীরবে বসিয়া থাকিলাম। এই দুর্ঘটনার কিছু সময় পরে একবার কলেরা হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে কালীবরের মাতা, ছোট ভাই ও বোন (সম্ভবতঃ দুইটী) মারা যান, বৃদ্ধ বাঁচিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এইরূপ সাংঘাতিক পারিবারিক দুর্ঘটনায়ও তাঁহার ধৈর্য্যের চ্যুতি দেখি নাই।

কালীবরের মৃত্যুর পরেই তাঁহার একটী পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, তাহাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য কালীবরের মাতুল কুঞ্জবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই, শুনিয়াছি সে ছেলে জীবনে বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারে নাই, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।*

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার অনেক পূর্ব্বে কালীবরের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম কাদম্বিনী ছিল। তিনিও ইহধামে নাই।

কলেজে প্রার্থনাসমাজে যোগদান করিবার পরে কালীবর পৌত্তলিক

* কালীবরের পুত্র শান্তিগোপালের মেধা ছিল কিন্তু তিনি ভাল সংসর্গ পান নাই। স্থানীয় কন্‌সার্টপার্টিতে যোগদান করিয়া গীতবাদ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। ক্লার্ণেট বাদ্যে দেশে বিদেশে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। অমিতাচারের ফলে তিনি অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুই শিশু সন্তান এবং স্ত্রী শান্তিগোপালের শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। কালীবর জীবিত থাকিলে গ্রামের শ্রী অন্যরূপ ধারণ করিত, একথা এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু সেই কালীবরের বাস্তুভিটায় আজ ঘু ঘু চরিতেছে! বিধির খেলা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের অবোধ্য!—গ্রন্থকার।

পূজা পরিত্যাগ করেন কিন্তু তখন প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করেন নাই। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না—কায়স্থ, বৈদ্য, এমন কি খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের সহিতও এক পংক্তিতে আহারাদি করিতেন। তিনি যখন বাকীপুরে ছিলেন, আমরা একবার তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম তখন আমাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইয়াছিলেন। তখন কি জানিতাম যে সেই তাঁহার সহিত শেষ আহার!

জীবিত থাকিলে কালীবর যে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি অতি সরস উপাসনা করিতেন। খোলবাজনায় এবং ব্রাহ্মসঙ্গীত করিতেও তিনি অতি সুনিপুণ ছিলেন।

স্বর্গীয় বাবু যদুনাথ ঘটক মহাশয়ের সহিত বরাহনগরের একটী শিক্ষিতা বিধবার বিবাহ দিবার সংকল্প কালীবর ও আমার বরাবরই ছিল কিন্তু যদুনাথ বলিতেন, তাঁহার সাংসারিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে চাহিয়া তিনি বিবাহ করা উচিত মনে করেন না।

গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের দুজনের অনেক স্কিম্ (Scheme) ছিল। কিন্তু কালীবর অকালে চলিয়া যাওয়াতে আমি যেন বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ সরকারী চাকরী গ্রহণ করিবার অনেক দিন পরে যখন একবার গ্রামে গেলাম, তখন কোন সহানুভূতির আভাস পাইলাম না। যাহা হৌক, এই সব এবং অন্যান্য কারণে আমাকে বাধ্য হইয়া গ্রামের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন যদি গ্রামবাসিগণ আমাকে তাঁহাদের মধ্যের একজন মনে করিয়া টানিয়া লইতেন, তাহা হইলে হয়ত আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা গ্রামের কিছু উন্নতি করিতে পারিতাম। এই অবান্তর বিষয়টীর উল্লেখ ধৃষ্টতা আশা করি, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। জীবনের এই সন্ধ্যাকালে আমার আর কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। যে চারি বন্ধু একত্রে জীবনসাগরে তরী ভাসাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মাত্র

আমিই বাঁচিয়া আছি। মানুষ সংকল্প করে এক কিন্তু ফল হয় অন্যরূপ, এই বাক্যটী আমার জীবনে ফলিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক কালীবরের ও আমার মনে গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে যে সব মতলব ছিল তাহার দুই একটীর উল্লেখ করিয়া আমার লেখা শেষ করিব।

বরিশাল সহরের প্রায় সকল রাস্তার ধার দিয়া নালা আছে এবং ঐ সব নালার সহিত নদী ও পুষ্করিণীর যোগ আছে। জোয়ারের সময় নদীর জল নালা দিয়া পুষ্করিণীতে প্রবেশ করে এবং ভাটার সময় বাহির হইয়া যায়। ইহার ফলে সহরের আবর্জ্জনা সকল ভাটার সময় স্রোতের সঙ্গে নদীতে চলিয়া যায়। পুষ্করিণীর জল প্রবেশের মুখে লোহার তারের জাল বা শিক্ বসান আছে, ইহাতে মৎস্য বাহির হইয়া যাইতে পারে না। ভৈরবনদ হইতে এইরূপ নালা গ্রামের রাস্তার ধারে ধারে চালাইবার মতলব ছিল। অবশ্য এই কার্য্যটী সম্ভবপর কিনা তাহা লেভেল যন্ত্র দ্বারা প্রথমে নির্ণয় করার আবশ্যকতা ছিল। যতদূর দেখিয়াছিলাম সম্ভব বলিয়াই মনে হইয়াছিল। সম্ভবপর না হইলে গ্রামের পশ্চিমদিক দিয়া নালা কাটিয়া জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা হইত। এইক্ষণে যে সব নালা বর্ত্তমান আছে তাহা লেভেল যন্ত্র দ্বারা জরিপ করিয়া প্রয়োজন মত কোথায়ও গভীর করিয়া কোথাও ভরাট করিয়া এরূপ অবস্থায় পরিণত করিতাম যে কোথাও জল জমিতে পারিত না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি কিরূপে করা যাইতে পারে এই বিষয়ে আমি অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহাতে কালীবর ও আমার স্কিম্ সমস্ত বিবৃত করিয়াছিলাম। কোন কোন স্থান হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত-বিবরণের জন্য পত্রও পাইয়াছিলাম কিন্তু কেহ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পল্লীসংস্কার স্কিম্ ধিকি ধিকি চলিয়াছে—সমুদ্রে গণ্ডুষের মত।

গ্রামের আয়তন অনুসারে এক বা ততোধিক Deluge Pump নামক পাম্প কিনিয়া গ্রামের ডোবাগুলি হইতে জল উঠাইয়া সংলগ্ন জমিতে ছড়াইয়া দিলে ডোবায় ময়লা জন্মিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বের নালার যে যে স্থানে জল জমিয়া থাকে তাহাও ঐ প্রকারে শুকাইয়া ফেলা যায়। এই জাতীয় পাম্পের দাম বেশী নয় এবং উহার কল অতি সরল, সহজে বিগড়ায় না।

কালীবর এবং আমি দুইজনে বসিয়া এই প্রকারের অনেক মতলব করিতাম। আমরা চারি বন্ধু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিব না অথচ গ্রামে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে গ্রামের হিতসাধন করিব এইরূপ মতলব আমাদের সকলেরই ছিল। কিন্তু আজ সে সব কথা বলায় কোন লাভ নাই। সকলেই অকালে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ভগবান যদি কালীবরকে অসময়ে এইভাবে স্বীয় ক্রোড়ে স্থান না দিতেন তাহা হইলে গ্রামের জন্য বোধ হয় আমাকে এ পরিতাপ করিতে হইত না। কালীবর জীবিত থাকিলে গ্রামের শ্রী অন্যরূপ ধারণ করিত, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

ভক্ত সাধু ৺ গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোপীমোহন সন ১২৫০ সালের আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় সে সময় এদেশে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। দৌলতপুর মাইনর স্কুল তখনও স্থাপিত হয় নাই। বস্তুতঃ তখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষার কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ইংরাজ শাসনের



ভক্ত সাধু ৺গোপী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবির্ভাব ১৩ই আশ্বিন ১২৫০ সন। ১৩৮

তিরোভাব ৪ঠা পৌষ ১৩২৭ সন।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্ত. এম. এ. ব্যাকরণ তীর্থ

CamScanner

সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার স্রোত গ্রামের মধ্যে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন গ্রামের বহু ভদ্রসন্তান স্থানান্তরে যাইয়া ইংরাজী ভাষা শিখিতেছেন। গোপীমোহনও গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া যশোহর স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। পাঠাভ্যাসে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল কিন্তু সাংসারিক ঘটনাবিপর্য্যয়ে তিনি ১৮ বৎসর বয়সের সময়েই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। ছাত্র-জীবনে এবং চাকরী হইলেও কিছু দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে।

প্রথমতঃ তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল আফিসে কেরাণীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে মিরজাপুর, আগ্রা, মধুপুর, পুত্তলা প্রভৃতি বহুস্থানেই অবস্থিতি করিতে হয়। আফিসে কেরাণীর কাজ কি ভীষণ পীড়াদায়ক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। গোপীমোহন আফিসে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও বাসায় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠে রত থাকিতেন, শেষজীবনে তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও তাঁহার পুস্তক পাঠে আগ্রহ সমভাবেই বিদ্যমান ছিল, তিনি ইংরাজীতে ভালভাবে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন।

ই, আই, রেলবিভাগে বহুদিন কর্ম্ম করার পর তিনি [illegible] বি, রেল বিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমতঃ কাঁচড়াপাড়া, পরে সৈদপুরে হেড্ক্লার্ক ছিলেন। তাঁহার চাকরী জীবনের একটী বিশেষ গুণ এস্থলে উল্লেখযোগ্য, তিনি মহেশ্বরপাশার এবং অন্যান্য স্থলের বহুলোককে নিজের বাসায় রাখিয়া ভরণ পোষণ দিয়া চাকরী করিয়া দিয়াছেন। এস্থলে ৺যোগেন্দ্র নাথ মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মিত্র মহাশয়দ্বয়ের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ এই তিন মহাত্মার জন্য মাহেশ্বরপাশার বহু ভদ্র সন্তান রেলবিভাগে চাকরী

করিয়া আজ স্ত্রীপুত্রগণের ভরণপোষণে সক্ষম হইতেছেন। গোপী-মোহন পেন্‌সান্ লইবার পরেও যে সমস্ত সাহেবের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল, তাহাদের নিকট সুপ্রারিশ চিঠি দিয়া অনেকের চাকরী করিয়া দিয়াছেন। সে দিনকাল এখন আর নাই, কালের স্রোত অন্য মুখে ধাবিত হইয়াছে। "বাসাবাড়ী উমেদারগণের অবারিত দ্বার" এখন নিশার স্বপন বলিয়া মনে হয়, অন্নদান উঠিয়া গিয়াছে, পরোপকার লোপ পাইয়াছে, এখনকার বাসাবাড়ীর দ্বার রুদ্ধ; শৃগাল কুকুরেও এক মুষ্টি অন্ন পায় না। গৃহিণীর অলঙ্কার নির্ম্মাণে এখন অর্থের সদ্ব্যবহার হয়।

বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট রেলবিভাগে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বে পেনসানের ব্যবস্থা ছিল। গোপীমোহন ই, বি, রেলে অল্পদিন চাকরী করেন বলিয়া তিনি মাহিয়ানার একচতুর্থাংশ মাত্র পেনসান্ প্রাপ্ত হন। তিনি অনুমান ১৩০৪ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ধর্ম্মভাব গোপীমোহনের হৃদয়ে প্রথম জীবনেই জাগরুক হয়। প্রথমে তিনি শক্তির উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার কুলগুরু ৺ কালী নাথ শিরোমণির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন মহাগৌরবের। তিনি বহু মুক্তিকামেচ্ছুর মন্ত্রদীক্ষাগুরু হইয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন, ইহাই বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত সেই জন্য চাকরী জীবনেই এক মহাপুরুষের সন্ধান প্রাপ্ত হন। তিনি সেই মহাপুরুষের নিকটে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই সময় হইতে গোপীমোহনের ধর্ম্মজীবনের ক্রমোন্নতি দেখা যায়। সন্ত-দাস বাবাজী (তারাকিশোর চৌধুরী), ডাঃ সুন্দরী মোহন দাশ, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ৺ নীলমাধব বসু, হাইকোর্টের অন্যতম বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, মৈমনসিংহের জমিদার

শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী এবং কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ ৺কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি সকলে গোপীমোহনের গুরুভাই।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত গোপীমোহনের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। এই মহাত্মার সঙ্গে গোপীমোহনের অনেক সময় ধর্ম্মালোচনা হইত।

৺ভোলাগিরি মহারাজ, অর্জ্জুন দাস, সা সাহেব প্রভৃতি সাধুগণের সহিতও গোপীমোহনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে গোপীমোহন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী আনন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি মনে করিতেছেন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কোন তীর্থস্থানে যাইয়া নিজের কার্য্য করিবেন, তাহা হইবে না; জন্মপল্লীতে থাকিতে হইবে, বহু লোকের ধর্ম্মজীবন আপনার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে।"

ধর্ম্মাত্মা মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বরাহনগরের একজন প্রসিদ্ধ সাধু ছিলেন। তিনি এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন "আজ জাহাজ এসে উপস্থিত, তবে বন্যা এসেছে কিনা, জাহাজ আসতে পারে।" সেই মহিমময় মহিমচন্দ্রের নিকট এক সময় দুই ভ্রাতা গোপীমোহন এবং অন্নদাচরণ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহিমচন্দ্র গোপীমোহনের গলায় ফুলের মালা দিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন দিন আমার কখনও হবে না, হয় নাই।"

সা সাহেব পশ্চিমদেশীয় প্রসিদ্ধ সাধু। তিনি ভগবানের অপার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃতবাণী বেদবাক্য স্বরূপ। তিনি যখন যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অচিরে ফলপ্রদ

হইয়াছে। * গোপীমোহন একবার এই সাধু দর্শনে গমন করেন। সাধু গোপীমোহনকে দুটী মন্ত্র জপ করিতে দেন। প্রথম মন্ত্রের বিষয় অজ্ঞাত থাকে, কিন্তু গোপীমোহন বলিয়াছেন যে জন্য তিনি সাধুর নিকট হইতে এই মন্ত্র প্রাপ্ত হন, তাহা জপ করিতে করিতে পরিণামে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় মন্ত্র দিবার সময় সাধু বলিয়া দিয়াছিলেন, এখনও তোমার কিছু অর্থের প্রয়োজন আছে। পেনসানের টাকায় সংসার চলিবে না। এই মন্ত্র জপ কর, অচিরে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" ইহার কিছু দিন পরে অনুমান ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বনগাঁয় নূতন নৌকো আফিস হয়। উক্ত আফিসের ভারপ্রাপ্ত সাহেব কর্ম্মচারী আফিসের কার্য্য সুশৃঙ্খলাভাবে সম্পাদনের জন্য গোপীমোহনকে বাড়ী হইতে সংবাদ দিয়া লইয়া যান। গোপীমোহন সেখানে ৫ বৎসর কর্ম্ম করেন।

অবসর গ্রহণের পর গোপীমোহন বাড়ীতে বসিয়া সাধন ভজন করিতে থাকেন। আলোকের নিম্নে চিরদিনই অন্ধকার থাকিয়া যায়। দেশের লোকের লক্ষ্য গোপীমোহনের উপর পড়ে নাই, গোপীমোহনের ধর্ম্মজীবন লক্ষ্য করিবার অবসর কাহারও ঘটে নাই। কিন্তু "গুণী গুণং বেত্তি", গোপীমোহনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া দূর দেশাগত বহু

---

* মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী সা সাহেবের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছেন। "প্রয়াগে বাসা হইতে আমরা ষ্টেসনে এসে একখানা গাড়িতে উঠে বসে আছি, হঠাৎ সা সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ঐ গাড়ী হ'তে আমাদের নাবায়ে নিয়ে পাশের গাড়ীতে বসায়ে দিয়ে বল্লেন—এই গাড়ীতেই আপনারা থাক্‌বেন, অন্য গাড়ীতে যাবেন না; মগরাতে গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষণ হ'লে পর দেখলাম আমাদের দুপাশের দুখানা গাড়ীই একেবারে ভেঙে চুরমার। একটী লোক তখনই মারা গেল কিন্তু আমাদের গাড়ীতে কিছুই হয় নাই; তেমন ধাক্কাও লাগে নাই। সা সাহেবের আশ্চর্য্য শক্তি। ... ..." শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ। ৫ম খণ্ড ৩৭০ পৃষ্ঠা।

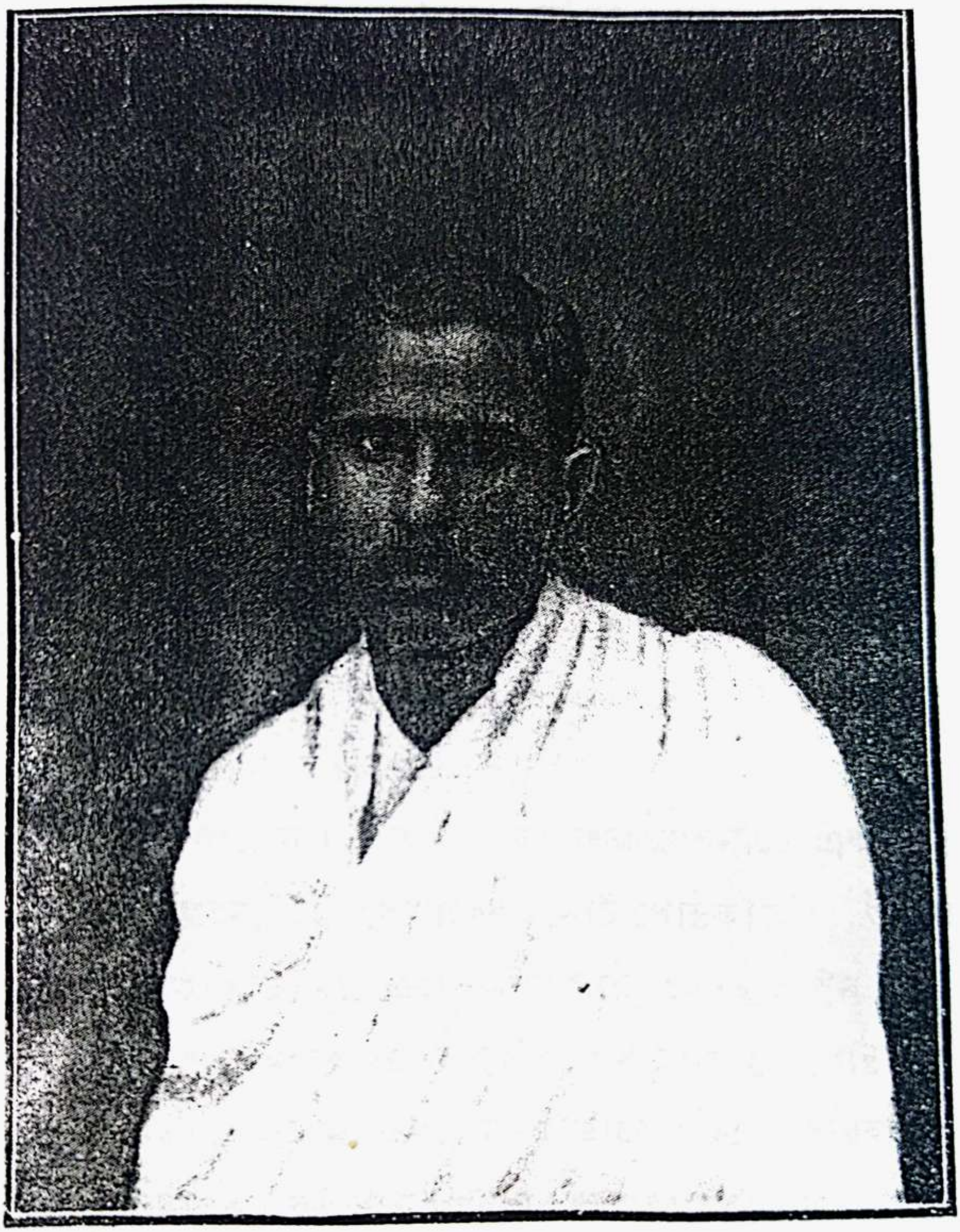
ভক্ত তাঁহার পাদমূলে আশ্রয় লইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে প্রত্যেক জেলাতেই তাঁহার শিষ্য বর্ত্তমান। কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত কিশোরী মোহন গুপ্ত, এম্, এ, ব্যাকরণতীর্থ, তৎকালে দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি গোপীমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধুনা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক সোনাতলা দশানি নিবাসী শ্রীযুত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু, বি, এ, গোপীমোহনের শিষ্য। খালিশপুরের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রসিদ্ধ মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় ইঁহার অন্যতম শিষ্য। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মজীবনে বহু উন্নত হইয়াছিলেন, বারাণসী ধামে ৮ বৎসর কাল তিনি অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস করেন। দৌলতপুর চতুষ্পাঠীর তদানীন্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ গোপীমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বহু দূর দূর দেশের শিষ্যও তাঁহা[illegible] ছিল। বহুশিষ্য পরিবৃত হইয়া গোপীমোহন সাধন ভজন এবং ধর্ম্মালোচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ১৩২৭ সনের পৌষ মাসে দেহ রক্ষা করেন।

গোপীমোহনের দুই পুত্র মোহিনীমোহন ও নলিনীমোহন। মোহিনী মোহন জামসেদপুরে ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, সেখানে তিনি বাড়ী করিয়াছেন, তাহার দুই পুত্র। নলিনী মোহন জীবিত নাই, তাহার তিন পুত্র মাতুলালয় কালীঘাট হালদার বাড়ীতে অবস্থিতি করেন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাল।

শশিভূষণ মহেশ্বরপাশা গ্রামে সন ১২৮৪ সালের পৌষ-সংক্রান্তি দিনে রবিবারে প্রসিদ্ধ বৈশ্য বারুজীবি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীমন্ত পাল একজন সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুখে মুখে কবির গান এবং নানাবিধ ছড়া তৈয়ার করিতে পারিতেন, এই বংশে চিরদিনই সঙ্গীত এবং কলাবিত্যার চর্চ্চা আছে। শশিভূষণের অগ্রজদ্বয় পূর্ণচন্দ্র এবং পরেশচন্দ্র মুখে মুখে গান তৈয়ার করিতে পারিতেন।

শশিভূষণের পিতার আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল এজন্য তিনি শশিভূষণকে পাঠশালায় পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারেন নাই, শশিভূষণ বাটীতে থাকিয়া মাতার সহিত গৃহকর্ম্মাদি করিতেন এবং অবসর পাইলেই মাটি দিয়া পুতুল এবং নানাবিধ কাঠকুটার সাহায্যে রেলের গাড়ী, ঘড়ি-বাঁশী' বেহালা প্রভৃতি প্রস্তত করিতেন, তিনি ছাপার লেখা দেখিয়া ঠিক সেইরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার এই প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার কুলপুরোহিত তাঁহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিনি এক মাসের মধ্যে প্রথমভাগ পড়িয়া শেষ করেন এবং এক বৎসরে প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কতিপয় ভদ্রলোকের সাহায্যে তিনি দৌলতপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন। শশিভূষণের দুরদৃষ্ট—প্রতিভা সত্বেও অর্থাভাবে তাঁহাকে এই সময়ে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইতে হয়, কিন্তু অনেককাল হইতেই চিত্রাঙ্কণে শশিভূষণের আগ্রহ পরি-লক্ষিত হইত, এই সময়ে তিনি কলিকাতা আর্টস্কুল হইতে চিত্রবিত্যা সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়মাবলী আনয়ন এবং জনৈক বিখ্যাত চিত্রকরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া বাটীতে বসিয়াই চিত্রবিত্যা অভ্যাস করিতে লাগি-লেন বলা বাহুল্য অমানুষিক প্রতিভাবলে শশিভূষণ শীঘ্রই ইহাতে



রায় সাহেব শশিভূষণ পাল।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

CamScanner

নৈপুণ্য লাভ করেন। তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়া আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও জাষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দেন। এইরূপ শিক্ষানৈপুন্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা শশিভূষণকে কিছু টাকা পারিতোষিক পাঠাইয়া দেন। ইহার পরে শশিভূষণ সাঁওতাল-পরগণার পাকুড়রাজার হাইস্কুলে ড্রয়িং মাষ্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হন, এই সময়ে রাজপরিবারের কয়েকজনের তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই সময় হইতেই শশি-ভূষণ চিত্রাদি প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শনীতে দিয়া চারিদিক হইতে উচ্চ সার্টিফিকেট এবং পদক পুরস্কার পাইতে থাকেন।

পাকুড় স্কুলে দুই বৎসর কার্য্য করার পর শশিভূষণ দৌলতপুর ও সেনহাটী এই দুই স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন, সপ্তাহে দৌলতপুর ৩ দিন ও সেনহাটী স্কুলে ৩ দিন কার্য্য করিতে হইত। এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই তিনি ভারত এবং বিলাতের বহু প্রদর্শনীতে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করিয়া উচ্চ প্রশংসাপত্র এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইতে থাকেন। তিনি ভারত শিল্পপ্রদর্শনীতে একখানি পোষ্টকার্ড প্রদর্শিত করেন, উহা সেকালের ছোট পোষ্টকার্ড। উহার এক পৃষ্ঠে সমস্ত কলিকাতার দৃশ্য এবং অপর পৃষ্ঠে ১২০০ লাইন লেখা ছিল। উক্ত লাইন এবং অক্ষর এমন কৌশলে সাজান যে পোষ্টকার্ড লম্বাভাবে ধরিলে ১২০০ লাইন এবং চওড়াভাবে ধরিলে হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। বর্ত্তমানে এখানি বরোদা মহারাজের মিউ-জিয়ামে আছে। তাঁহার আরও একখানি চিত্র অতি আশ্চর্য্য, উহার সম্মুখ ভাগ হইতে দেখিলে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মূর্ত্তি, দক্ষিণ ভাগ হইতে দেখিলে জষ্টিস্-শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মূর্ত্তি এবং বামভাগ হইতে দেখিলে রাজা রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি দেখা যায়। এ চিত্রখানি লণ্ডন মিউজিয়ামে আছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর প্রথম স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যে "মাতৃপূজা" পরিকল্পনা চিত্র করিয়াছিলেন, সে সময় সে চিত্র দেখিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দেশে বিদেশে, ভারতে, ইউরোপে বহু শিল্পপ্রদর্শনী হইতে তিনি এ যাবত ৪০এর উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক এবং বহু সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে শশিভূষণ নিজ বাটীতে আর্টস্কুল করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন। ১২ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর স্কুলে চিত্র প্রদর্শনী হইতেছে, এই স্কুলের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া ইং ১৯১৮ সাল হইতে গবর্ণমেণ্ট এবং জেলাবোর্ড সাহায্য করিতেছেন, ঐ সাহায্য এতদিন অস্থায়ী ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে উহা স্থায়ী হইয়াছে। এইক্ষণে উহার পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৬০৲ এবং জেলাবোর্ড ৪০৲ একুনে ২০০৲ টাকা, গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে গত বৎসর (ইং ১৯২৮) দৌলত-পুরে আর্টস্কুলের পাকাগৃহ করিয়া দিয়াছেন।

শশিভূষণের কৃত চিত্রদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বাংলার গবর্ণর তাঁহার বাটীতে আগমন করিয়াছেন এ সৌভাগ্য বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে আর কোন চিত্র-শিল্পীর হয় নাই। ডিউক অব্ কনট্ কলিকাতায় আসিলে বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার সহিত শশিভূষণকে পরিচিত করিয়া দেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে শশিভূষণ তাঁহাকে একখানি ঐতি-হাসিক চিত্র উপহার দেন, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত এই সমস্ত রাজপুরুষের কোন উপহার গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। বলা বাহুল্য তিনি অন্য কোন উপহার লইতে সক্ষম হন নাই, কেবলমাত্র শশিভূষণের উপহারই লইয়াছিলেন। এই চিত্র তিনি অতি আনন্দের সহিত দেশে লইয়া যান, বাংলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লিটন তাঁহার বাড়ীতে এক ভোজে যাইয়া এই চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং শশিভূষণের নাম ঠিকানা তাঁহার নোটবুকে লিখিয়া রাখেন, তিনি অতঃপর ইং ১৯২২ সালের

২৮শে মার্চ তারিখে বাংলার গবর্ণর হইয়া আসেন, বাংলায় পদার্পণ করিয়া প্রথমেই তিনি শশিভূষণের আর্টস্কুল দেখিতে অভিলাষী হন এবং তখন হইতেই তাহার উদ্যোগ আয়োজন চলিতে থাকে। ভ্রমণে বহির্গত হইয়া প্রথমেই তিনি খুলনায় আসেন এবং জুলাই মাসে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মহাধুমধামের সহিত শশিভূষণের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। এই সঙ্গে খুলনার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফোকাস্ ছিলেন। ইহা ভিন্ন লাটবাহাদুরের চিফ্ সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী, অডিকং, ডাক্তার প্রভৃতি ১২ জন রাজপুরুষ ছিলেন। মিলিটারী সার্জ্জন এবং বহুসৈন্য তাঁহার সঙ্গে আইসে। এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৩০০ পুলিশকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে ইং ১৯২০ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শশিভূষণের বাড়ীতে পদার্পণ করেন, তাঁহার সঙ্গে Mr. W. W. Hornell, Director of Public Instruction, Bengal ; Mr. Wordsworth, Asstt. Director, প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের ইনস্পেক্টার, পার্স্যোনাল এসিষ্ট্যাণ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ ল্যাং, কে, সি, দে, জে, এন্, গুপ্ত প্রভৃতি যিনি যখনই প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার হইয়া আসিয়াছেন, তিনিই শশিভূষণের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন।

দিল্লীতে মহামান্য সম্রাট পঞ্চমজর্জের অভিষেক উপলক্ষে শশিভূষণ দিল্লীদরবারে যে চিত্র প্রদর্শন করেন তাহা দেখিয়া স্বয়ং সম্রাট এবং তাঁহার গুণগ্রাহিণী মহিষী ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষে প্রিন্স্ অব ওয়েলস্, ডিউক অব কনট, আর্ল অব্ মিণ্টো তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হার্ডিঞ্জ, লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর,সার এড্‌ওয়ার্ড নর্ম্যান বেকার

প্রভৃতি রাজ পুরুষগণ শশিভূষণকে পদক, সোনার কলম, সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র এবং অর্থ প্রদান করেন।

ইং ১৯২৫ সালে শশিভূষণ রায়সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হন, গবর্ণমেণ্ট হাউসে দরবারে সনদ প্রদান কালে শশিভূষণকে সম্বোধন করিয়া বড়লাট লর্ড লিটন বলেন—

Rai Saheb Sasi Bhuson Pal, when I visited your Art School at Maheswarpasha, in 1922, I was impressed by the enthusiasm with which you devoted yourself to your work. Your initiative and zeal in opening and maintaining the school deserve every commendation and congratulate you on this recognition of your labour of love.

শশিভূষণ এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রশংসাবাণী ও জীবনী দেশে হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য কাগজে এবং ইংলণ্ডের, বিশেষতঃ লণ্ডনের, বহু কাগজে বাহির হইয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েলস্, ডিউক অব্ কনট প্রভৃতি রাজপুরুষগণের প্রশংসা পত্র ভিন্ন আরও কয়েকখানির নাম মাত্র নিম্নে করা গেল—

1. H. Graham, Esq., I. C. S., Private Secretary to His Excellency the Governor of Bengal.

2. H. R. Wilkinson, Esq., Private Secretary to His Excellency the Governor of Bengal. 26. 8. 22.

3. Hon'ble Director of Public Instruction, Bengal. 2. 4. 27.

4. J. Lang, Esq., I. C. S., Commissioner, Presidency Division. 22. 7. 22.

CamScanner

5. Khan Bahadur Nawab Nawabali Choudhury., C. I. E., late Minister of Industries and Agriculture. 17. 8. 27.

6. K. C. De, Esq., I. C. S., C. I. E., Commissioner Presidency Division. 24. 2. 25..

7. E. Hoogewerf, Esq., A. M. S. T. (Manch.), F.S.S., Deputy Director of Industries, Bengal. 16. 9. 23.

8. J. N. Gupta., Esq. I. C. S., Commissioner, Presidency Division. 16. 7. 25.

9. Dr. T. O. D. Dunn, Inspector of Schools, Presidency Division. 16. 2. 22.

10. J. W. Gunn, Esq. Inspector of Schools, Presidency Division.

খুলনায় যিনি যখনই ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন, তিনি শশিভূষণের কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং অযাচিত ভাবে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, কিন্তু যাহাকে স্বয়ং প্রিন্স্ অব ওয়েলস্ সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহার জীবনীতে জেলার ম্যজিষ্ট্রেটের প্রসংসাপত্রের উল্লেখের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গ্লাস্‌গো প্রদর্শনীতে তিনি ভারতবর্ষ, বার্মা এবং সিংহল বিভাগের মধ্যে প্রথম পুরস্কারের অধিকারী হন। এইরূপ ফ্রাঙ্কো ব্রিটিশ প্রদর্শনীতেও তিনি প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন, এবং প্যারিস প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই সমস্ত প্রদর্শনীতেই সমগ্র জগতের শিল্প প্রদর্শিত হয়।

শশিভূষণ ঘরে বসিয়া বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, চিত্রের মধ্য দিয়া ইতিহাসের উন্নতি কল্পে তিনি সমগ্র জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত আছেন।

শশিভূষণের স্বভাব অতি মধুর। হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, কিছুমাত্র তাঁহার মনে স্থান পায় না, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপাধি ভূষিত করিয়াছেন, রাজপুরুষগণ তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন অথচ শশিভূষণ সর্ব্বদা তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন, বেশভূষায় তাঁহার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বালকের ন্যায় সরল প্রকৃতি লইয়া তিনি রাজ পুরুষগণের সহিতও যেমন স্বচ্ছন্দে মিশিতে পারেন, একজন সাধারণ লোক তাঁহার চিত্রাদি দর্শন করিতে গেলেও তিনি সযত্নে তাহার আদর আপ্যায়ন করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করেন না। কমিশনার মিষ্টার জে, এন্ গুপ্ত তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া সত্যই বলিয়াছিলেন —This institution is a splendid example of plain living and high thinking.

শশিভূষণের তিন পুত্র দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাংশু ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করিয়া পিতার ন্যায় চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনিও পিতার ন্যায় তৈলচিত্রাদির জন্য অনেক বিখ্যাত প্রদর্শনী হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলা, মাতার ন্যায় নানাবিধ সূচিচিত্রের জন্য বহু শিল্প প্রদর্শনী হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়া গুণবতী গর্ভধারিণীর নাম রক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছেন।



শ্রীযুক্তা কামিনী সুন্দরী পাল

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

শ্রীযুক্তা কামিনী সুন্দরী পাল।

জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মহেশ্বরপাশার অদ্বিতীয় গৌরব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাল মহাশয়ের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী অনুমান ১২৯০ সালে খালিষপুর গ্রামের ৺রাইচরণ দাস মহাশয়ের কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। যোগ্য স্বামীর ন্যায় তিনিও জগদ্বরেণ্যা! অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের জন্য সুদূর ইউরোপেও তাঁহার নাম দীপ্ত ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সূচিশিল্পে তিনি সিদ্ধহস্ত, তিনি সূচিশিল্পের প্রতিষ্ঠাকারিণী, স্বামীর ন্যায় তিনিও কোন স্কুলকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তা হন নাই। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে অভিনব সূচিচিত্রের (needle work painting) সৃষ্টি করিয়া সুদূর পাশ্চাত্য দেশের নরনারীদিগকেও বিস্মিত করিয়াছেন। খুলনা, যশোহর, ধুবড়ী, কলিকাতা প্রভৃতি দেশের শ্রম ও শিল্প প্রদর্শনীর প্রত্যেকটিতেই তিনি সুবর্ণ পদকের অধিকারিণী হইয়াছেন, কখনও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন নাই। লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি শিল্পপ্রদর্শনী হইতেও তিনি সুবর্ণ পদক এবং বহু প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশে বিদেশে তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতে হৃদয়ে বিপুল আনন্দের উদয় হয়। তিনি মহেশ্বরপাশার রমণীরত্ন। এই ক্ষণজন্মা শিল্পী দম্পতীকে পাইয়া মহেশ্বরপাশা ধন্য হইয়াছে। এই মহীয়সী রমণীর সূচিচিত্র দেখিয়া সসাগরা ধরার অধীশ্বর পঞ্চম জর্জ্জও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহুচিত্রের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ (Battle of Plassey), মহামতি গ্লাডষ্টোন্ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এবং শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রথমোক্ত দুখানি লণ্ডন আর্ট গ্যালারীতে ইংরাজ রাজপুরুষ কর্ত্তৃক অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। সম্রাটের ছবিখানি বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা

আর্ট গ্যালারিতে রাখিয়া বাস্তবিক গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব বড় লাট মহিষী লেডী মিণ্টো কামিনী সুন্দরীর সূচিচিত্র দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি নিজে তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া এক খানি ছবি ক্রয় করেন এবং সুবর্ণ সূচ ও সূতা উপহার পাঠাইয়া দেন। তিনি উহা ক্রিষ্টাল প্যালেসে রাখিয়া দিয়াছেন। সাধারণের মধ্যে ইহা ভারত মহিলার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। ১৯১৫ সালের ১৬ই আগষ্টের হিন্দু প্যাট্রিয়ট এই মহিলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

Mrs. Kamini Sundari Pal, the famous needle work artist, whose portrait as well as her needle work picture of Milton are published in this number has received medals and commendations from various parts of the world. Her needle work pictures of the Battle of Plassey and of Gladstone have found a place of honour in the London Art Gallery. Lady Minto is one of her admirers and has presented one of her pictures to the Crystal Palace. The Maharani of Jhalowar, Lady Meston, the Maharani of Coochbehar and other noble Ladies have encouraged her with appreciation and patronage and altogether she is an artist of whom Bengal may well be proud.

এলাহাবাদ শিল্প প্রদর্শনীতে ঝালোয়ারের মহারাণী কামিনী সুন্দরীর একখানি চিত্র দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ১০০৲ টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন এবং বিলাতে মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জের করোনেশন সময়ে ভারতীয়া মহিলাদের শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য সম্রাটকে উপঢৌকন দেন।

CamScanner

স্বর্গীয় হৃদয়নাথ ঘোষ।

(অবসর প্রাপ্ত এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মজুমদার বাহাদুর লিখিত)।

মহেশ্বরপাশা গ্রামেই হৃদয়নাথের জন্ম হয়, তাঁহার জন্মের সন ও তারিখ জানা নাই কিন্তু একথা সত্য যে তিনি আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন অর্থাৎ ইং ১৮৬৬ কি ১৮৬৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঘোষ মহাশয় বরিশাল জেলার কোন জমিদারের অধীনে নায়েবের কার্য্য করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি তিনি হাজার টাকা মূল্যের অনেকগুলি নোট মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতেন, বোধ হয় পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য। আমার মাতুলালয় তাঁহাদেরই পরিবারের এক শাখা। বাল্যকালে আমি মামাবাড়ীতে অনেক সময় বাস করিতাম বলিয়া উহাদের কার্য্যকলাপ দেখিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমার মনে আছে, ৺পূজার সময় তিনি বড় একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া বাড়ী আসিতেন এবং সঙ্গে বৃহৎ সংসারের জন্য এক বৎসরের উপযুক্ত বরিশালের প্রসিদ্ধ বালাম চাউল আনিতেন। তাঁহার বাড়ীতে সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব এবং শ্যামা পূজা হইত।

হৃদয়ের পিতা স্বর্গীয় বলরাম ঘোষ মহাশয় যক্ষ্মারোগে মারা যান। তখন হৃদয়ের বয়ঃক্রম ১৩/১৪ বৎসর হইবে, তাঁহার মাতা অতি নিরীহ প্রকৃতির রমণী ছিলেন। শ্বশুর শ্বাশুড়ী বর্ত্তমান থাকাতে সংসারে যে তাঁহার কেবল কোন মতামত ছিল না তাহা নহে, তিনি ও পরিবারের অন্যান্য মহিলাগণ শ্বাশুড়ীর কঠোর শাসনাধীনে ছিলেন। শ্বাশুড়ী

ঠাকুরাণী অত্যন্ত কলহ ও ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। তখনকার দিনে চাকরী-স্থলে পরিবার লইয়া যাইবার রীতি ছিল না তাই ধনঞ্জয় ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী বারমাস বাড়ীতেই থাকিতেন।

এই সময়ে আমরা কয়েকটী বালক ৺পূজার পূর্ব্বে একদিন কি এক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ঘোষ মহাশয়ের ৺পূজার মণ্ডপে গোপনে প্রবেশ করি। তখন প্রতিমা চিত্র করা হয় নাই এবং ৺পূজার দুই সপ্তাহ বাকী ছিল। আমরা দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া প্রতিমার মূর্ত্তির আঙ্গুল ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। অসুরের কাছে গিয়া বলিলাম, তুমি বাঘকে চড় মারিবে, আচ্ছা তোমার হাত ভাঙ্গিয়া দিতেছি। বাঘকে বলিলাম, তুমি অসুরকে কামড়াইবে, আচ্ছা তোমার দাঁত ও জিব উপ্‌ড়াইয়া দিতেছি। এইরূপে গণেশের শুঁড়, কার্ত্তিকের আঙ্গুল, ময়ূরের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিলাম। দুই চারিদিন পরে চিত্রকরেরা প্রতিমা চিত্র করিতে আসিয়া এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক! বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যাহারা প্রতিমা গড়িয়াছিল, তাহারাই চিত্রকর, সুতরাং রাত্রের মধ্যেই পরিশ্রম করিয়া ভগ্ন অঙ্গগুলি মেরামত করিয়া যথাসময়ে চিত্রকার্য্য শেষ করিয়াছিল। আমরা এমনভাবে চুপ করিয়াছিলাম যে কে এই দুষ্কর্ম্ম করিল তাহা কেহ ধরিতে পারিল না।

হৃদয়নাথ এই সময়ে বা ইহার দুই এক বৎসর পরে সেনহাটী গ্রামে ব্রাহ্ম প্রিয়নাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতেন এবং সেখানে ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মোপাসনা কি তাহা আমরা তখন জানিতাম না, তবে ইহা শুনিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মদের জাতি বিচার নাই ও তাঁহারা প্রতিমা পূজা করেন না। আমরা হৃদয়কে 'বেহ্ম' বলিয়া খুবই নির্য্যাতন করিতাম। ক্রমে একথা তাঁহার ঠাকুর দাদার কাণে গেল। তিনি হৃদয়কে ডাকিয়া

কঠোর তিরস্কার করিলেন এবং সেনহাটী যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু হৃদয় সেকথা শুনিলেন না। পূর্ব্ববৎ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের আপন পিতামহী পূর্ব্বেই পরলোকগতা হন এবং ধনঞ্জয় ঘোষ মহাশয় পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র হয়, রজনীকান্ত ও নেপালচন্দ্র, সুতরাং হৃদয়ের পিতা বলরাম এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সপত্নী পুত্র। পিতামহ বর্ত্তমানে পিতার মৃত্যু ঘটিলে হিন্দু আইন অনুসারে পৌত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন না। এই নিয়মানুসারে পিতামহের সম্পত্তির অংশ হৃদয়ের পাইবার কথা নয় ও ইহার উপর পিতামহের নিষেধ অমান্য করিয়া বিধর্ম্মীদিগের দলে মিশিতে লাগিলেন, সুতরাং হৃদয়কে তিনি ত্যজ্য পৌত্র করিয়া যান, কিন্তু ধনঞ্জয় ঘোষ পৌত্রকে ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন—এমন কি অনেক দিন ধরিয়া হাত বাঁধিয়া প্রহারও করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু কিছুতেই বালকের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। সম্পত্তির লোভও দেখাইয়াছিলেন, অবশেষে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করিতেছে হৃদয়নাথ কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ অল্প বয়সে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন বহু নির্য্যাতন ভোগ এবং চিরকালের জন্য সাংসারিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহা হইতে স্খলিত হন নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল এবং প্রশংসনীয়।

ইহার পর ক্রমে তিনি দৌলতপুর স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং ক্রমে বি, এ, পাশ করিলেন। কলিকাতার খরচ তিনি ছেলে পড়াইয়া চালাইয়াছিলেন, পরে তিনি তাঁহার কাকা রজনীকান্তের নিকট হইতেও কিছু নগদ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কলেজের পড়া শেষ করিয়া তিনি কলিকাতা

স্বদেশী কাপড়ের দোকান করেন এবং একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহার মাতাকে নিকটে রাখেন। কাপড় লইয়া তাঁহাকে বাড়ী বাড়ী ফিরি করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু দোকান অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পরে তিনি শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী মনোরমা সুশিক্ষিতা এবং প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন। অতঃপর হৃদয়নাথ পাটনার অন্তর্গত বাঢ় সাবডিভিসনের উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এখানে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। এই সময়ে তাঁহারা পাটনার দাতব্য হাসপাতাল হইতে একটী অনাথা শিশু কন্যাকে আনিয়া নিজ সন্তানের ন্যায় পালন করেন, তাহার নাম রাখিলেন নন্দরাণী। মনোরমার নিজের সন্তান ছিল না, এই শিশুটিকেই নিজ সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া লইলেন। হৃদয়ের মাতা একথা জানিতেন না—তাঁহার বিশ্বাস ছিল নন্দরাণী মনোরমারই গর্ভজাত। এইজন্য অতিশয় স্নেহ ও যত্নসহকারে তিনিও তাহাকে লালনপালন করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে মনোরমা হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। হৃদয় মহাশোকে অভিভূত হইয়া সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তখন নন্দরাণীই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু হইয়া পড়িল। ইহার কয়েক বৎসর পরে হৃদয় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন এবং দুবৎসরের মধ্যেই পরলোক গমন করিলেন। শেষ জীবনে তাহাকে দারুণ অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি সোন নদীর তীরে কৈলোয়ার নামক স্থানে গিয়াছিলেন, তখন আমরা মধুপুরে ছিলাম। ইহার অল্পদিন পরে কৈলোয়ারেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর পালিতা কন্যা নন্দরাণী আমাদের আশ্রয়ে আসে। কতদিন সে আমাদের পরিবারে ছিল স্মরণ নাই কিন্তু কিছুকাল পরে হৃদয়ের মাতা উহাকে তাঁহার পিত্রালয় সিদ্ধিপাশা গ্রামে নিজের নিকট

রাখিবার জন্য বারংবার পত্র লেখায়, সেখানে পাঠাইয়া দিলাম, কিন্তু নানাকারণে সেখানে তাহার থাকিবার সুবিধা হইল না, তাহাকে পুনরায় কলিকাতায় আনাইলাম, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুরুলিয়ার বাটীতে তাঁহার সহোদরা ভগিনী অমলা দাশ একটী অনাথাশ্রম খুলিয়াছিলেন। দাশ পরিবার আমাদের আত্মীয়, নন্দরাণীর সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তিনি উহার ভার গ্রহণ করিলেন, এবং পুরুলিয়ায় লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে নন্দরাণীর বিবাহ দেওয়া হয়, ইহার সমস্ত ব্যয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই বহন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটী সন্তান জন্মিবার পরে নন্দরাণী বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতেছে। *

---

* হৃদয়নাথের জীবনের একটী প্রধান ঘটনা রায় বাহাদুর আলোচনা করেন নাই। এই গ্রামে মজুমদার পাড়ায় যখন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া নানাভাবে তাহার উন্নতির চেষ্টা হইতেছিল, তখন বারুজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত না থাকায় তাহা প্রচলনের জন্য হৃদয়নাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নিজের পল্লী এবং নিজের সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া তিনি বারুজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভিক্ষাঝুলি হস্তে প্রতি বাড়ী ঘুরিয়াছেন। উক্ত পল্লীস্থ ৺নটবর পাল ও শ্রীযুত প্রেমচাঁদ পালের ভ্রাতা ৺শশিভূষণ পালকে (পরে ডেপুটী রেজ্ঞার) সহকর্ম্মীরূপে প্রাপ্ত হন। এই দুই মহাত্মার আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে শশিভূষণের বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য আজ শিক্ষিত বারুজীবি মাত্রেই স্বর্গীয় হৃদয়নাথের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন—গ্রন্থকার।

শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গোপালচন্দ্র সন ১২৬২ সালের ২৩শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালাতে তাঁহার প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত হয়। জন্ম হইতেই দারিদ্র্য গোপালচন্দ্রের প্রিয়সঙ্গী। বাল্যে পিতার অবস্থা স্বচ্ছল থাকিলেও তিনি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, এজন্য স্ত্রীর ভয়ে তাঁহার সপত্নীপুত্রকে কখনও স্নেহ করিতে পারেন নাই। "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী" এই প্রবাদ সত্য হইলেও দারিদ্র্য গোপালচন্দ্রের পরম বন্ধুরূপে জীবনে তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছে, তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে দৌলত-পুরে মাইনর স্কুল স্থাপিত হইলে, তিনি সেখানে অর্দ্ধ বেতনে পড়িবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। মাইনরে সে সময় সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ভারতবর্ষের, ইংলণ্ডের, রোমের এবং গ্রীসের ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা, অর্থব্যবহার, সমগ্র শুভঙ্করী, সংস্কৃত ঋজুপাঠ ১ম ভাগ ও ব্যাকরণ এবং ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়িতে হইত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় সাহিত্যেই ছন্দ ও অলঙ্কার শিখিতে হইত। গোপালচন্দ্র ক্লাসের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন, ডবল প্রমোশন পাইতেন কিন্তু গণিতে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল না, সেজন্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৩য় বিভাগে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মাইনর পাশ করিলে সেকালে এণ্ট্রান্স স্কুলের ২য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া যাইত। গোপালচন্দ্র শ্রীধরপুর স্কুলের ২য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন, কিন্তু তিনি শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়েন, এজন্য শ্রীধরপুরে আর পড়া হইল না। ইহার পরে তিনি রংপুরের অন্তর্গত উলিপুরে পাঠ করেন, সে সময় এ দেশে রেল ষ্টীমার হয় নাই; বিদ্যার্জ্জনে গোপালচন্দ্রের এতদূর স্পৃহা ছিল

যে তিনি জনৈক আত্মীয়ের সহিত সেই কিশোর বয়সে উলিপুর পর্য্যন্ত হাটিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর ইং ১৮৭৫ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি হুগলীতে আগমন করেন। তিনি যেরূপ ছাত্র, তাহাতে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইবার কথা, কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ায় এক বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। তাঁহার স্কুলের পাঠ এইখানেই সমাপ্ত হয়, ইহার পরে তিনি রংপুরের অন্তর্গত ফুলকুমার এবং পরে বাগুরা মধ্যইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বাড়ী আসেন কিন্তু কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য আর বাগুরায় যাইতে পারেন নাই। বাগুরায় প্রতিগমন করিলে পরিণামে রাজসাহী বিভাগের স্কুলসাবইনস্‌পেক্টার হইতে পারিতেন। এই সময় খুলনা নূতন জেলায় পরিণত হয়। গোপালচন্দ্রের হিতৈষী ডেপুটী ইনস্‌পেক্টার ৺হরিহর দাস খুলনায় আগমন করেন,তাঁহার পরামর্শে, বাল্যবন্ধু ও আত্মীয় ঘাটভোগের শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অনুরোধে ঘাটভোগে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাকরী লইতে বাধ্য হন, এই সময়ে অবকাশ মত ৺কৈলাসনাথ চূড়ামণির নিকট তাঁহার টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁহার লক্ষ্য, কিন্তু এক সহোদরের মৃত্যুতে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। এইস্থানে শিক্ষকতা আরম্ভ করার পর হইতে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক পাঠ করিতেন। ঘাটভোগে শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল, তাঁহার শিক্ষকতায় বহু ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছে, এই গ্রামের বহু ছাত্রের নাম করা যাইতে পারে। সন ১৩২৭ সালের ৩১শে আশ্বিন তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইলে কার্ত্তিক মাস হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

গোপালচন্দ্রের স্ত্রী কামিনী দেবী স্বামীর অনুকূলা সহধর্ম্মিণী ছিলেন এবং তাঁহাদের পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম দরিদ্রের সংসারে শান্তির কারণ

ছিল। উভয়ের মিতব্যয়িতাগুণে শিক্ষকতার সামান্য আয় হইতে পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া অনেক টাকার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন।

এক সময়ে গোপালচন্দ্র ৪১ জন বন্ধুলোকের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন পুত্রদের বিবাহে পণ গ্রহণ করিবেন না। গোপালচন্দ্র এবং ঘাটভোগের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, আর কেহ পারেন নাই। গোপাল চন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ, তাঁহার পুত্রদ্বয়ও শিক্ষিত এবং উপার্জ্জনশীল। বন্ধুদের ন্যায় ইচ্ছা করিলে গোপালচন্দ্র যথেষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সত্যবাদী, অর্থলোভে তিনি কখনই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ স্বার্থত্যাগ বাস্তবিকই বিরল। তাঁহার আর একটী প্রধান গুণ চরিত্রের পবিত্রতা, যৌবনে অনেক প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও তিনি স্বীয় চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি ঈশ্বরচিন্তায় এবং জ্ঞানচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ তারানাথ কলিকাতায় পাটের আফিসে কাজ করিতেছেন, কনিষ্ঠ দুর্গানাথ, বি-এল্ পাশ করিয়া খুলনায় ওকালতী করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মিত্র।

মহেশ্বরপাশার প্রসিদ্ধ মিত্রবংশের ৺গিরিধর মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী মিত্র অনুমান ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সৈদপুরে ই, বি, রেলে ডিষ্ট্রীক্ট লোকোমোটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর আফিসে হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। ৩০ বৎসর চাকরী করার পরে ইং ১৯০৯ সালে পেন্‌সান লইয়া সেই অবধি কাশীবাস করিতেছেন। পূর্ব্বে উহা গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট ছিল এবং পেনসনের সময় তাঁহার ১৫০৲ টাকা বেতন

ছিল। বর্ত্তমানে ঐ পোষ্টের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পেনসান্ উঠিয়া উহার পরিবর্ত্তে প্রভিডেন্ট ফণ্ড হইয়াছে।

কুঞ্জবিহারী দেশের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন, তিনি নিজে অপুত্রক অথচ বাড়ীতে তাঁহাকে বহুগোষ্ঠী প্রতিপালন করিতে হইয়াছে। চাকরীস্থলে বাসায় বিস্তর জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়স্বজন, গ্রামের নিঃসম্পর্কীয় লোক এবং অন্য গ্রামের লোককে বাসায় রাখিয়া কাহাকেও খাওয়াইয়া পরাইয়া, কাহাকেও বা শুধু খাওয়াইয়া চাকরী করিয়া দিয়াছেন। যাহাদের বেতন অল্প ছিল, তাহাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাসায় রাখিয়া তাহাদের আহার যোগাইয়াছেন। লাইনে যাহারা চাকরী করিতেন তাহাদের মধ্যে অনেক পরিচিত লোক হেড্ কোয়ার্টারে আসিয়া তাঁহার বাসাতেই থাকিতেন। এত লোকের থাকিবার স্থান দিবার জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত ঘরদরজা করিতে হইয়াছিল এবং সময়ে সময়ে অতিরিক্ত চাকর এবং পাচক ব্রাহ্মণও রাখিতে হইত। এই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াও তিনি অনেক দুঃস্থ নিকট আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোষণের জন্য আবশ্যকানুসারে মাসিক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং দুঃস্থ দূরবর্ত্তী আত্মীয়দিগকেও সাময়িক সাহায্য করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে অনেকের ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যয় বহন করিয়াছেন, অনেকের দেনা পরিশোধ করিয়াছেন এবং কাহারও কাহারও কন্যার বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য তাঁহার আয়ের ⅔ অংশ ব্যয় হইয়া যাইত, বাকী ⅓ অংশ নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণে ব্যয় করিতেন, গবর্ণমেণ্টের চাকরী ভিন্ন তাঁহার আরও কিছু আয় ছিল, এই বিরাট ব্যয় বহন করিবার জন্য তাহাকে কয়েকটী প্রাইভেট চাকরী করিতে হইত। চাকরীস্থলে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় একটী রেজিষ্টরীকৃত ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ ষ্টোর স্থাপন করেন, ইহাতে তাঁহার যে অংশ ছিল, তাহার সুদ মাসে ২০৲।২৫৲ টাকা পাইতেন।

কুঞ্জবিহারী দৌলতপুর স্কুলে ৫০০৲ টাকা মূল্যের এক সেট Encyclopædia Britanica পুস্তক এবং উহা রাখিবার জন্য একটী আলমারী দান করিয়াছেন।

কুঞ্জবিহারী সাধারণ গৃহস্থঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হইয়াছেন এবং দরিদ্রের সুখদুঃখ তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, সেজন্য চাকরীর সময়ে নিজের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া তিনি বহু দরিদ্রকে খাওয়াইয়া পরাইয়া চাকরী দিয়া মানুষ করিয়া দিয়াছেন। ৺কাশীধামে এখনও তিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, স্ব-শ্রেণীর দরিদ্র ও নিঃসহায় বিধবাগণ ৺কাশীধামে বাস করিয়া মুক্তিলাভের অভিপ্রায়ে বহুক্লেশ সহ্য করিয়া জীবনযাপন করেন, তাহাদের দুঃখ অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও যাহাতে হ্রাস করিতে পারেন এজন্য কুঞ্জবিহারী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন, সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা এবং যাহারা ৺কাশীধামে বেড়াইতে যান, তাঁহাদের নিকট হইতে সাময়িক সাহায্য বা এককালীন দান পাইয়া এই সমস্ত দরিদ্র বিধবাকে সাহায্য করা হয়, অনাথার মৃত্যু হইলে সমিতি হইতে তাহার সৎকারের ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে।

কুঞ্জবিহারী বর্ত্তমানে নিঃসন্তান। একমাত্র সন্তানবিয়োগে তাঁহার স্ত্রী উন্মাদগ্রস্তা, সুতরাং পারিবারিক জীবনে কুঞ্জবিহারীর শান্তি নাই, তবে তিনি কর্ম্মবীর, জীবনে অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন এবং এখনও নানাকর্ম্মে বিশেষতঃ দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরম-শান্তি লাভের চেষ্টায় আছেন।

স্বর্গীয় পণ্ডিত যদুনাথ ঘটক।

(রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মজুমদার অবসর প্রাপ্ত এক্‌জিকিউটিভ্‌ এঞ্জিনিয়ার লিখিত)।

যদুনাথ ঘটক মহেশ্বরপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সন এবং তারিখ আমি জানি না। তবে তিনি আমা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিলেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, সামান্য ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল এবং তিন চারি বিঘা লইয়া বসতবাটী ছিল, ইহা ভিন্ন তিনি নিজে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে সামান্য বেতনও পাইতেন। এই সকল হইতে তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয় কোনরূপে চলিয়া যাইত।

তিনি ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু বাংলাভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার সহিত যখন আমার ভালরূপ পরিচয় হয়, তাহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ছিলেন। এই বিদ্যালয়টী বহুবৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। আমরা ছোট বেলায় দেখিয়াছি, হাড়িবুড়ী নামে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ছাত্রীদিগকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে লইয়া আসিত। তখন যিনি পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার মৃত্যুর পরই বোধ হয় যদুনাথ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সচ্চরিত্র এবং ধর্ম্ম ভীরু ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর ছিল। তাঁহাকে কখনও কাহারও উপর রাগ করিতে অথবা কাহাকেও কটু কথা বলিতে দেখি নাই, তিনি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার অনেক কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত

হইতে দেখিয়াছি।* বেহুলার ভাসান, কন্যা বিক্রয় এবং আরও কয়েকখানি গীতিনাট্য তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গ্রামের ছেলেরা সেগুলি অভিনয় করিত। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী উচ্চদরের ছিল এবং বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৺কালীবর ভট্টাচার্য্য এবং আমি যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও উন্নতি করিতে আরম্ভ করি, তখন যদুনাথ আমাদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। স্বর্গীয় হরিনাথ বসু মহাশয়ও এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন।

কলিকাতার নিকট বরাহনগরে স্বর্গীয় শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী বিধবাশ্রম ছিল। এই আশ্রমের একটী বিধবা মহিলার সহিত কালীবর এবং আমি যদুনাথের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। স্বাস্থ্য খারাপ এবং সাংসারিক অবস্থা অসচ্ছল বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ ছিল, আমরা তাহা খেয়াল করি নাই। একবার কলিকাতায় একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ (কৈলাস কবিরাজ) মহাশয়ের নিকট তাঁহাকে লইয়া যাই। তিনি পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন। আমি বলিলাম, উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঔষধ ক্রয় করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য। ইহার উত্তরে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন ঔষধের মূল্য লইবার তাঁহার কোন আগ্রহ নাই, রোগীর রোগযন্ত্রণা দূর করিতে পারিলেই যথেষ্ট

---

* আমি মহেশ্বরপাশার ইতিহাস লিখিতেছি শুনিয়া বগুড়ার সিভিল সার্জ্জন এই গ্রামবাসী ডাক্তার শ্রীযুত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পণ্ডিত যদুনাথ সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছেন—"ঘটক মহাশয় সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কয়েকটী কবিতা নব্যভারতে বাহির হইয়াছিল, সেগুলির জন্য ১৮৮৯ হইতে ১৮৯৪ সালের নব্যভারত খুঁজিয়া দেখিও। পাণ্ডুলিপি যদি থাকে, উদ্ধার করিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিও।"

—গ্রন্থকার।

১২৬৪



৺হরি নাথ বসু বি, এল।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

মূল্য পাইলেন, মনে করেন। তিনি আরও বলিলেন, যদি মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, অল্প যাহা কিছু দিতে পারেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব, যদি কিছুই দিতে না পারেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই।

পৃথিবীতে যদুনাথের একজনও শত্রু ছিল না—পরন্তু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসার চক্ষে দেখিতেন। কোন ছাত্রী কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকিলে রাত্রে তাঁহার বাটীতে গিয়া তাহাকে পড়াইতেন।

নিউমোনিয়া রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ ছিল বলিয়া এই সাংঘাতিক ব্যাধির প্রকোপ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, অকালে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে গ্রামের বিশেষতঃ বালিকা বিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

স্বর্গীয় হরিনাথ বসু, বি. এল।

স্বর্গীয় পিয়ারীমোহন বসুর চারি বিবাহ, তাঁহার তৃতীয়া স্ত্রী ৺রাইকিশোরীর গর্ভে যদুনাথ এবং হরিনাথের জন্ম হয়; হরি[illegible] সন ১২৬৬ সালের আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু জন্মের দেড় মাস পরেই তাঁহার গর্ভধারিণী দুরন্ত ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যান। অসহায় মাতৃহীন শিশুকে লইয়া পিয়ারীমোহন বিপদে পতিত হন, কেমন করিয়া ইহাকে প্রতিপালন করিবেন, সেই চিন্তাতেই আকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরিণামে যিনি দশের মধ্যে একজন হইয়া দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিবেন,

তাঁহার প্রতিপালনের উপায় স্বয়ং ভগবানই করিয়া রাখিয়াছেন। নিতান্ত আপনার জনে যে কার্য্য করিতে সাহস বা ইচ্ছা করেন নাই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সেই দায়িত্বের কার্য্য স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া যেমন দয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তেমনি গ্রামেরও এক মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। এই দয়াবতী রমণী বসুমিত্র পাড়ার ৺কৃষ্ণহরি মিত্রের স্ত্রী যদুনাথ হরিনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রসন্নকুমারের শ্বশ্রূঠাকুরাণী। উত্তরকালে হরিনাথ চাকরীস্থল হইতে যখনই বাড়ী আসিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে এই পালিতা মাতার চরণতলে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত [illegible]নী জননীজ্ঞানে তাঁহার পদে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সরলাবালাও সর্ব্বদা স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন।

হরিনাথের দুই বিবাহ। প্রথম বয়সে তিনি নড়াইল জমিদার বাবুদের জ্ঞাতি বাবু নীলকমল দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি অল্প বয়সে দেহত্যাগ করিলে হরিনাথ দ্বিতীয়বার চন্দননগরে শ্রীযুত বীরেশ্বর পালিতের কন্যাকে বিবাহ করেন। বীরেশ্বর বাবু সে সময়ে কুচবিহারের এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ছিলেন, পরে সিভিল সার্জ্জন হন।

খুলনা মহকুমা যখন প্রথম জেলায় পরিণত হয় তখন হরিনাথ বি. এল্ পাশ করিয়া খুলনাতেই ওকালতী আরম্ভ করেন। এখানে তিনি দেড় বৎসর ছিলেন, অতঃপর তিনি জীবনে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা পাইয়া স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদারের আন্তরিক চেষ্টায় কুচবিহার রাজ এষ্টেটের নায়েব আহেলকারের পদে বহাল হন; ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ এবং রেজিষ্ট্রার এই তিন প্রকার কর্ম্মচারীর কার্য্য এবং ক্ষমতা নায়েব আহেলকারের ছিল। তিনি প্রথমে মাথাভাঙ্গা সবডিবিসনে নিযুক্ত হন কিন্তু কার্য্যদক্ষতা গুণে শীঘ্রই সবজজ পদে উন্নীত হইয়া সদরে বদলী হইয়া যান। তিনি এই কার্য্য হইতে যথাসময়ে পেন্সান

লইয়া পুনরায় খুলনায় ওকালতী করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার এবং শ্রীযুত কালিদাস ঘোষ, বি. এল, মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় খুলনার কায়স্থ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ব্যাঙ্কে তিনি প্রথম ডিরেক্টার মনোনীত হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক আজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সন ১৩২৮ সালের ২০শে ভাদ্র তারিখে হরিনাথ খুলনার বাড়ীতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হরিনাথ বসুমিত্র পাড়ায় ৺কৃষ্ণহরি মিত্রের স্ত্রী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন, বর্ত্তমানে কৃষ্ণহরির বংশধর কেহ নাই। সেই বাড়ীতে হরিনাথ তাঁহার গুরুদেবকে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

গ্রামের বালকবালিকাদের বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। চাকরীস্থল হইতে যখনই বাড়ী আসিতেন, বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিতেন। বালিকাদিগকে কি ভাবে শিক্ষা দিলে তাহারা আদর্শ গৃহিণী হইয়া সংসারকে শান্তির আগারে পরিণত করিতে পারে ইহা হরিনাথের অন্যতম গবেষণার বিষয় ছিল। তিনি বাড়ী আসিয়া প্রতিবারই বালিকাদিগকে পারিতোষিক দিতেন। বালিকাবিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহনির্ম্মাণ-কল্পে তিনি জমি ক্রয় করিয়া দেন, এজন্য তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কিছু চাঁদা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। মহেশ্বর-পাশায় বালকদিগের ইউ, পি, স্কুলের জমি ক্রয় করিতে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, বালকবালিকাদের শিক্ষাবিধানের জন্য গ্রামে তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকা উচিত।

গ্রামের অন্যান্য হিতকর কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় হিতসাধনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দুঃখের বিষয় তত্ত্বাবধানের অভাবে সে সভা উঠিয়া গিয়াছে।

দীনদরিদ্র আতুরের জন্য গ্রামে দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা বহুদিন হইতেই তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল। কিন্তু দুর্জ্জয় কাল তাঁহার এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে দেয় নাই। যাহা হৌক তাঁহার জ্যেষ্ঠ যদুনাথ তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। সন ১৩২৮ সালের মহাষ্টমীর দিনে এই ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

হরিনাথের দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ, বি. এ, পাশ করিয়া আইন পড়িতেছেন, কনিষ্ঠ বি. এস সি, পাশ করিয়া এম্. এস্ সি, পড়িতেছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে শিবপুর ডাঃ হরিসাধন সিংহ, এল. এম. এস, এর সহিত। এই কন্যা সম্প্রতি বিধবা হইয়াছেন। মধ্যমা কন্যার বিবাহ হইয়াছে হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত প্রভাস চন্দ্র ঘোষ, এম. এ, বি. এল, এর সহিত। কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ কলিকাতার উপকণ্ঠ শুঁড়া রাজবাড়ীতে হইয়াছে। জামাতা যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বি. এ, পড়িতেছেন।

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী, বি. এ।

(শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র, বি. এ লিখিত)

বসন্তকুমার সন ১২৭৪ সালের আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় বংশীবদন চক্রবর্ত্তী একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। মাতা ভুবনমোহিনী দেবী তৎকালোচিত নানাবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিতা ছিলেন। অতিথি সৎকার, আশ্রিতবাৎসল্য, পরিবারের মধ্যে সকলের প্রতি সমভাব তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার সদ্‌গুণাবলী পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সাধারণ্যে গৌরবময় করিয়া দিয়াছে।



শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

বসন্তকুমারের বাল্যশিক্ষা গ্রাম্যপাঠশালাতেই সমাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি দৌলতপুর স্কুলে প্রবেশ করেন। স্কুলে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইং ১৮৮৮ সালে তিনি প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই সময়ে স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী মজুমদার মহাশয় কুচবিহার রাজার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। এই বৎসরেই কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহা ফ্রী কলেজ হয়, ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না, কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বসন্তকুমারও কুঞ্জবিহারীর আশ্রয়ে এই নূতন কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। বলা বাহুল্য কলেজ এই বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংস্থষ্ট (affiliated) হয়। বসন্তকুমার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ হইতে ২য় বিভাগে এফ্., এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী স্থানীয় বৃত্তি (local scholarship) প্রাপ্ত হন। এখান হইতেই তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বি. কোর্সে বি. এ ,পাশ করেন। তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে দৌলতপুর স্কুলে অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষকতা করিতেছেন। প্রথমতঃ তিনি ২য় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, বর্ত্তমানে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। এই স্কুলে অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষকতায় এক সময় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অ... করিয়াছেন। শিক্ষকের বেতন অতি সামান্য, অতি কষ্টে তাঁহাদের পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। বসন্তকুমার শত প্রলোভন ত্যাগ করিয়া স্কুলের উন্নতিকল্পে এই দীর্ঘকাল সামান্য বেতনে কাজ করিতেছেন।

স্কুলের জন্য তিনি যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য বটে কিন্তু গ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন এবং এখনও যাহা করিতেছেন তাহার তুলনা হয় না।

পূর্ব্বে গ্রামে পঞ্চাইত ইউনিয়ন ছিল এবং ৺মহানন্দ মজুমদার তাহার

প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ জীবনে অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন হইতেই বসন্তকুমার এই কার্য্য করিতে থাকেন। ১৯০৯ সালে মহানন্দ বাবুর মৃত্যু হইলে বসন্তকুমার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হন। তখনকার ইউনিয়নে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে মাত্র পুলিস সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম হইত। রাস্তাঘাট লোকালবোর্ডের তত্ত্বাবধানে ছিল, কিন্তু মেরামত হইত না, মাত্র সদররাস্তায় সামান্য মাটী পড়িত। ইহার পরে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয় কিন্তু ইং ১৯২১ সালের জানুয়ারী হইতে স্বায়ত্বশাসনের অনুকরণে মহেশ্বরপাশা ইউনিয়নবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের প্রেসিডেণ্টরূপেও তিনি গ্রামের বহু মঙ্গলকর কার্য্য সাধন করিতেছেন। দশ বৎসরের মধ্যে গ্রামের রাস্তাগুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গ্রামের অনেক মোকদ্দমা তিনিই নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছেন, ইহাতে গ্রামের বহু অর্থ আদালতের কবল হইতে বাঁচিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে তিনিই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সালিশ। সালিশী করিয়াও তিনি গ্রামের বহু দরিদ্র লোকের উপকার সাধন করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং স্কুলেও অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক। মহেশ্বরপাশা পরগণার মধ্যে কৃষক-ভদ্র নির্ব্বিশেষে কাহারও জমি মাপিতে অথবা পুষ্করিণী কাটী করিতে হইলে তাঁহারই ডাক পড়ে এবং তিনি বিনা আপত্তিতে এই সমস্ত কার্য্য করিয়া দিয়া থাকেন।

দশের এবং দেশের কাজ করিতে গেলে, অনেকের বিরাগ ভাজনও হইতে হয়, ষোল আনা লোকের তুষ্টিসাধন করা যায় না, বসন্তকুমারও তাহা পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি স্থির এবং ধীর চিত্তে দেশের এবং দশের কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার লক্ষ্যস্থল মাত্র এক, অন্য কোন দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। নিজের প্রতি অথবা সংসারের প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া এরূপ ভাবে দেশের কাজ করিতে একমাত্র বসন্তকুমারেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সেবাশ্রম, এণ্টিম্যালেরিয়া সোসাইটী প্রভৃতি গ্রামের যাবতীয় সদনুষ্ঠানের তিনি প্রকৃত মঙ্গলকামী এবং তাহাদের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন, বর্ত্তমানে বালিকা বিদ্যালয় তাঁহারই তত্ত্বাবধানে চলিতেছে।

তাঁহার সংসার এ গ্রামের আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার সামান্য আয়ের উপর যে ভাবে জ্ঞাতিগোষ্ঠী লইয়া একত্র বাস করিতেছেন তাহা বর্ত্তমান কালে মহেশ্বরপাশা গ্রামে দুর্লভ।

শ্রীযুত সতীন্দ্র নাথ সরকার, বি. এ; বি. টি।

(শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র, বি. এ, লিখিত।)

পিতৃ-পরিচয়। শ্রীযুত সতীন্দ্র নাথ সরকার মহেশ্বরপাশা গ্রামের একজন বিশেষ কৃতী সন্তান। তিনি ইং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহার জন্মপল্লী মহেশ্বরপাশার বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। সতীন্দ্র নাথের পিতার নাম গঙ্গাধর এবং মাতার নাম শিবসুন্দরী। সতীন্দ্র নাথের পরম সৌভাগ্য যে তিনি আদর্শ জনক-জননী লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের নিষ্কলুষ জীবনের আদর্শই যে সতীন্দ্র নাথের ভবিষ্যৎ জীবন প্রভূত পরিমাণে গঠিত করিয়াছে—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সতীন্দ্রনাথের জন্ম সময়ে তাঁহার পিতা গঙ্গাধরের অত্যন্ত সাত্বিক অবস্থা ছিল; শ্রীশ্রীভগবানের নাম তাঁহার দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন ছিল। জননী শিবসুন্দরীও ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বামীর যথার্থই ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। দেবদ্বিজে ভক্তি, অতিথিসৎকার, দুঃখীর দুঃখবিমোচন, অন্ধ-আতুরের সেবা তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। এইরূপ পুণ্যাত্মা জনক-জননীর সন্তান সতীন্দ্রনাথ যে বাল্যকাল হইতেই

ধর্ম্মানুরক্ত ও সন্ধ্যাবন্দনাপ্রিয় হইবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

শিক্ষালাভ। দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সতীন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় গমন করেন। এখন যেরূপ উচ্চশিক্ষা লাভের সুবিধা হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না, উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলেই কলিকাতায় যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কলিকাতায় যাইয়া সতীন্দ্রনাথ মেট্রপলিটান কলেজে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) পড়িতে আরম্ভ করেন, উক্ত কলেজ হইতে এফ্. এ, ও জেনারল এসেম্ব্রি (বর্ত্তমান স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলেজ) হইতে ১৯০১ সালে বি. এ, পরীক্ষায় পাশ করেন। বি. এ, পাশ করিয়া তিনি বি. এল্, পড়িতে আরম্ভ করেন। একবার অকৃতকার্য্য হইয়া উহা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অতুলনীয় সত্যনিষ্ঠাই এই অকৃতকার্য্যতা সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। ওকালতী করিতে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি উহা পুনরায় পড়েন নাই।

কর্ম্মজীবন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া সতীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিভাগে কার্য্যগ্রহণ করেন। সতীন্দ্রনাথ যে সময়ের গ্রাজুয়েট সে সময়ে চাকুরীর এরূপ দুরবস্থা ছিল না; তিনি ইচ্ছা করিলেই আর্থিক লাভজনক বহু ভাল চাকরী গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় এই "অনাহারী" শিক্ষাবিভাগে কার্য্যগ্রহণ করিয়া তিনি কি কম আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করিয়াছেন! তিনি স্কুলসমূহের সব-ইন্‌স্‌পেক্টার হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। মফস্বলে যাইলে তাঁহার অসাধারণ পদোন্নতি হইত। কিন্তু তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতে স্বীকৃত নহেন, জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও কিছুমাত্র নাই।

বর্ত্তমানে তিনি ডায়মণ্ডহারবারের সাবডিভিসনাল ইন্‌সপেক্টার এবং তাঁহার মাসিক বেতন দুই শতাধিক মুদ্রা।

সতীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যজীবন সুখের হয় নাই। তিনি বনগ্রামের অন্তর্গত সুন্দরপুরের জমিদার মিত্রবংশের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। প্রভাবতী শিশুকাল হইতেই রুগ্না ছিলেন এবং বহুদিন রোগ ভোগের পর দেহত্যাগ করেন। সতীন্দ্রনাথ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই, সুতরাং এক কথায় বলা যাইতে পারে তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন।

ধর্ম্মজীবন। যখন তিনি বি. এ, ক্লাসের ছাত্র, তখন তাঁহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। খুলনার বর্ত্তমান প্রতিথযশা উকিল শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সময় তাঁহাকে শ্রীশ্রী৺ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট লইয়া যান। গিরিমহারাজ সতীন্দ্রনাথকে দেখিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করেন। ইং ১৯০৯ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে শ্রীশ্রী ৺গিরিমহারাজের নিকট সতীন্দ্রনাথের দীক্ষা লাভ হয়। সতীন্দ্র-নাথ তদবধি তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য ও আয়ের দশমাংশ নিয়মিত ভাবে দান করিয়া আসিতেছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক দান আছে। ইং ১৯২০ সালে শ্রীশ্রী৺গিরিমহারাজ সতীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণীকে দীক্ষা দিতে মহেশ্বরপাশা বাটীতে শুভপদার্পণ করেন। গ্রামের গৌরব স্বর্গীয় গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় যখন মহারাজের সম্মানার্থে স্তব পাঠ করিলেন, স্বামিজী গোপীমোহনকে স্নেহাপ্যায়ন সহকারে সতীন্দ্রনাথের কথা উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন—"এ গ্রামে এরূপ ছেলে আর হবে না।"

চরিত্র। সতীন্দ্রনাথের শুভ্রচরিত্র, নিষ্কলুষ জীবন, হিমাদ্রির ন্যায় অনন্তবিস্তৃত প্রেমিক হৃদয় বিংশ শতাব্দীতে দুর্ল্লভ বলিলে বোধ হয় কিঞ্চিন্মাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না। জীবনের বন্ধুর পথে ত্যাগ

তাঁহার অসাধারণ, বিনয় তাঁহার অলৌকিক, ক্ষমা ও তিতিক্ষা তাঁহার অপূর্ব্ব। সত্যই তাঁহার জীবনের জয়যাত্রার সাথী, যাহা অসত্য, যাহা মিথ্যা, তাহা হইতে তিনি নিজেকে চিরদিনই দূরে রাখিয়াছেন,—জীবন সংগ্রামের বহু বাধাবিপত্তির মধ্যেও তিনি তাঁহার সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। চরিত্রের এমনই আকর্ষণীশক্তি যে কেহ তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন। ভগবানের শুভ-আশীর্ব্বাদ সতীন্দ্রনাথের জীবন-সংগ্রামে রক্ষা করুক! সতীন্দ্রনাথ শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের, দশের এবং জন্মপল্লীর মুখোজ্জ্বল করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৺কেদারেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

(শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার, বি, এ, লিখিত।)

স্বর্গীয় কেদারেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহেশ্বরপাশার অন্যতম গৌরব। তাঁহার পূত চরিত্র, তাঁহার ব্রাহ্মণ্যদীপ্তি, তেজস্বিতা ও সরলতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবে প্রেম তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

তিনি মহেশ্বরপাশা নিবাসী ৺জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গৌরব নহে, তাঁহার গৌরব যে তিনি চরিত্রগুণে এবং আত্মচেষ্টায় অতি সামান্য অবস্থা হইতে অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করেন এবং মানবোচিত যাবতীয় সদ্গুণই অর্জ্জন করেন।

৺জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। পুত্রের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয় করা তাঁহার সাধ্যাতীতই ছিল। কিন্তু কেদারেশ্বর নিজের প্রতিভাবলে সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিদ্যা অর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হয়েন। তাঁহার পাঠ্যপুস্তকাদিও সব পাইতেন না। অন্যে পড়িয়া যখন নিদ্রিত হইয়া পড়িত, তখন তিনি তাহাদের পুস্তকাদি লইয়া পাঠ করিতেন। বাড়ীতে তৈলাভাব, তিনি অন্যের বাড়ীতে যাইয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, কোন প্রকার অসুবিধাই তাঁহার উৎসাহ হ্রাস করিতে পারিত না।

মেধাবী কেদারেশ্বর গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠকালেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বাল্যের সহপাঠীদের মুখে একটী কাহিনী শুনিতে পাই। একবার তাঁহাকে লইয়া তাঁহার শিক্ষক এবং গ্রামস্থ কয়েক ব্যক্তি যশোহর জেলায় কোনও গ্রামে বরযাত্রীরূপে গমন করেন। তখন বরযাত্রীদের বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা লওয়া একটী সুপ্রচলিত সামাজিক প্রথা ছিল। যথাসময়ে কেদারেশ্বরের সমবয়স্ক কন্যাপক্ষীয়েরা আসিয়া তাঁহাকে পড়াশুনা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি সকল প্রশ্নেরই এরূপ সদুত্তর দেন যে তাহাতে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন বয়োবৃদ্ধ নানা ব্যক্তি আসিয়াও তাঁহাকে প্রশ্নাদি করিতে থাকেন, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বশতঃ তিনি সকল প্রশ্নেরই উত্তমরূপ উত্তর দান করেন। ইহাতে সভামধ্যে তাঁহার জয় জয়কার ঘোষিত হইতে থাকে এবং তাঁহার শিক্ষক মহাশয়েরও অজস্র প্রশংসাবাদ লাভ হয়। বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল শিক্ষক মহাশয় তখন সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হয়েন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কেদারেশ্বর ১০৲ টাকা বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ্, এ, পড়িতে গমন করেন। তখন তাঁহাকে নিজের

খরচ চালাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। পুস্তকের অভাব, আলোর অভাব, পোষাক পরিচ্ছদের অভাব—কিন্তু তাঁহার অদম্য উৎসাহের সম্মুখে সে অভাব মাথা তুলিতে পারিত না, দ্বিগুণিত উৎসাহে তিনি অধ্যয়ন তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। এই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার এক অভিনব উপায়ে পরিচয় হইয়া যায়। যশোহর খাজুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় ছাত্রাবস্থায় কলিকাতায় ভীষণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। আত্মীয় স্বজন কেহই নিকটে নাই—বিদেশে সে কি ভয়ানক অবস্থা তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু কেদারেশ্বর তাঁহার নিকটেই ছিলেন এবং তাঁহার প্রাণ পরার্থপরতার লীলাভূমি ছিল। তাই সকল কাজ ফেলিয়া, সকল কথা ভুলিয়া কেদারেশ্বর তাঁহার শুশ্রূষায় রত হইলেন এবং তাঁহার বিষ্ঠা ও বমনোদ্গীর্ণ মলাদি স্বহস্তে অম্লানচিত্তে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। নলিনীনাথকে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়াছিলেন। আসিবামাত্রই এই ব্রাহ্মণকুমারের মূর্ত্তিটি তাঁহার চক্ষে লাগিল। তাঁহার অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতায় জনবৎসল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্ত চমৎকৃত হইল। মনীষি মানসচক্ষে দেখিলেন—কত বড় শক্তি হৃদয়ে থাকিলে ঐ সেবাপরায়ণতা সম্ভব হয়। জহুরী মাণিক চিনিলেন। অমনি তিনি স্বেচ্ছায় কেদারেশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সকল খোঁজ লইলেন এবং তাঁহার অধ্যয়ন বিষয়ক যাবতীয় ভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি তিনি নিজের পুত্রাধিক স্নেহে কেদারেশ্বরকে ভালবাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে ও শুভকামনায় কেদারেশ্বরও ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক এইরূপ সেবা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি সেবাধর্ম্মের মূর্ত্তিমান স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আর একবার আইজগাতি নিবাসী অধুনা অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সিংহ, এম্, এ, মহাশয় তাঁহার এম্, এ, পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেই দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েন। বসন্ত যে কি সাংঘাতিক স্পর্শাক্রামক বীভৎস রোগ তাহা সকলেই জানেন। সাধারণ লোক উহাকে অত্যন্ত ভয় করে। যোগীন্দ্র বাবুর পীড়া প্রকাশের সাথে সাথেই যাবতীয় ছাত্র মেস্ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু পলায়ন করিতে পারিলেন না পরদুঃখকাতর, মহাপ্রাণ কেদারেশ্বর। তিনি যোগীন্দ্র বাবুর বাটী হইতে তাঁহার জননী ও ভগ্নীকে কলিকাতায় লওয়াইলেন এবং নিজে সকল কাজ ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার সেবার ভিতর এতখানি সহৃদয়তা মাখান ছিল যে যোগীন্দ্র বাবু মায়ের স্নেহস্পর্শ অপেক্ষাও কেদারেশ্বরের অকুণ্ঠ শুশ্রূষার পক্ষপাতী ছিলেন। বসন্তরোগের উত্তম চিকিৎসক আনয়ন করিয়া এবং স্বয়ং একান্ত ভাবে মাসাধিককাল শুশ্রূষা করিয়া কেদারেশ্বর সে যাত্রায় যোগীন্দ্র বাবুকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। এদিকে তাঁহাকে কলেজে অনুপস্থিত থাকিতে দেখিয়া স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। সেখানে কেদারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না—তাঁহার স্নেহ আরও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল।

বাস্তবিক তাঁহার অনন্য সাধারণ সেবা-পরায়ণতা ও তাঁহার নিসর্গসিদ্ধ পরার্থপরতা একান্তই দুর্লভ। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে যে কেহ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গমন করিতেন তাঁহার আশ্রয়স্থান ছিলেন কেদারেশ্বর। অনেক সময় নিজে মুড়ি খাইয়া থাকিয়া তিনি তাঁহার অতিথি অভ্যাগত গ্রামবাসীকে খাওয়াইয়াছেন, তাঁহার ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রশংসায় সতত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন।

যথাসময়ে বি, এ, এবং আইনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

কেদারেশ্বর ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরীর পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে এ সংকল্প ত্যাগ করিয়া আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বলেন। কেদারেশ্বর খরচপত্রের আপত্তি জানাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "সেজন্য তোমার চিন্তা নাই, ছাপরার সরকারী উকীল বাবু নরসিংহ মিত্র আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁহার নিকট এক পরিচয়পত্র দিয়া দিব, তাহাতে তোমার কাজের অনেক সুবিধা হইবে। তদ্ব্যতীত তোমাকে আমি ৩,০০০৲ তিন হাজার টাকা খরচের জন্য দিব। তুমি এই টাকা খরচ করিতে করিতে নিজের পশার করিয়া লইতে পারিবে, ঐ টাকার সুদ লাগিবে না, তুমি যখন পার পরিশোধ করিলেই চলিবে।"

পরিচয়পত্র লইয়া কেদারেশ্বর যথাসময়ে ছাপরায় যাইয়া বসিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই আপনার বুদ্ধিমত্তাগুণে ও নরসিংহবাবুর সহায়তায় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিলেন, তাঁহার সৎস্বভাবের জন্য নরসিংহবাবু তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। ছাপরায় যাইবার কিছুকাল পরেই একটী বড় মোকদ্দমা তাঁহার হাতে পড়ে, তাহার অপর পক্ষে ছিলেন কোন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। কিন্তু কেদারেশ্বরের সহিত যুক্তিতর্কে ব্যারি-ষ্টার পরাস্ত হইলেন, ইহাতে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তিনি বহু অর্থ অর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কেদারেশ্বর মিথ্যা মোকদ্দমা লইতেন না। আইনে তাঁহার এইরূপই অধিকার ছিল যে তিনি কাগজপত্র দেখিবামাত্র মোকদ্দমার ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইবে বুঝিতে পারিতেন, সুতরাং তিনি যে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন, তাহাতেই জয় হইত।

তিনি যে শুধু ধন অর্জ্জন করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাহার সদ্ব্যয়ও হইতে লাগিল, দান বিষয়ে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার ছাপরার বাসায় প্রতি রবিবারে এক দানের মেলা বসিয়া যাইত। তিন

শ্রেণীর দুস্থ ব্যক্তিকে তিনি সাহায্য করিতেন, এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাঁহার চিঠি লইয়া দোকান হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ছাতু লইয়া যাইত, পরে মাসের শেষে দোকানদার তাঁহার নামে হিসাব বাহির করিয়া টাকা লইয়া যাইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিক্ষুকদের তিনি একটী করিয়া পয়সা দিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর ভিক্ষুকেরা দুই মুঠা করিয়া ছোলা পাইত। এই দানব্যাপার প্রাতঃ ও অপরাহ্নে পূর্ণভাবে চলিত,ইহাতে মাসিক তাঁহার ৬০৲।৭০৲ টাকা ব্যয় হইত। প্রতি রবিবারে তাঁহার গৃহের সম্মুখে ভিক্ষুকগণের বড় জনতা হইত। এক দিন ছাপরার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাঁহার গৃহসম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐরূপ জনতা দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে কেদার বাবু নামে একজন উকীল প্রতি রবিবারে দরিদ্রদিগকে দান করেন, তাহার জন্য এত জনতা। তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক ইস্তাহার জারি করিলেন, রবিবারে সেই পথে গাড়ীঘোড়ার চলাচল বন্ধ থাকিবে। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক দান ছিল। দায়গ্রস্ত হইয়া কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন করিলে কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিত না, সকলকেই তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

তাঁহার আলাপ অতি মধুর ছিল। তাঁহার বাসার চাকর, পাচক ব্রাহ্মণ ও সকলকেই তিনি অতি মধুর ভাষায় সম্বোধন করিতেন এবং সকলেই তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত। চাকরকে ডাকিতেন 'মিষ্টার বৈজি' এবং পাচককে ডাকিতেন 'বাবাজী' বলিয়া। যেরূপ কথায় কিম্বা ব্যবহারে কাহারও মনে ক্লেশ হইতে পারে, সেরূপ বাক্য প্রয়োগ কিম্বা ব্যবহার তিনি কখনই করিতেন না, এমন কি বাল্যেও কোনদিন কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিয়াছেন, ইহা শুনা যায় নাই, তাঁহার অন্তঃকরণ সকলেরই প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসায় ভরিয়া থাকিত।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বড়গাতি নিবাসী ৺কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। একে কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র, তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধিতে অসাধারণ, এইরূপ পুত্রের বিবাহে জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভূত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অঙ্গীকার দান করায় তিনি কার্য্যতঃ যৌতুকাদি কিছু গ্রহণ না করিয়াই পুত্রের বিবাহ দেন।

ছাপরায় কেদারেশ্বরের নাম ও প্রতিপত্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সহরবাসী সকলেই তাঁহাকে একডাকে চিনিত। তিনি যখন বাড়ী আসিতেন, তখনও দেশবিদেশ হইতে বহুব্যক্তি তাঁহার নিকট নানাবিধ সাহায্যের জন্য আসিত। কিন্তু তিনি শাপভ্রষ্ট পুরুষ ছিলেন, তাই অধিক দিন এ পাপপূর্ণ পৃথিবীতে তাঁহার থাকিতে হইল না। মাত্র দশ বৎসর ব্যবসায় করিবার পর ইং ১৮৯৮ সালে জ্বরবিকার রোগে দুইটী পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুরেশ্বর, আই, এ, পাঠকালে কলেরারোগে প্রাণত্যাগ করেন, মাত্র কনিষ্ঠ পুত্র এখন জীবিত আছেন।

তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমাদের গ্রামের যে কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা আর কি বলিব। ৺কালীবর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় তিনিও একজন "Inheritor of unfulfilled renown" ; তাঁহার ন্যায় মহাপ্রাণ কৃতবিদ্য ব্যক্তির দ্বারা গ্রামের বহুবিধ উন্নতিই সাধিত হইতে পারিত, গ্রামের দারুণ দুর্ভাগ্য যে এই সকল প্রসূন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হইল।

কেদারেশ্বরের ন্যায় সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন পুরুষ নিতান্তই দুর্লভ। তিনি নিজে একজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি সন্ধ্যা-বন্দনা, দয়াদাক্ষিণ্য ও শুচিতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বেশভূষার প্রতি



মির্জ্জা ইব্রাহিম হোসেন বি, এ।

(খুলনা হইতে বিদায় কালের গৃহীত ফটো হইতে)

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য)।

তাঁহার কোন দৃষ্টি ছিল না। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে অত বড় আইন ব্যবসায়ী বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না, তাঁহার মাতাপিতার প্রতি ভক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহাদের আদেশ তিনি কখনও জ্ঞানতঃ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। তাঁহার সেবাপরায়ণতা ও দানশীলতার উল্লেখ আমরা ইতঃপূর্ব্বেই করিয়াছি। তাঁহার অধ্যবসায়, বিদ্যানুরাগ এবং চরিত্রবলের কথাও কেহ সহসা ভুলিতে পারিবেন না। বহু লোককে তিনি পড়াশুনার বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও অশ্রুসজলনেত্রে কৃতজ্ঞতাপূর্ণস্বরে তাঁহার স্মৃতির পূজা করিয়া থাকেন।

আমরা তাঁহার মুক্ত আত্মার নিকট প্রার্থনা করি—তাঁহার হৃদয়ের সদ্‌গুণরাজির প্রতি গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া জীবনে শ্রেয়োলাভে প্রেরিত হউক॥ ওঁ শান্তিঃ॥

মির্জ্জা ইব্রাহিম হোসেন, বি. এ। *

এই জীবনীতে আমরা একজন উদীয়মান মুসলমান যুবকের পরিচয় দিব। কর্ম্মক্ষেত্রে যুবকের এই প্রথম প্রবেশ। তাঁহার জীবন উদয়কালে সূর্য্যের (rising sun) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রতি প্রহরে উজ্জ্বল ভাস্করের পরিবর্ত্তনশীল গতির ন্যায় কর্ম্মজীবনে

* মির্জ্জা ইব্রাহিম হোসেন সম্প্রতি দৌলতপুরে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দৌলতপুরের ইতিহাস মহেশ্বরপাশার সহিত সংযুক্ত হওয়ায়, ইঁহার জীবনীও এই স্থানে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থকার।

যুবকের সম্মুখে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতের নবীন আলোকের তালে তালে নৃত্য করিতেছে।

যুবক ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে দৌলতপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দিল্লীর সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ যশোহরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং অচিরেই যথেষ্ট ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া পড়েন। পিতামহ মির্জ্জা ছানা উল্লা সংসারে অনাসক্ত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে ভ্রাতৃগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি স্বীয় অংশ এমন কি গৃহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী এবং ৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র মির্জ্জা মোহাম্মদ তোরফানকে লইয়া চিরদিনের মত আসিয়া খুলনার অন্তর্গত দেয়ানা গ্রামে নূতন বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানে আসিবার পরে তাঁহার এরফান ও কেনায়েতুল্লা নামক আর দুই পুত্রের জন্ম হয়। মির্জ্জা ইব্রাহিম হোসেন কেনায়েতুল্লার চতুর্থ পুত্র। তাঁহার অন্য পুত্রগণ বাল্যকালে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

শৈশবে মির্জ্জা ইব্রাহিম দেয়ানা মক্তবে মুন্সী জালালউদ্দিন সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া মুন্সী সাহেব এবং পরবর্ত্তী শিক্ষক মৌলবী কাজী আস্‌মোতুল্লা সাহেব অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মির্জ্জা ইব্রাহিম মক্তবে বাঙ্গালা সাহিত্য, অঙ্ক, আরবী এবং উর্দ্দু পড়িতেন। সন ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে পূর্ব্ববঙ্গে এবং খুলনা জেলায় ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত (cyclone) হয়। তাহার এক মাস পূর্ব্বে রমজান উপলক্ষে নবম বর্ষীয় বালক মৌলবী কাজী আসমোতুল্লা সাহেবের সহিত নদীয়া জেলায় গমন করেন। এইখানে অবস্থানকালে মাত্র ২০ দিনের মধ্যে তিনি প্রথম কোরাণ শরিফ্ পাঠ সমাপ্ত করেন।

এই স্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে তিনি দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৭ম "বি" শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন এবং এই স্কুল হইতেই বৃত্তিসহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অসাধারণ ধীশক্তিবলে তিনি প্রত্যেক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার মধুর স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া সতীর্থগণ তাঁহাকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং শিক্ষকগণ পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। ছাত্রজীবনে মির্জ্জা হোসেন ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় তাঁহার ইংরাজী ও পার্শী আবৃত্তি (recitation) শুনিয়া সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তদানীন্তন খুলনা প্রদর্শনীর "স্পোর্টে'ও" তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিন পায়ে দৌড়, ডিম হস্তে লইয়া দৌড়, অঙ্ক কষিতে কষিতে দৌড় প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে তিনি কয়েকবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিবার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে পার্শী সহ আই,এ, পড়িবার জন্য তিনি কলিকাতায় গমন করেন কিন্তু কয়েক জন বন্ধুর উপদেশে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, এবং দৌলতপুর পড়িবার জন্য বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তৎকালে দৌলতপুর কলেজে পার্শী পড়ার কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না, এজন্য তিনি পুনরায় বরিশাল বি, এম্, কলেজে গমন করেন। কিন্তু এখানেও তিনি পাঠের কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি পুনরায় দেশে আসিয়া দৌলতপুর কলেজে ভর্ত্তি হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি গাইকুড় গ্রাম নিবাসী মৌলবী এফাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের প্রথমা কন্যা বেগম নুরন্নেছা খাতুনকে বিবাহ করেন।

সকাল ৬টা হইতে ৯॥টা পর্য্যন্ত কলেজ বসিত. দ্বিতীয় বার্ষিক

CamScanner

শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে মির্জ্জা হোসেন কলেজের ছুটীর পর বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত দৌলতপুর জুনিয়ার মাদ্রাসায় বিনা বেতনে শিক্ষকতা করিতেন। ইং ১৯২০ সালে আই, এ, পাশ করিবার পরে তিনি ঐ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতে থাকেন। ইং ১৯২২ সালে বি, এ, পাশ করিয়া তিনি দৌলতপুর হাইস্কুলের প্রথম সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। স্কুলের কাজ করিবার সময়েই তিনি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আফিসে চাকরী পাইয়া কিছু দিন ঐ কার্য্য করেন, কিন্তু কেরাণীগিরি তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তিনি ঐ কার্য্য ইস্তফা দিয়া পুনরায় স্কুলে প্রবেশ করেন। পরবৎসর তিনি ইউনিভারসিটি ল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আইন পড়িতে থাকেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ'র জন্যও প্রস্তুত হন। মির্জ্জা হোসেন ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বি, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাবডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। দেশের আইন পড়িতে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ থাকিলেও কার্য্যগতিকে আর হইয়া উঠিল না, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এম্, এ, পড়াও ত্যাগ করিতে হইল। তিনি ১৯২৫ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে খুলনায় সাবডিপুটীর পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি খুলনা হইতে বদলী হইয়া নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার সার্কল আফিসার নিযুক্ত হন এবং বর্ত্তমানে তিনি সেইখানেই আছেন।

মির্জ্জা ইব্রাহিম হোসেন দেশ ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। যখন তিনি বালক তখন হইতেই দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, স্কুলে প্রত্যেক দীর্ঘ অবকাশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন এবং এখনও অবসর পাইলে পিঞ্জর মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া যান, বালককাল হইতে তাঁহার ভ্রমণ লিপ্সা এমনই প্রবল।

অশিক্ষিত সমাজে শিক্ষা বিস্তার করা মির্জ্জা হোসেনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইং ১৯২৬ সালে যখন মতানৈক্যে ফুলতলা মাদ্রাসার

অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি উহার সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়া তাহার নূতন জীবন দান করেন, তদবধি মাদ্রাসা সুচারুরূপে চলিতেছে। এখনও তিনি তাহার সেক্রেটারী আছেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও অর্থসাহায্যে দৌলতপুর মাদ্রাসাও সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে এবং তিনিই তাহার বর্ত্তমান সেক্রেটারী। তিনি দৌলতপুর হাইস্কুলের অন্যতম মেম্বর এবং হিসাব পরীক্ষক প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে দৌলতপুর বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তাহার প্রথম সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। দৌলতপুর রেজিয়া খাতুন বালিকা মক্তবের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন, তিনিই উহার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট।

মির্জ্জা হোসেন বর্ত্তমানে যেখানে সার্কল অফিসার হইয়া আছেন সেখানেও তিনি মেমনগর হাইস্কুলে এবং কলাবাড়ী রামনগর জুনিয়ার মাদ্রাসার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। তাঁহারই চেষ্টা ও উৎসাহে সেইস্থানে উথলি নামক গ্রামে একটী বালিকা মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ঐ মক্তবের প্রেসিডেণ্ট। বালিকাগণের পুস্তকাদির ব্যয় ভার তিনিই বহন করিতেছেন।

কোন বড় চাকরী পাইলে অথবা হঠাৎ অর্থশালী হইলে অনেকেই গর্ব্বস্ফীত হন, নিজের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মীর্জ্জা হোসেনের চরিত্র অন্যরূপ; তিনি অত্যন্ত সরল এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক, উচ্চপদস্থ হইয়াও অতি দীনাতি-দীনকেও বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। দরিদ্রকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করা তাঁহার জীবনের আর একটী ব্রত, দরিদ্রব্যক্তি নিজের অভাব জানাইয়া কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিফলমনোরথ হয় নাই। অনেক স্কুলকলেজের ছাত্রকেও তিনি রীতিমত ভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

CamScanner

বর্ত্তমানে মীর্জ্জা হোসেনের বয়স মাত্র ২৮ বৎসর; তাঁহার এক কন্যা—জাহানারা হামিদা বানু।

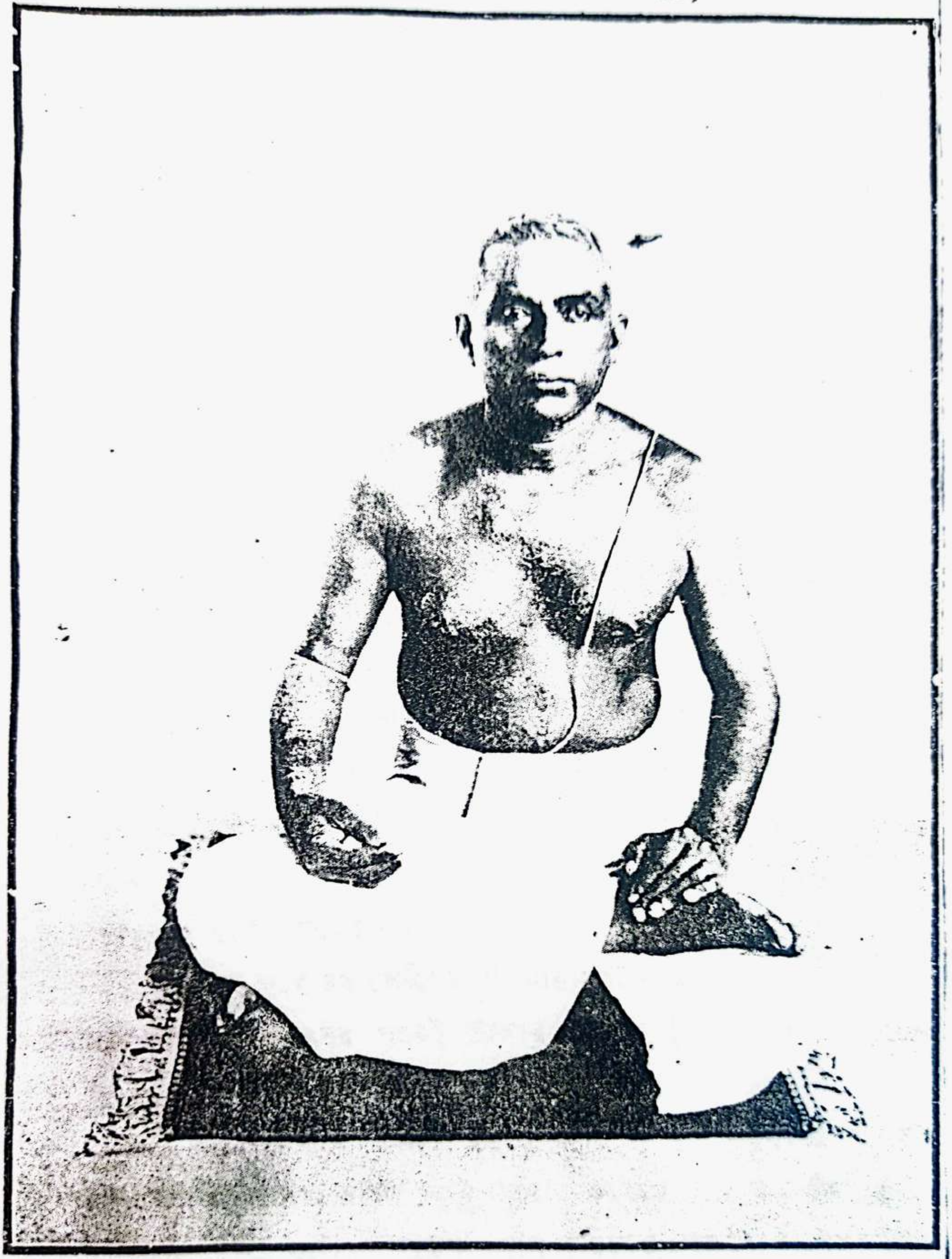
ভগবানের নিকট আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা, এই উদীয়মান মুসলমান যুবকের ভবিষ্যৎ জীবন সাফল্য মণ্ডিত হউক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ; বি. টি।

ক্ষেত্রগোপাল মহেশ্বরপাশা নিবাসী ৺নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই চক্রবর্ত্তী বংশ গুহমজুমদার বংশের পুরোহিত। নিত্যানন্দ অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গ্রামের মধ্যে যাজকতা করিতেন, তাঁহা... কিছু নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি ছিল, যাজকতা এবং এই সামান্য সম্পত্তির আয়ে সেকালের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সংসার কোনরূপে চলিয়া যাইত, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রগোপাল সন ১২৮৯ সালের ২৪শে আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রাম্য পাঠশালায় ক্ষেত্রগোপালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি উক্ত পাঠশালা হইতে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দৌলতপুর স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই গ্রামের শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, কালিদাস ঘোষ, চারুচন্দ্র মজুমদার, বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। বলা বাহুল্য এই সময়ের সতীর্থগণের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য প্রীতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হইত।

ক্ষেত্রগোপালকে বরাবরই অপরের সাহায্য গ্রহণে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছে। পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল না হইলেও



শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র গোপাল চক্রবর্ত্তী বি, এ, বি, টি।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বর পাশা পরিচয়ের" জন্য)

CamScanner

পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিলনা। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা ৺শরৎ কুমার লাহিড়ী (S. K. Lahiri) প্রকৃতই ছাত্র বন্ধু ছিলেন, তিনি বহু ছাত্রকে অর্থ ও পুস্তকাদি দিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন; ক্ষেত্রগোপাল এই শরৎকুমারের অভাবনীয় কৃপালাভে সমর্থ হন, তাহার সে কাহিনী এস্থলে উল্লেখ যোগ্য।

স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় তদানীন্তন সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত সারদাকান্ত দাশ মহাশয়ের অনুমোদনে ক্ষেত্রগোপাল শরৎকুমারের নিকট হইতে একখানি এণ্ট্রান্স্ কোর্সের অর্থ পুস্তক প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রগোপাল এ উপকার বিস্মৃত হন নাই, কলিকাতায় এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিতে যাইয়া, পরীক্ষান্তে তিনি শরৎ কুমারের সহিত দেখা করিয়া—গদ্‌গদস্বরে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, ইহাতে শরৎকুমার এতই মুগ্ধ হন যে ক্ষেত্রগোপালকে মনোযোগ দিয়া পড়িতে বলেন, এবং তিনি যতদূর পড়িবেন তাঁহার সমস্ত পুস্তক বিনামূল্যে দিতে প্রতিশ্রুত হন, কার্য্যতঃ তিনি ক্ষেত্রগোপালকে এফ্. এ; বি, এ; ও বি, এল এর সমস্ত পুস্তক প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রগোপাল দৌলতপুর স্কুলেও অবৈতনিক ছাত্র ছিলেন।

দৌলতপুর স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং ইহার একবৎসর পরেই তাঁহার স্নেহময় পিতা পরলোক গমন করেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে কুচবিহার লইয়া যান এবং কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। মিঃ এস্, কে, লাহিড়ী পুস্তক দান করিলেও ক্ষেত্রগোপালের অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার কেদারনাথই বহন করেন। কুচবিহার কলেজ হইতে

যথাসময়ে এফে পাশ করিয়া বি, এ, পড়িতে থাকেন কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি কুচবিহার হইতে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। এখানে আসিয়া তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং ইং ১৯০৭ সালে বি, এ, পাশ করেন। কলিকাতায় তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মজুমদার, এম্, এ, মহাশয় বহন করেন। এতদ্ব্যতীত রায় সাহেব শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার তাঁহার সাংসারিক ব্যয়ভারের যথেষ্ট আনুকুল্য করেন। বস্তুতঃ এই পরিবারের উদারতা এবং মুক্তহস্ততাই ক্ষেত্রগোপালের উন্নতির একমাত্র কারণ।

বি, এ, পাশ করিয়া ক্ষেত্রগোপাল সিটি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনে ২য় কেরাণীর কার্য্য স্বীকার করেন, কিছুদিন পরে এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলে ৪০৲ টাকা বেতনে সরকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন কিন্তু শিক্ষকের কার্য্য তাহাকে বেশীদিন করিতে হয় নাই, তিনি পুনরায় ইন্‌স্‌পেক্টার আফিসে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রাম নলিন সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন, এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ক্ষেত্রগোপালের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, তিনি আইন পড়া ছাড়িয়া চাকরীই উপজীবিকারূপে গ্রহণ করেন। ইং ১৯১০ সনে তিনি সাওতাল পরগণায় পাকুড় জেলার স্কুল সাব ইন্‌স্‌পেক্টার হইয়া গমন করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি গুরুতর ভ্রাতৃশোক পাইয়াছেন কিন্তু নিষ্ঠুর কৃতান্ত ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। এই সময়ে তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিদাসকে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়, ক্ষেত্রগোপাল অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন কিন্তু উপায় নাই। হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা লইয়া তাঁহাকে কর্ম্মজীবনে মনঃসংযোগ করিতে হইল। অতঃপর তিনি ইং ১৯১৯ সালে



মহেশ্বরপাশা এইচ্, ই, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা—

শ্রীযুত রামলাল নন্দী। [পৃষ্ঠা ১২৭

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

কলিকাতায় স্কুল সাব ইনস্‌পেক্টার ভাবে আসিয়া ১৯১৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করেন, পরে খুলনায় বদলী হন এবং ১৯২৯ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত খুলনা সদরে কার্য্য করেন। এপ্রিল মাসে তিনি বর্দ্ধমানের কাটোয়া মহকুমায় সাবডিভিসনাল ইন্‌স্‌পেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তিনি ১৯১৪ সালে বি, টি, পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ক্ষেত্রগোপালের চরিত্রের প্রধান গুণ তাঁহার সরলতা এবং অমায়িকতা। দ্বেষ, হিংসা, দাম্ভিকতা তাহার মনে স্থান পায় না। পরিচ্ছদ তাঁহার সাধারণ অপেক্ষা সাধারণ, ব্যবহার তাঁহার শিশু অপেক্ষা সরল। তাঁহার চরিত্রের আর একটী প্রধান গুণ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও তিনি কখনও পিতৃব্যবসা পরিত্যাগ করেন নাই, অবসর মত যজমানের ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহ করেন এবং যজমানের বাড়ী হইতে পূজাপার্ব্বণের জিনিষপত্রাদি নিজ হস্তে বহন করিয়া আনিতে কখনও অপমান বোধ করেন না। এরূপ সরলতা বর্ত্তমানকালের শিক্ষিতগণের মধ্যে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

শ্রীযুক্ত রামলাল নন্দী।

(শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার, বি, এ, লিখিত)

শ্রীযুক্ত রামলাল নন্দী মহাশয় মহেশ্বরপাশা বৈশ্য-বারুজীবি সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে কেবলমাত্র অধ্যবসায় ও আত্মযত্নে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং গ্রামে শিক্ষার বিস্তারের জন্য বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন।

যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অনেক কৃতী পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। * তাঁহার পিতা ৺কৃষ্ণমোহন নন্দী—অতিশয় দয়াশীল, সরল এবং অতিথিপরায়ণ লোক ছিলেন। সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বটে কিন্তু তবুও তাঁহার গৃহ হইতে কখনও কোন অতিথি অনভ্যর্থিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেন না। দেবদ্বিজে তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। রামলালের মাতৃদেবীও অত্যন্ত দয়াশীলা ও স্নেহবতী ছিলেন।

১২৮৫ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে রামলাল নন্দী মহাশয়ের জন্ম হয়। ১২৯২ সাল হইতে ১২৯৬ সাল পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া ১২৯৭ সালে তিনি দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৺ইন্দুভূষণ মজুমদার মহাশয়ের অনুগ্রহে অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হয়েন। ১২৯১ সালে তাঁহার মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন এবং ১২৯৯ সালে পিতার মৃত্যু হয়, এইরূপে অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ কষ্টের ভিতর পতিত হয়েন। কিন্তু বড় হইবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে তাহার উন্নতির পথ কেহই রোধ করিতে পারে না। রামলালও অসীম অধ্য-

---

* অনুমান ২০০ বৎসর পূর্ব্বে নড়াইলের অন্তর্গত কচুবাড়িয়া বা কাশীপুর গ্রাম হইতে গৌরহরি নন্দী প্রথম মহেশ্বরপাশায় আসিয়া বাস করেন, গৌরহরির অন্যতর পৌত্র গোপালগোবিন্দ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও আরবা এবং পারশ্য ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বাড়ীতে দেল, দোল, দুর্গোৎসব করিয়া দেশের সমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। গোপালগোবিন্দের মধ্যমপুত্র রামকিশোর শেষজীবনে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেশত্যাগ করেন। তিনিও পারশ্যভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। গোপালগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র চাঁচ্ড়া রাজসরকারে চাকরী করিয়া পিতার ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিয়া যান। নন্দীবংশের অনেকে আটরা, গীলাতলা, সিদ্ধিপাশা, বারাকপুর, দীঘালিয়া ও বিভাগদী প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। খুলনার উকীল আট্‌রানিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ নন্দী ও নরেন্দ্রনাথ নন্দীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের আদিত্যরাম নন্দীর পুত্রগণ লক্ষ্মীকান্ত, শশধর, যশোমন্ত, সতীশ, বাবুরাম প্রভৃতি মহেশ্বরপাশাতেই বাস করিতেছেন।—গ্রন্থকার।

বসায়ের সহিত সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

১৩০২ সালে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে পড়া ছাড়িয়া দিতে হয়। পাঁচ ছয় মাস ব্যারামে ভুগিয়া পুনরায় স্কুলে গেলে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিনাবেতনে পড়াইতে অস্বীকার করিলে, স্কুলের বেতন দিতে অসমর্থ হওয়ায় বাধ্য হইয়া তিনি পড়া ছাড়িয়া দেন। ঐ সনের শেষভাগে সুন্দরবনের অন্তর্গত লাউডোব চকে বিনাসেলামীতে কিছু জঙ্গল জমী লইয়া নিজ হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন এবং সম্পূর্ণ জমী আবাদ হইলে পুনরায় ১৩০৪ সালে দৌলতপুর স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া একজন আত্মীয়ের সাহায্যে ১৩০৬ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খুলনা জেলা স্কুলে কয়েক মাসের জন্য শিক্ষকতা করেন। ইহার পর গবর্ণমেণ্ট জেলবিভাগে প্রবেশ করিয়া জেলরের কার্য্যের জন্য শিক্ষানবিশী করিবার সময় শ্রীযুত বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, খুলনার তদানীন্তন সিভিলসার্জ্জন তাহাকে বলেন—"জেলর কয়েদীরই সামিল, তোমার জীবনটা এ ভাবে অতিবাহিত হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।" উপরন্তু তিনি রামলালকে ডাক্তারী পড়িতে উপদেশ দেন, কিন্তু এদিকে কোন সুবিধা না হওয়ায় রামলাল গবর্ণমেণ্ট ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করেন। সেই হইতে ঐ বিভাগে কাজ করিয়া ১৩৩০ সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

রামলাল অতি যশের সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবন যাপন করেন। ঐ সময়ে তাঁহার সৎসাহস ও কার্য্যতৎপরতার জন্য তিনি উপরস্থ কর্ম্মচারী-গণের নিকট হইতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। ১৩১৬ সালের ঝড়ে সমুদ্রকূলে শিবসানদীর মোহনায় পাঁচখানি কাঠুরিয়া নৌকা ডুবিয়া সমুদ্রগর্ভে ধ্বংস হইয়া যায়। এই সমস্ত নৌকায় ২৩ জন আরোহীর মধ্যে ৭ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, বাকী ১৬ জন লোককে

রামলাল নিজের ও নিজের লোকজনের জীবন ভয়ানক বিপন্ন করিয়া জল হইতে উদ্ধার করেন। এই ঘটনা অবগত হইয়া সুন্দরবনের তৎকালীন ডেপুটী কনসারভেটার মিঃ হ্যালসেট্ এবং খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হ্যামিলটন্ ঘটনাস্থলে যাইয়া সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া এবং স্থানীয় নক্সা প্রস্তুত করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের নিকট এবং বাঙ্গালার বনবিভাগের কনসারভেটারের নিকট রিপোর্ট করেন। তাঁহারা উভয়েই অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক প্রশংসা পত্র সহ রামলালকে পুরস্কৃত করেন এবং বনবিভাগ অথবা যে বিভাগে তিনি ইচ্ছা করিবেন সেই বিভাগেই তাঁহাকে চাকরী দিবেন বলিয়া ভরসা দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনতিকালমধ্যেই তাঁহারা স্থানান্তরিত হওয়ায় সৎকার্য্য জন্য আত্মপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার রামলালের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

১৩২৬ সালের ঝড়ে গঙ্গাসাগরের নিকট নামখানা নামকস্থানে গবর্ণমেণ্টের পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের একখানি ৫,০০০্ টাকা মূল্যের বড় বোট লোকজন সহ জলমগ্ন হয়। ঐ সময় রামলাল স্বয়ং ভীষণ ঝটিকার মধ্যে স্থানীয় হাটের দোকানদার এবং অন্য কয়েকজন লোকের সাহায্যে বোট ও আরোহীদিগকে জল হইতে উদ্ধার করেন। বোটের অন্যতম আরোহী সাব-ইঞ্জিনিয়ার বাবু অরুণকুমার রায় এই ঘটনা তাঁহার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে জানাইলে বাঙ্গলার চিপ্ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাহাদুর সুন্দরবনের ডেপুটী কনসারভেটর সাহেবের মারফত একখানি অতি উচ্চ প্রশংসাপত্র সহ পত্র প্রেরণ করেন। সুন্দরবনে চাকরী করিবার সময় তিনি তিনটী "রয়াল টাইগার" (সুন্দরবনের ব্যাঘ্র) বন্দুকের দ্বারা শিকার করিয়া এবং একটী বড় ব্যাঘ্র খাঁচা পাতিয়া ধরিয়া আলিপুর চিড়িয়াখানায় উপহার দেওয়ায় গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য রামলাল যথাসাধ্য চেষ্টা আজীবন করিয়া আসিয়াছেন। মহেশ্বরপাশা উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বেও তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে পড়িবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং সাধ্যমত অনেক বেকার লোককে বিদেশে চাকুরীর জন্য সময়ে সময়ে সাহায্য করিয়াছেন।

১৩২২ সালে বাগেরহাট, দশানি, কাড়াপাড়া ও বাসাবাটীর কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি বাগেরহাটে একটী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করিলে তিনি সে প্রস্তাবে সহানুভূতি দেখাইয়া ৫০০৲ টাকা দান করেন এবং প্রথম হইতে এযাবতকাল পর্য্যন্ত ঐ কলেজের একজন ট্রাষ্টি আছেন।

বাল্যকালে দরিদ্র রামলাল লেখাপড়া শিখিবার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের এই অভিজ্ঞতা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই এবং তাঁহার আজীবন সঙ্কল্প ছিল গ্রামের দরিদ্র বালকদিগের যথাসম্ভব সুবিধা করিয়া দিবেন। ইং ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে চাকরী হইতে বাটীতে আসিয়া এই উদ্দেশ্যে তিনি ৺রমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার মাইনর স্কুলটী খরিদ করেন। স্কুল খরিদ করিয়া ঘর মেরামত ও আসবাব আদি যোগাড় করিয়া ইং ১৯২১ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে মহেশ্বরপাশায় বর্ত্তমান হাই স্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল স্থাপনের সময় দৌলতপুর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বহু ব্যক্তিই বিশেষ বাধা দিয়াছিলেন, এমন কি প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইনস্‌পেক্টার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণও আপত্তি করিয়াছিলেন। সৎকার্য্যে বাধাবিঘ্ন চিরকালই আছে কিন্তু উদ্দেশ্য যাহার মহৎ শ্রীভগবান নিশ্চয়ই তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপায় ও পরলোকগত অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ

সমাদ্দার মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় রামলাল সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এই বিদ্যায়তনের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। এযাবতকাল বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমানে তিনি গ্রামের অনেকেরই সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহেশ্বরপাশার ন্যায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের গ্রামে যে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন।

এই বিদ্যালয় হওয়ায় কত দরিদ্র ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার স্বজাতীয় বহু বালক যে কেবল মাত্র তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে এমত নহে, গ্রামস্থ এবং নিকটবর্ত্তী নানাস্থানের বহু ছাত্রই তাহার নিকট হইতে শিক্ষা বিষয়ে বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

রামলাল নিজের জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে বহু পরোপকার করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি এখনও জীবিত, তাঁহার জীবনী বা চরিত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় এখনও আইসে নাই। তবে তাঁহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে যে তিনি গ্রামের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং বহু অর্থের মালিক হইয়াও তিনি যেরূপ সরল অনাড়ম্বর ভাবে জীবন যাপন করেন তাহা মনুষ্যমাত্রেরই অনুকরণীয়। তাঁহার সম্পূর্ণ নিরভিমান ব্যবহার ও মিষ্ট আলাপ সকলকেই প্রীত করে। আমরা মঙ্গলনিলয় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি রামলালকে দীর্ঘজীবন দান করতঃ তাঁহার হৃদয়ে নানা কল্যাণ-প্রেরণা জাগ্রত করিয়া তুলুন। তাঁহার জীবন

পরোপকার সাধনজনিত আত্মপ্রসাদ, বিমল যশ ও সাফল্যে মণ্ডিত হউক। *

৺নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। †

নেপালচন্দ্র মহেশ্বরপাশার প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশের স্বর্গীয় জগৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। উচ্চবংশোচিত ঔদার্য্য, দানপরায়ণতা, দেবদেবী অতিথিসেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য গ্রামের মধ্যে জগৎবাবুর যথেষ্ট সুনাম এবং আধিপত্য ছিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিত এবং সমগ্র গ্রামবাসীর নিকট তিনি জমিদারের ন্যায় সম্মান পাইতেন।

নেপালচন্দ্র জগৎবাবুর দ্বিতীয় পুত্র। সন ১২৬৯ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ যশোহর জেলার অন্তর্গত বড়গাতি গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। দেড় বৎসর বয়ঃক্রমকালে উক্ত গ্রামেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, তখন হইতে ৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত

---

* রামলালের পারিবারিক জীবন।—রামলালের দুই বিবাহ। তিনি প্রথমে দশানী নিবাসী ৺জ্ঞানচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র কন্যা ঘৃতকুমারীকে বিবাহ করেন। একটী কন্যাসন্তান জন্মিবার পরে ঘৃতকুমারী পরলোক গমন করেন। রামলাল তৎপরে বারাকপুর নিবাসী খুলনার মোক্তার ৺রামমোহন বিশ্বাসের কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। জ্ঞানদাসুন্দরী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী এবং সাংসারিক ও শিল্পকার্য্যে বিশেষ নিপুণা। খুলনা জজকোর্টের অন্যতম উকিল খালিশপুর গোয়ালপাড়া নিবাসী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র দাসের সহিত তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সুষমার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহাদের এক পুত্র ও দুই কন্যা। রামলালের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সাতটী—পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা।—গ্রন্থকার।

† শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে লিখিত—গ্রন্থকার।

হন। তৎপরে তাঁহার পিতা জগৎবাবু তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া লালন-পালনের চেষ্টা করেন কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা হওয়ায় নিজের মাতুল উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করেন। উমাচরণ রংপুর জেলার অন্তর্গত উলিপুর নামক স্থানে জমিদার সরকারে উচ্চ কার্য্য করিতেন। তাঁহার পরোপকার এবং আতিথেয়তা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবার পরে দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নেপালচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। ইং ১৮৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত বিদ্যালয় হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় দুই বৎসর এফ্‌. এ, পড়েন। ইং ১৮৮১ সালে পরীক্ষা দিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ অকৃতকার্য্য হওয়ায় পিতৃমাতুল উমাচরণের নিকট উলিপুরে গমন করেন. সেখানে দুই বৎসর ২২৲ টাকা বেতনে পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করার পর উক্ত কার্য্য মনঃপুত না হওয়ায় উহা ত্যাগ করিয়া উলিপুর হাইস্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেখানে কিছুকাল কার্য্য করিয়া ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়া দেখেন যে দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে চতুর্থ শিক্ষকের পদ খালি হইয়াছে, তখন তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন এবং সেই সময় হইতে ঐ বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতে থাকেন। ইং ১৮৯২ সালে তিনি তৃতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হয়েন, ঐ সময়ে কিছুকাল ঐ সঙ্গে দৌলতপুরের পোষ্টমাষ্টারের কার্য্যও করিয়াছিলেন, তখন দৌলতপুরে ব্রাঞ্চ আফিস ছিল।

নেপালচন্দ্রের চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিশেষত্ব ছিল তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা। নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি নিয়মিতরূপে করিতেন, গীতা, চণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থেরও যথেষ্ট চর্চ্চা করিতেন। তদ্ব্যতীত সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি নানা বিষয়ক প্রায় ২০৫০ পুস্তক

নিজব্যয়ে ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বভাবের শোভাদর্শনের প্রবৃত্তিও অতি প্রবল ছিল। নানাস্থান হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি বহুবিধ ফুলের চারা আনাইয়া একটী অতি মনোরম পুষ্পোদ্যান তৈয়ার করিয়াছিলেন—নিজহস্তে উদ্যানে কাজ এবং পুস্তকপাঠ তাঁহার অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল। তাঁহার পুষ্পোদ্যান যেমন নানাজাতীয় পুষ্পসৌরভে আমোদিত হইত সেইরূপ তাঁহার জ্ঞানের পুণ্যসুরভিতেও তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা পূর্ণ রহিত।

পিতৃশ্রাদ্ধ ও চারিটি কন্যার বিবাহ, ফুলের চাষ এবং পুস্তক ক্রয় প্রভৃতি কারণে তিনি কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে ঋণ পরিশোধের উপায়ও করিয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহা হইয়া উঠে নাই। এক অভাবনীয় ঘটনায় উক্ত ঋণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সন ১৩১৮ সালের মাঘ মাসে তৃতীয়া কন্যার শ্বশুরালয়ে সকলেই কলেরা-রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, কন্যাটী তখন পিতৃগৃহে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ১৩১৯ সালের ভাদ্র মাসে ঐ কন্যার এক পুত্রসন্তান হয়। দৌহিত্রের সম্পত্তি রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিলে ধর্ম্মের নিকট দায়ী হইতে হইবে এই ভয়ে সেই সম্পত্তি রক্ষা করিতে যত্নবান হন ও নিজের পরিণাম বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া নিজে ঋণ করিয়া সেই সম্পত্তি নিদ্দায়িক করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দৌহিত্রের মৃত্যু ঘটে। এই দৌহিত্র তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল। তাহার মৃত্যুতে নেপালচন্দ্র ভয়ানক শোকাতুর হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে থাকে।

এই সময়ে তিনি সমস্ত বিষয়ে কেমন উদাসীন হইয়া পড়েন। স্কুলের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে সমস্ত সময়ই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, পূজার্চ্চনা ও পুষ্পোদ্যান লইয়া অতিবাহিত করিতেন। ক্রমেই শরীর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুচিকিৎসা ও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে গয়ায় লইয়া যান, কিন্তু সেখানে যাইয়াও কোন

ফলোদয় হয় না। সন ১৩৩৩ সালের ১৩ই মাঘ জ্বর ও পেটে বেদনা-রোগে তিনি গয়াধামেই দেহত্যাগ করেন। মহেশ্বরপাশার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের উপর তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল, এবং তাঁহার মৃত্যুতে গ্রামের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করেন।

সাধারণ পল্লীবাসী বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা-পরম্পরায় প্রাচুর্য্য দেখা যায় না -নেপালচন্দ্রের জীবনেও সেরূপ ঘটনার প্রাচুর্য্য ছিল না। কিন্তু যে সকল গুণে মানুষ দিব্যজীবন লাভে অধিকারী হয়, যে সকল গুণে তাহার জীবন লক্ষ্যপথে চলিতে পারে—সেই জ্ঞানপিপাসা, সত্যপরায়ণতা, ধর্ম্মানুরাগ এবং সদাচারনিষ্ঠতা তাহার জীবনে প্রভূত পরিমাণেই বিরাজিত ছিল। আর সেই জন্যই তাঁহার জীবনেতিহাসের অবতারণা করিবার এই প্রয়াস। মধুমক্ষিকাধর্ম্মী হইলেই মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। যেখানে ফুল ফুটিবে, সেখানে ছুটিয়া যাইয়া মধু আহরণ করাই মধুমক্ষিকার ধর্ম্ম। মহেশ্বরপাশানিবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই নেপালচন্দ্রের এই সকল সদ্গুণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন বিস্তার ও জ্ঞানের বিমলপ্রভায় মণ্ডিত করার চেষ্টা করা উচিত।

অতিরিক্ত অধ্যায়। *

পূর্ব্বপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ।

এই বংশীয়দিগের পূর্ব্বনিবাস ফরিদপুরের অন্তর্গত বাঙ্গালপাশ গ্রামে ছিল। ইঁহাদের সুরাইমেল এবং ইঁহারা নৈকষ্য কুলীন ছিলেন। এই বংশীয় রামসুন্দর সেনহাটী হইতে মহেশ্বরপাশায় আগমন করেন। ব্রাহ্মণের কুল কন্যাগত, কন্যার বিবাহ সমঘরে দিতে না পারিলে কৌলীন্য মর্য্যাদা থাকে না এজন্য পূর্ব্বকালে একই জামাতাকে একই সময়ে একাধিক কন্যা সম্প্রদান করা হইত। কিন্তু এই প্রথা অত্যন্ত দূষণীয় মনে হওয়াতে পরবর্ত্তীকালে অনেকে কুল ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় একই দিনে পশ্চিমপাড়ার নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের দুই ভগ্নী এবং পূর্ব্বপাড়ার ৺রূপরাম মুখো-পাধ্যায়ের এক ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া এখানে বাস করেন। রাম সুন্দরের ৫ পুত্র—রামগোপাল, গোলোকচন্দ্র, তারাচাঁদ, রামচন্দ্র এবং হরচন্দ্র। রামগোপাল, মুখোপাধ্যায় বংশের দৌহিত্র। তাঁহার বংশধরগণ বিছালি গ্রামে বাস করিতেছেন। গোলোকচন্দ্র স্বভাব হইতে ভঙ্গ হয়েন। তাঁহার পুত্র বরদাকান্ত, সারদানাথ মজুমদার এবং মহিমাচন্দ্র ঘোষের সমসাময়িক ছিলেন ও এই তিন জন মহেশ্বরপাশা গ্রামের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। বরদাকান্তের পুত্র অমৃতলাল খুলনা কালেক্টরীতে চাকরী করিতেন। ইংরাজী বক্তৃতা করিবার তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি ১৩২০ সালে দেহত্যাগ করেন।

---

* কতক ছাপাখানার ভুলে এবং কতক গৃহস্থের দীর্ঘসূত্রতায় এই বংশগুলি যথাস্থানে মুদ্রিত হয় নাই—গ্রন্থকার।

তাঁহার তিনপুত্র। রাজেন্দ্র, মণীন্দ্র ও ফণিভূষণ, সকলেই রেলবিভাগে চাকরী করিতেছেন।

তারাচাঁদ এবং রামচন্দ্রের বংশ নাই। হরচন্দ্র যশোহরের উকিল ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহেশচন্দ্র গ্রামের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রাম এবং সমাজের পরে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সমাজের নেতৃত্ব করিতেন এবং সালিসী বিচারে তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার বাড়ী আসিয়া অতিথি কখনও ফিরিয়া যাইত না। পীড়িতের সেবায়ও তিনি তৎপর ছিলেন। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তিনি রাস্তা হইতে বিদেশী রোগী কুড়াইয়া বাড়ীতে আনিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন, ব্যাধি মুক্ত হইলে নিজ খরচে তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেন। ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহেশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং এই সমস্ত কার্য্যে প্রিয়তম সঙ্গী ছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। মহেশচন্দ্র ১৩০৯ সালে দেহত্যাগ করেন।

মহেশচন্দ্রের তিন পুত্র, মন্মথনাথ, প্রমথনাথ ও যতীন্দ্রনাথ। মন্মথনাথ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। গ্রামের যাবতীয় সদনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। যতীন্দ্রনাথ খড়্গপুরে রেলওয়ে পুলিশ অফিসে চাকরী করিতেছেন। প্রমথনাথ অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া বরিশাল কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, পরে পুলিশে প্রবেশ করেন। তিনিও পিতার উপযুক্ত পুত্র,—"শাল-প্রাংশু মহাবাহু" ছিলেন। তিনি প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনিও সন্ন্যাসিনী, ৺কাশীধামের শঙ্করমঠে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রে পারদর্শিনী। তাঁহার গৌরব মণ্ডিত নামে আজ মহেশ্বরপাশা ধন্য।

৺দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদের জ্ঞাতি, কিন্তু দূর সম্পর্কীয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ কেহ রূপদিয়া গ্রাম

হইতে এখানে আসেন। সীতানাথের পুত্র সন্তান নাই। দুটী কন্যার বিবাহ গ্রামের মধ্যেই হইয়াছে। ৺যদুনাথ ঘটক যখন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন সীতানাথ দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন এবং যদুনাথের মৃত্যুর পর তিনি প্রধান শিক্ষক ভাবে বহুকাল বিদ্যালয়ের কার্য্য করেন। তিনি খুব অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন কাহারও সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে যাহার সহিত তিনি কিছুক্ষণ আলাপ করিতেন তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ইউনিয়ান কমিটির মেম্বররূপে তিনি গ্রামের রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। সীতানাথের পুত্র সন্তান নাই। দুইটী কন্যার বিবাহই গ্রামের মধ্যে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে শ্রীযুত মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠা কন্যাকে শ্রীযুত কালীকুমার মুখোপাধ্যায় বিবাহ করিয়াছেন।

মধ্যপল্লীর ভট্টাচার্য্য।

মধুমতী নদীর ভাঙ্গনের জন্য শ্রীযুত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় (১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে) বাড়ী করিয়াছেন। তাঁহার অনুজ হরিনাথ মুখভারতের বংশে ৺দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহারা কাচ্‌নার মুখুটি, দিবাকরের সন্তান, মাঝপাড়ার ভরদ্বাজ গোত্র, বংশজ! প্রিয়নাথ নিঃসন্তান, হরিনাথের দুই পুত্র, নির্ম্মলকুমার, অমলকুমার এবং দুই কন্যা। প্রিয়নাথ হরিনাথের পিতা রামচরণ ভট্টাচার্য্য এবং পিতামহ কমলাকান্ত, কমলাকান্তের দুই পুত্র। অন্যতর, গঙ্গাচরণের পুত্রগণ বর্ত্তমানে সুপ্তগ্রামে বাস করিতেছেন।

মধ্যপাড়ার ঘটকবংশ।

মধ্যপাড়ার ঘটকবংশ মহেশ্বরপাশার অন্যতম প্রসিদ্ধ বংশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বংশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। উমাচরণ ঘটকের পুত্র বিপ্রদাস। বিপ্রদাসের ৩ পুত্র—উদয়চাঁদ, নবনাগর ও সাগর। শেষোক্তের বংশ নাই। উদয়চাঁদের দুই পুত্র সীতানাথ (নিধু) ও যদুনাথ। যদুনাথের জীবনী অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। সীতানাথের পুত্র যজ্ঞেশ্বর। নবনাগরের পুত্র কৃষ্ণহরি, তাঁহার দুই পুত্র ঠাকুর দাস (অকালে মৃত) ও গোপাল, ঠাকুরদাসের তিন পুত্র সুধীর, অধীর ও অজিত।

পশ্চিমপাড়ার আদিত্যবংশের ভাগিনেয় বড়ভূগার মিত্র।

ইঁহাদের আদিনিবাস যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়া গ্রাম। সেখান হইতে কেহ নৈহাটী শ্রীরামপুরের সুপ্রসিদ্ধ ৺শিবনাথ ঘোষের বাড়ীতে বিবাহ করিয়া সেইখানেই বাড়ী করেন। ৺বিশ্বনাথ মিত্রের পুত্র ৺মদনচন্দ্র মিত্র নলধার রাহাবাড়ীতে বিবাহ করিয়া নলধা গ্রামে বাস করেন। মদনের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র মিত্র মানসার নিকটবর্ত্তী গিলেতলা গ্রামের দত্তবাড়ী বিবাহ করেন এবং সম্পত্তি পাইয়া সেইখানে বাস করেন। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত কেদারনাথ মিত্র গিলেতলার বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। উত্তরকালে গোবিন্দচন্দ্র দ্বিতীয় পক্ষে মহেশ্বরপাশায় শ্রীযুত রামচাঁদ আদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। শ্রীযুত শশিভূষণ মিত্র রামচাঁদের দৌহিত্র। শশিভূষণের দুই পুত্র নারায়ণ ও মধুসূদন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দৌলতপুর*

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভৈরবনদের কূলে দৌলতপুর কয়েকঘর মুসলমান এবং চর্ম্মকারের বসতিযুক্ত একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল, কিন্তু আজ ইহার প্রসিদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পল্লী আজ ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর কলেজ, উচ্চ ইংরাজী স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব, বালিকা বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস, রেল ষ্টেশন, ষ্টীমার ষ্টেশন, বাজার, ডাক্তারখানা প্রভৃতি শিক্ষিত মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান সমন্বিত এরূপ বন্দর বঙ্গদেশে আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। ভৈরবের কূলে দৌলতপুর অতি রমণীয় স্থান। এই সকল সুবিধার জন্য অনেক বিদেশী ভদ্রলোক এখানে বাড়ী করিতেছেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম অপেক্ষা এখানকার স্বাস্থ্য ভাল।

এইরূপ জনশ্রুতি দৌলতখান নামক এক ব্যক্তি "খান" অর্থাৎ "বিজয়ী" উপাধি লইয়া পশ্চিম দেশ হইতে এই স্থানে আসেন, তাঁহার বংশধরগণ "শেখ" অর্থাৎ "ধর্ম্ম নেতা" উপাধি লইয়া এখানে বাস করিতেছেন। দৌলতখান যখন এই দেশে আগমন করেন, তখন খুলনা পৃথক জেলারূপে পরিগণিত হয় নাই, নওয়াবাদের থানা বলিলেই খুলনা বুঝিতে হইত। দৌলতপুর তখন জঙ্গলাবৃত ছিল। দৌলতখান অল্প দিনের মধ্যেই এতদ্দেশে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন এবং এই স্থানের

---

*দৌলতপুরের সহিত মহেশ্বরপাশার নিকট সম্বন্ধ। দৌলতপুর রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন এবং পোষ্টাফিস মহেশ্বরপাশারই অন্তর্গত। এজন্য দৌলতপুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থকার।

দৌলতপুর নামকরণ করেন। দৌলতখানের বংশের একটী শাখা মাত্র এখানে বাস করিতেছেন।

দৌলতখানের অধস্তন ৮ম পুরুষ নুটই সেখ। তাঁহার পাঁচ পুত্রের অন্যতম আমানুল্লা সেখের পৌত্র রায়ান উদ্দীনের নাম এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি দৌলতপুর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দৌলতপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন, পরে পুলিশবিভাগে প্রবেশ করিয়া সাব-ইন্‌স্পেক্টার হন, অশ্বারোহণ এবং প্যারেড্ প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেন, কিন্তু পুলিশের কর্ম্ম তাহার ভাল লাগে নাই সেজন্য তিনি দৌলতপুর স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে নিষ্পেষিত হইয়াও, নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াও তিনি মক্কা পরিদর্শন করিয়া হাজী উপাধিতে ভূষিত হন, কিন্তু ইহার এক বৎসর পরেই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে কলেরারোগে অকালে দেহত্যাগ করেন। শারীরিক ব্যায়ামে এক সময়ে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া বহু পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।

নুটই সেখের অন্যতম পুত্র নিয়ামতুল্লা সেখের পুত্র মৌলবী গোলাম রহমান সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, এজন্য তিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত আছেন এবং স্থানীয় মসজিদের বর্ত্তমান ইমাম বা ধর্ম্মগুরু। তাহার পুত্র মহম্মদ আবুলকাসেম তরুণ সাহিত্যসেবী, তিনি ইং ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কলিকাতা কংগ্রেস আফিসে উপস্থিত হন এবং পরে রাজনৈতিক বক্তৃতার ফলে একমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্ত হইয়া তিনি নিঃসম্বলে ভারতের বিভিন্ন দেশ ও নগর পর্য্যটন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পরে নানাবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "মোহাম্মদী", "আল্‌মুস্‌লিম," "দৈনিক সুলতান" প্রভৃতি কয়েকটী মুস্‌লিম্ কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করেন, কিন্তু এ স্থলে

CS CamScanner



মোসাম্মাৎ রেজিয়া খাতুন।

জন্ম ৩রা চৈত্র ১৩১৬ সন,

মৃত্যু ৩রা আশ্বিন ১৩৩৬ সন।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বর পাশা পরিচয়ের" জন্য)

তাঁহার স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই স্বর্গীয় কুসুম প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই চিরদিনের জন্য ঝরিয়া পড়িয়াছে। এই বিদুষী মুসলমান রমণীর অকাল মৃত্যু দৌলতপুরের দুর্ভাগ্য। ১৩৩৩ সালের ৩রা আশ্বিন মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর তিনি স্বামীর আন্তরিক চেষ্টায় মুসলমান সমাজের শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট মোস্‌লেম ফিমেল পর্দ্দাহ ট্রেণিং ইন্‌স্‌টিটিউসনে টিচারশিপ পড়িতে যান, কিন্তু দুরন্ত বেরিবেরি রোগের কবলে পড়িয়া ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। রোগাক্রান্ত হইলেই চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁহাকে পিত্রালয় খুলনা টুটপাড়ায় আনা হয় এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ ও কবিতা "বঙ্গলক্ষ্মী", "মাতৃমন্দির", "সওগাত", "ইস্‌লাম দর্শন", "মোস্‌লেম দর্পণ" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অল্পদিনের মধ্যে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। উন্নত সূচীকার্য্য, এম্‌ব্রয়ডারী, ক্রচেট্‌ওয়ার্ক, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে তিনি বহু পদক ও প্রশংসাপত্রের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই বিদুষী রমণীর নাম মোসাম্মৎ রেজিয়া খাতুন। তাঁহার মৃত্যুর পর "প্রবাসী" ১৩৩৩ মাঘ সংখ্যায় তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং "মোস্‌লেম দর্পণে" তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়।

দৌলতপুর নিবাসী সেখ মহম্মদ ইস্‌মাইল হোসেনের নামও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি ফুলবাড়ী উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের অন্যতম শিক্ষক; তিনি তরুণ কবি; তাঁহার কবিতা মাসিক "মহম্মদী", "মোস্‌লেম দর্পণ" প্রভৃতি কাগজে বাহির হয়।

*   *   *   *   *   *

দৌলতপুরে যাহারা আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন,

তাহাদের মধ্যে ফকীরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস যশোহর মাগুরার অন্তর্গত দুল্লে গ্রামে ছিল তিনি ১৩১২ সাল হইতে দৌলতপুরে বাস করিতেছেন। জ্যোতিষ সংকারে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাহার এক পুত্র সতীশচন্দ্র পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

ঝিনাইদহের অন্তর্গত বোড়াইল নিবাসী শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন দৌলতপুরে ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন, তখন দৌলতপুরে জমী ক্রয় করিয়া বাড়ী করেন। দেশে যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও পুত্র পৌত্রাদির শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহার ৮ পুত্র; ১ম অতুল. গার্ড, ২য় প্রতুল ডি, টি, এস্, আফিসের কেরাণী, ৩য় নির্ম্মল পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত, ৪র্থ অমল সাব এসিষ্ট্যাণ্টসার্জন, ৫ম বিমল বি, এস, সি, পরীক্ষায় জুলজীতে ১ম স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমানে এম্, এস্, সি, পড়িতেছেন।

বসন্তকুমারের জামাতা প্রাণকৃষ্ণ কাঞ্জিলালও এস্থানে বাড়ী করিয়াছেন। তিনি দৌলতপুর স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন, সাহিত্য সেবা তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল; স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁহার অনেক কবিতা এবং প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে অকালে স্বীয় ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন; তাঁহার অকালমৃত্যু দৌলতপুরের দুর্ভাগ্য।

সাবডিপুটী মৌলবী ইব্রাহিম হোসেন দৌলতপুরে বাড়ী করিয়াছেন, তাঁহার জীবনকথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

দৌলতপুরের সন্নিহিত গাইকুড় গ্রাম মহেশ্বরপাশার অন্তর্গত, এই গ্রামের সেখ ও কাজিবংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। সেখবংশে মুন্সী এফাজদ্দিন আহম্মদ ও মুন্সী আহমদ হোসেন দুই ভাই বর্ত্তমান; ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়া প্রথমে দীঘালিয়া গ্রামে বাস করেন, তাঁহাদের এক বংশধর আকবর আলি গাইকুড়ে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ

করেন। মুন্‌সী এফাজদ্দিন অনেক দিন দৌলতপুর পাবলা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, সে সময়ে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে গাইকুড়ে একটী সরকারী পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে। সরকার বাহাদুর তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট ও একটী ঘড়ী পুরস্কার দিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ হেলালদ্দিন কাজিবংশে বিবাহ করেন।

*　*　*　*

দৌলতপুরের সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি এস্থলে উল্লেখযোগ্য।—

দৌলতপুর দাতব্য চিকিৎসালয়। দৌলতপুরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হওয়ায় মহম্মদ মহশীন ফণ্ডের টাকায় ইং ১৮৬৬ সালে, বর্ত্তমান ষ্টীমারঘাটায়, পুরাতন স্কুল ঘরের নিকটে একটী খড়ের ঘরে ডাক্তারখানা প্রথম স্থাপিত হয়। ৺পূর্ণচন্দ্র সেন এখানকার প্রথম চিকিৎসক। গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারের বেতন দিয়া থাকেন। ১৮৭৩।৭৪ সালে বাজারের সন্নিকটে ডাক্তারখানার পাকাবাড়ী হইয়াছে। এই ডাক্তারখানায় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বৎসরে ৩০০৲ এবং সৈদপুর ট্রাষ্ট এষ্টেট্ ৪০৮৲ টাকা দিয়া থাকেন। স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিকট হইতে ২৫০৲ টাকা চাঁদা আদায় হয়। গবর্ণমেণ্ট ফ্রি ডাক্তার বাদেও কুইনাইন ও সিঙ্কোনা বাবদ বৎসরে ২০০৲ এবং ফর্ম্মের জন্য ৫০৲টাকা দিয়া থাকেন। রোগীর গড়পড়তা দৈনিক হার ১২০ হইতে ১২৭। বর্ত্তমান সময়ের ডাক্তার শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দে মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ১৯২৯ অব্দের মার্চ্চ মাসে একটী টিউব ওয়েল প্রোথিত হইয়াছে।

হাই স্কুল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহা মাইনর স্কুল ছিল, পরে হাই স্কুলে পরিণত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত ইতিহাস অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দু একাডেমী।—হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল বাঐ-ডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী, এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও ত্যাগে এই কলেজ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভৈরবের কূলে স্থাপিত হইয়াছে। এই কলেজ ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় সম্পত্তি ৺দধিবামনদেবের নামে উৎসর্গীকৃত এবং বর্ত্তমানে ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে। প্রায় দুই শত বিঘা জমীর উপর এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। কলেজের মূল দালানের নিম্নতল দশানী নিবাসী ৺যদুনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের দানে তাঁহার মাতৃদেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত হয়। কলেজ সংক্রান্ত আরও কতকগুলি গৃহ ভারতের বহু দানশীল রাজা মহারাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট একটী হিন্দু ও একটী মুসলমান বোর্ডিং করিয়া দিয়াছেন। বাবু শিবচন্দ্র গুঁই এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই কলেজের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। কলেজে একটী বড় লাইব্রেরী আছে; অধ্যাপক মিত্র প্রতিষ্ঠিত একটী মিউজিয়াম আছে। ইহার সংসৃষ্ট সারস্বত চতুষ্পাঠী বা টোলে বহু ছাত্র সংস্কৃত পড়িতেছেন।

বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়।—সেনহাটী নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন শ্রীযুত হরিচরণ সেন মহাশয়ের স্বর্গগতা কন্যা বীণাপাণির পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার স্বামী সাবডিপুটী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের উদ্যোগে পিতার অর্থানুকুল্যে এবং স্থানীয় সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দে মহাশয়ের আন্তরিক সহায়তায় গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিনাশ বাবু ইহার বর্ত্তমান সেক্রেটারী। একজন শিক্ষয়িত্রী ও একজন শিক্ষক দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে।

জুনিয়ার মাদ্রাসা।—দৌলতপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা গত ... খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির ঐকান্তিক চেষ্টায়

CamScanner

স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৫৫৲ টাকা, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে ১০৲ ও সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেট্ হইতে ১০৲ টাকা সাহায্য আছে। ইহার বর্ত্তমান সেক্রেটারী সাবডিপুটী মৌলবী ইব্রাহিম হোসেন, বি, এ।

রেজিয়া খাতুন বালিকা বিদ্যালয়।—দৌলতপুর নিবাসী ডাক্তার মোহাম্মদ আবুল কাসেম সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রামে একটী বালিকা মোক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার স্বর্গগতা স্ত্রী রেজিয়া খাতুনের পবিত্র নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, ট্রাষ্ট ষ্টেট এবং ইউনিয়ানবোর্ডের সাহায্য আছে।

পাট গুদাম।—ভৈরবের কূলে এখানে কয়েকটী বড় গুদাম আছে। এখান হইতে বহু পাট রপ্তানি হয়। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লোহাগড়া লক্ষ্মীপাশা নিবাসী বাবু ডি, এন্, পোদ্দার জনৈক সাহার নিকট হইতে একটী গুদাম কিনিয়া লয়েন, ইহাই বোধ হয় দৌলত-পুরের প্রথম পাট গুদাম। ইহার পরে মঙ্গলচাঁদ চুনিলাল মাঁড়য়ারীর গুদাম হয়। ঢাকার বরমগঞ্জ নিবাসী বাবু রাধিকামোহন সাহার গুদাম, মাড়য়ারী রামপ্রসাদ বাবুর গুদাম, মাড়য়ারী রামগোপাল বাবুর গুদাম, সালকিয়া নিবাসী বাবু বি, এন্, মুখার্জ্জীর গুদাম পর পর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পর দুইটী গুদাম হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে ফুসরাজ মাড়য়ারী ও দেবীপ্রসাদ মাড়য়ারীর গুদাম হয়। ইহার পরেও বলীচাঁদ জেঠমল, হনুমান মাড়য়ারীর এবং আরও কয়েকটী গুদাম হইয়াছে।

দৌলতপুরের হাট এবং বাজার।—এ অঞ্চলে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হাট। প্রতি মঙ্গল এবং শনিবারে হাট বসে।

বাজার প্রত্যহ সকালে বসিয়া থাকে। এই হাট এবং বাজার হাজী মহম্মদ মহশীনের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে ইহার বার্ষিক খাজনা সাড়ে চারি হাজার টাকা। ষ্টেট হইতে দুটি বড় চাঁদনী নির্ম্মিত হইয়াছে।

মস্‌জিদ।—ইহা একটী প্রাচীন মস্‌জিদ। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সাধারণের সাহায্যে পাকাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে।

সত্যাশ্রম—গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মাত্র ১৯ জন সভ্য লইয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র ঘর এবং তৎসংলগ্ন লাইব্রেরী আছে। নৈশবিদ্যালয় এবং বয়ন বিদ্যালয় ইহার পার্শ্বে ছিল কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কিরণ বাবু রাজদ্রোহাপরাধে ধৃত হইলে বিদ্যালয় দুটী আস্তে আস্তে উঠিয়া যায়। কিরণ বাবু বর্ত্তমানে মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি পুনরায় এই সমস্ত অনুষ্ঠানে মনোযোগ দিয়াছেন। এই স্থানে দরিদ্রদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করা হয়।

রেল ও ষ্টীমার ষ্টেসন।—ইং ১৮৮৪ সালে পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ ধনী জার্ম্মান দেশবাসী রথচাইল্‌ড্‌ কর্ত্তৃক ১ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা হইতে খুলনা ১০৯ মাইল রেলপথ প্রস্তুত হয়। উত্তরকালে এই লাইন ই, বি, আর, এর হস্তে গিয়াছে। রেল লাইনের সঙ্গে সঙ্গেই ভৈরবনদে আর, এস্, এন্, কোম্পানীর ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে মাগুরা ও কালিয়া লাইনে ষ্টীমার চলাচল করিতেছে। রেল ও ষ্টীমারের সংযোগস্থল হওয়াতে এবং কলেজ ও গুদাম প্রভৃতির বিদ্যমানতায় দৌলতপুর রেল ও ষ্টীমার ষ্টেসনের প্রসিদ্ধি ও আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পোষ্টাফিস।—ইং ১৮৮১ সালে সেনহাটীর ব্রাঞ্চরূপে দৌলতপুর পোষ্টাফিস স্থাপিত হয়। দৌলতপুর স্কুলের তদানীন্তন

হেড্ মাষ্টার কুমীরা নিবাসী শ্রীযুত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তিকালে ইহা সাবআফিসে পরিণত হয়। বর্ত্তমানে টেলিগ্রাফ সংযুক্ত হইয়াছে এবং কার্য্যও বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

দৌলতপুর কাছারী।—দৌলতপুর কাছারী কোন্ সালে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। হাজী মোহাম্মদ মহশীনের উইল অনুসারে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ইং ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ব্বাচিত দুই জন মোতোয়ালী কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। কিন্তু তাহাদের অক্ষমতাহেতু ১৮১৬ সালে এই সম্পত্তি বোর্ড অব রেভিনিউ কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের হস্তে নীত হয় এবং যশোহরের কালেক্টার স্থানীয় তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হন। যশোহরের নিকটে নুড়লী নামক স্থানে কাছারী ছিল। কিন্তু ইহার কিছু পরেই একজন আমলা কর্ত্তৃক দলিল পত্রাদি সহ কাছারী বাড়ী দগ্ধীভূত হয়। এই দুর্ঘটনা হেতু ইং ১৮২৩।২৪ সালে সমস্ত সম্পত্তি জরিপ করিয়া পত্তনি দেওয়া হয়। * সম্ভবতঃ এই সময় দৌলতপুরে কাছারী হয়। কিন্তু মহেশ্বর-পাশা ও খালিশপুর পরগণা প্রকৃত প্রস্তাবে ইং ১৮৫১ সালের পরে গবর্ণমেণ্টের খাসমহালে পরিণত হয়। ইহার পূর্ব্বে মিষ্টার ডুবারডক্স, আর্চিবোলড ব্রাইস, এবং ফার্থ নামক তিন জন সাহেবকে ক্রমান্বয়ে পরগণাদ্বয় পত্তনি দেওয়া হয়। ইং ১৮৮৪ (বাং ১২৯১) সালে খুলনার কালেক্টার বাহাদুর ইহার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছেন। †

বাণীকান্ত প্রেস।—পাবনা গ্রামের গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দৌলতপুর স্কুলের কেরাণী ও অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। এক

* Notes on Mahsin's Endowment and Saidpur Trust Estate by Mr. W. M. Clay, Page 8.

†. Ibid, Page 12.

সময়ে তিনি স্কুলের প্রশ্নপত্র খুলনায় ছাপাইতে যাইয়া প্রেসের কর্ম্মকর্ত্তা-দের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হন। সেই সময় হইতেই তাঁহার নিজ বাড়ীতে প্রেস করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। গোপাল চন্দ্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন। প্রেসের জন্য তিনি এতই উদ্বিগ্ন হইলেন যে চিকিৎসা ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে কিছু পুরাতন টাইপ খরিদ করিয়া আনিলেন এবং টাইপ রাখিবার জন্য খুলনার তদানীন্তন S. D. O. শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট হইতে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর টাইপ চাপা দেওয়া যায়, এরূপ ভাবে তিনি ছোট একটী কাঠের যন্ত্র করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপার কার্য্য করিতে থাকেন। ইহার দুবৎসর পরে তিনি কলিকাতা হইতে ছোট একটী যন্ত্র ক্রয় করেন, এবং রীতিমত ব্যবসায়ের জন্য ইং ১৯১৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে খুলনা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ডিক্লেয়ারেশন (declaration) দেন। ইহার পরে খুলনা হইতে তিনি অল্প দামে বিশেষ ত্রুটীযুক্ত বৈশ্য ভাণ্ডার প্রেস ক্রয় করেন। এই ত্রুটী ধরিতে এবং নিজহস্তে সংশোধন করিতে তিনি যথেষ্ট অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যাহা হৌক, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, চেক, দাখিলা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ছোট ছোট পুস্তকও ছাপা হইতে থাকে এবং প্রেসও ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। গ্রন্থকারের "ছেলেদের গোরার" কয়েক ফর্ম্মা এবং গল্পপুস্তক "মরীচিকা" এই ছাপাখানা হইতেই মুদ্রিত হয়। ইং ১৯২২ সালে প্রেসের জন্য ইষ্টকালয় হইয়াছে। গভীর পরিতাপের বিষয় কর্ম্মবীর গোপালচন্দ্র জীবন-মধ্যাহ্নে গত ৩রা নবেম্বর (১৯২৮) তারিখে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার উপযুক্ত অনুজ শ্রীযুক্ত কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রেসের তত্ত্বাবধারক।

পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট।

(ক)

চট্টোপাধ্যায় বংশ।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের হরিদাসপুরের বিবাহজাত পুত্রগণের মধ্যে একজনের ধারা এখানে বর্ত্তমান। এই পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় যে সম্বন্ধে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ আছে। এইরূপ হইবে—

রামগোপালের পুত্র রামজীবন, তাঁহার পুত্র হরিরাম ন্যায়ালঙ্কার। ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রাধাকৃষ্ণ, ইনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। রাধাকৃষ্ণের ৪ পুত্র—মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয়, গোলোক এবং বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ ভূরিভোজী ছিলেন এবং এজন্য গ্রামের মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাঁহার পুত্র মহিম নিঃসন্তান। ধনঞ্জয় ও গোলোকের বংশ নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র কালীকুমার এবং তাঁহার পুত্র গণেশ। ত্রৈলোক্য, মহেন্দ্র প্রভৃতি গণেশের চারিপুত্র।

*　　*　　*　　*

রামগোপালের অন্যতম পৌত্র রামশরণের চারিপুত্র—রামমোহন, নীলকণ্ঠ, রামলোচন, মুলুকচাঁদ। রামমোহনের বংশধরগণ পশ্চিমপাড়ায় অবস্থিত। রামলোচনের বংশধরগণ পূর্ব্বপাড়ায় রেল লাইনের অপর পারে বাস করিতেছেন। মুলুকচাঁদের বংশে ৺উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণ পুরাতন বাড়ীতেই আছেন। উমেশচন্দ্রের পুত্রগণ বলেন, রামলোচন তাঁহাদের প্রপিতামহ অর্থাৎ মুলুকচাঁদের পুত্র। কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত এবং ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েরই এক নাম কেমন করিয়া সম্ভব হয়? পরন্তু রামলোচনের পিতা মুলুকচাঁদ নহেন, রামগোপাল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস, অর্থাৎ আদি রামগোপালের প্রপৌত্রও রামগোপাল—ইহা আরও বিস্ময়কর।

যাহাহোক, মুলুকচাঁদের পুত্র যদি রামলোচন হন, রামলোচনের

চারিপুত্র—প্রাণনাথ, রামতনু, দ্বীপচন্দ্র, তারাচাঁদ। প্রাণনাথের বংশধরগণ তেতুলকাঁদি গ্রামে বাস করিতেছেন। রামতনু ও দ্বীপচন্দ্রের বংশ নাই। দ্বীপচন্দ্র কবির ওস্তাদ ছিলেন। একবার সেনহাটী গ্রামে তাঁহাকে পাণ্ডাঠাকুর বলিয়া গালি দেয়। তিনি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন—

আমি পাণ্ডাঠাকুর হই,
স্পষ্ট কথা তোদের কই,
শুক্‌নো হাতের প্রসাদ ল'য়ে
রাত্রিদিন সেনহাটীতে রই।
পাণ্ডা দেবে মোণ্ডা বে'র করে
তোদের আর ক্ষেত্রে যেতে হ'বে না।
আমি যে পাণ্ডা ভাই
সেনহাটীর গ্রামছাড়া না॥

রায়চৌধুরী ও রায় বংশ।

এই পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় রায়চৌধুরী বংশের উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেকে বলেন এখানে আর যে দুঘর "রায়" আছেন তাহাদের সহিত জমীদার রায়চৌধুরীর কোন সম্বন্ধ নাই। অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন রায় বংশ রায় চৌধুরীরই জ্ঞাতি, উপরন্তু ৺যদুনাথ রায় মধুসূদন রায় চৌধুরীর নিকট জ্ঞাতি ছিলেন। যদুনাথের পূর্ব্বপুরুষের চৌধুরী খেতাব ছিল কিন্তু উত্তর কালে অনাবশ্যক বোধে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই। বর্ত্তমানে এ সমস্যার মীমাংসা আমরা করিতে পারি না। ৺কালীবাড়ীর ইতিহাসে (১৮ পৃষ্ঠা) আমরা দেখিতে পাই রামসন্তোষ এবং খেলারাম রায় কালীমূর্ত্তি তাহাদের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন, রামসন্তোষ মধুসূদন রায়ের পিতা এবং খেলারাম ৺যদুনাথ রায়ের প্রপিতামহ।

পরিশিষ্ট

(খ)

ঘটক নন্দরাম মিত্রের কারিকা।

পাঁজিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ঘটক নন্দরাম মিত্রের কারিকার প্রতিলিপি দেওয়া হইল। আমরা উহার পাঠোদ্ধার এইরূপ করিয়াছি—

কলুঞ্চ নগরধাম দশরথ গুহ নাম
আদিশূর সভায় আগমন।
বিপ্রদাস স্বীকার নয় মৌলিকত্ব পদ হয়
কুলহীন হইল তে কারণ। ১।
চারি জন তস্য সুত রামগুহ বঙ্গে গত
লক্ষ্মণ রহিল এই দেশে।
ভরত আর শত্রুঘ্ন বংশশূন্য দুইজন
দুই পুত্র লক্ষ্মণের বংশে। ২।
মুরারিধর অগ্রগণ্য অলঙ্কার বংশ শূন্য
বীরভদ্র মুরারি তনয়।
তস্য সুত পঞ্চানন দিবাকর শুভাজন
তস্য সুত বশিষ্ট মহাশয়। ৩।
এক পুত্র হইল তার ধন্য গুহ প্রথিধর
সৃষ্টিধর তাহার নন্দন।
তস্য সুত কমলাকান্ত বংশে অংশে ভাগ্যমন্ত
সুত ব্রহ্মানন্দ একজন-। ৪।
সুত রামশঙ্কর নাম সর্ব্বগুণে গুণধাম
শ্রীকর তাহার সন্ততি।

তাহার তনয় দুই বিশেষিয়া বলি এই
কাশীশ্বর গোপাল গুহতি। ৫।

নবকুল একত্তরে গোপাল গুহর শিরে
চন্দন দিলেক সভামাঝ।

গোষ্ঠীপতি মর্য্যাদা হয় ঘটক কুলীনে গায়
স্থিতি ধন্য মহানাদ সমাজ।

আস্তরস কার্য্য তার কাশীনাথ বসুজার
কনিষ্ঠ কুল ত্রয়োদশ পর্য্যায়।

পুত্র হইল তিন জন শিব নরেন্দ্র নারায়ণ
যাহা হইতে বংশ দীপ্তিময়। ৬।

শিব সুত গদাধর বংশীবদন গুহ আর
সুত গৌরীশঙ্কর সুন্দর।

শ্রীকৃষ্ণ রাম জীবন জানকী বল্লভ বিচক্ষণ
হরিদাস সাত সহোদর। ৭।

ধন্য ধন্য হরিদাস গুহবংশে সুপ্রকাশ
চণ্ডীদাস তাহার তনয়

গুণেতে হইয়া বশ দেশদেশান্তরে যশ
কুলীন কুলাচার্য্যগণে কয়। ৮।

মহানাদ সমাজ ছাড়ি মহেশ্বরপাশায় বাড়ী
জমিদারী হইল তথাকার।

শ্রীনাথ রায় জ্যেষ্ঠ সুত রাজীব মজুমদার খ্যাত
তদনুজ কমল সরকার।

ঈশ্বর গুহ জ্যেষ্ঠ রাম গুহ বড় ছেষ্ট (শ্রেষ্ঠ)
লব কুশ তাহার তনয়।

তিন পুরুষ একত্তরে রাজাজ্ঞা অনুসারে
বঙ্গে গেল নন্দরাম কয়।

এই কারিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় চণ্ডীদাস পুত্র ও পৌত্র সহ মহেশ্বরপাশায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে প্রবাদ তিনি জমী মাপিতে আসিয়া মহেশ্বর ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানে বাস করেন। চণ্ডীদাস বিবাহ করিয়া দেশে যান, পরে পুত্র পৌত্র সহ এখানে আসিয়া বাস করেন, এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে রাজীব চণ্ডীদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বোধ হয়। তাহার দুই পুত্র ঈশ্বর ও রাম। ঈশ্বর বড় হইলেও রাম গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন অধিকন্তু দুই ভ্রাতা লবকুশের ন্যায় বিরাজ করিতেন। যখন ইহারা মহেশ্বর-পাশায় আগমন করেন, তখন শ্রীমুখ ও কমলের সন্তানাদি হয় নাই।

দশরথ বিরাট গুহের পৌত্র এবং নারায়ণ গুহের পুত্র। কিন্তু দশরথ আদিশূরের সভায় আগমন করেন নাই এবং তিনি আদিশূরের সমসাময়িকও ছিলেন না। কেহ কেহ বলেন বিরাট গুহ আদিশূরের সভায় আগমন করেন পরন্তু উক্ত সভায় পঞ্চকায়স্থের আগমনেরও কোন ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। * ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কায়স্থগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আধুনিক কুলগ্রন্থের ভ্রান্ত মত অনেকে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে আদিশূর ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, জগৎশেঠের ন্যায় উহা উপাধি মাত্র। গৌড়ের অধিপতি জয়ন্ত ১ম আদিশূর বলিয়া পরিচিত। † তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিবার জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং যজ্ঞশেষে স্বদেশে ফিরিয়া যান; কিছুদিন পরে পুত্র পরিজন সহ পুনরায় গৌড়ে আসিয়া

---

* কায়স্থ পত্রিকা ১৩৩৫ আশ্বিন ২৯৬ পৃষ্ঠা এবং নগেন বাবুর "আমার জীবন কথা" কায়স্থ পত্রিকা, ১৩৩৪, শ্রাবণ, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা।

CamScanner

রাজপ্রদত্ত ভূমিতে বসবাস করিতে থাকেন। যাহারা যজ্ঞ করিতে আসিয়াছিলেন—হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের মতে তাঁহাদের নাম—ক্ষিতীশ মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি। ভট্ট নারায়ণ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি আসেন নাই, পরন্তু তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের পুত্রাদির মধ্যে পরিগণিত। এই সময় মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থগণও আসেন নাই, তাঁহারা উক্ত আদিশূরের সমসাময়িকও ছিলেন না। আদিশূরের অভ্যুদয় বারশত বর্ষ পূর্ব্বে, কিন্তু বর্ত্তমানে কায়স্থ কুলীনগণের ২৭।২৮ পর্য্যায় চলিতেছে। একশত বৎসরে ৩ পুরুষ ধরিলেও ৯০০ বৎসরের বেশী হয় না।

(গৌড়ে) ১ম আদিশূরের পরে রাঢ়দেশে ভূশূর, ক্ষিতিশূর এবং অবনীশূর রাজত্ব করেন। অবনীশূরের পুত্র ধরণীশূর আদিত্যশূর নাম গ্রহণ করিয়া ৮৭১ হইতে ৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর রাঢ়ে সিংহেশ্বরে রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়েও পঞ্চজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু তাঁহারাও মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি নহেন, মকরন্দাদির আবির্ভাব ইহারও পরে হয়।

রাজা হেমন্তসেনের পুত্র এবং বল্লাসনের পিতা বিজয় সেন বঙ্গের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রকৃত রাজধানী সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। যাহা হউক ১ম আদিশূরের ন্যায় তিনিও ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়াছিলেন। উহা ৯৯৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দের কথা। ঐ সময়ে পঞ্চকায়স্থও আগমন করিয়াছিলেন, আধুনিক ঘটকগণের মতে তাঁহারাই মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ ও পুরুষোত্তম দত্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদিশূর ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উপাধি মাত্র। ১ম আদিশূরের ন্যায় বিক্রমশালী রাজা বিজয়সেনেরও অন্য নাম আদিশূর হওয়া অথবা পরবর্ত্তীকালের ঘটকগণ কর্ত্তৃক তাঁহার আদিশূর নামে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে।

CamScanner

কাণ্যকুব্জকে অনেকে কোলাঞ্চ মনে করেন, কিন্তু নগেন বাবু বলেন, প্রাচীন কোন গ্রন্থে, শিলালিপি বা তাম্রশাসনে কাণ্যকুব্জের নামান্তর কোলাঞ্চ দেখা যায় না। কোলগণের বাসস্থান কোলাঞ্চল বা কোলাচল সংক্ষেপে কোলাঞ্চরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কোলাঞ্চল দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে অবস্থিত এবং ঐ স্থান কর্ণাটক প্রদেশের অংশ। চালুক্য রাজগণের সময়ে যাহারা কর্ণাটক হইতে গৌড় বা রাঢ়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে কোলাঞ্চ হইতে আগত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থকারগণ ভূলবশতঃ তাহাকে কাণ্যকুব্জের সহিত একত্র করিয়াছেন বলিয়া কোলাঞ্চ বলিলে অনেকে কাণ্যকুব্জ বলেন। আদিশূর জয়ন্তের সময় যাহারা গৌড়ে আগমন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত কাণ্যকুব্জবাসী ছিলেন।*

দশরথ গুহের স্থানে বিরাটের নাম কেহ কেহ করিয়া থাকেন। বীরগুণ নামক এক নৃপতি কোটদেশে রাজত্ব করিতেন। এই বীরগুণ এবং বিরাটগুহ একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নহে।† এক জীর্ণ বঙ্গজ কুলগ্রন্থে লিখিত আছে ৯৯৪ শকে বিজয় সেনের রাজসভা হইতে আমন্ত্রণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ বিরাট রাজার নিকট গেলে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি যাইব না, আমার পৌত্রকে পাঠাইয়া দিতেছি।" (তাঁহার না যাওয়ার কারণ তিনি এক সময় বিজয় সেনের নিকট পরাজিত হন) যাহা হউক, পৌত্র দশরথ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সেন সভায় গমন করেন। কিন্তু তিনি রাজসভায় হাস্যাস্পদ হন, এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইয়া সামল বর্ম্মার সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। বিজয় সেনের সময়ে কায়স্থদের মধ্যে ৭জন কৌলীন্য প্রাপ্ত হন।

ঘটক নন্দরাম ভরতকে বংশশূন্য করিয়াছেন, কিন্তু মতান্তরে ভরতের

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪।৩১৫।

বংশেই প্রতিথযশা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয়। ভরতের পুত্র পীতাম্বর, তাঁহার পুত্র শাক্রী। শাক্রীর পুত্র তপন, তপনের পুত্র শঙ্কর, তৎপুত্র আশ, আশের পুত্র গজপতি, তাঁহার পুত্র ছকড়ি, ছকড়ির পুত্র রামচন্দ্র গুহ নিয়োগী, তাঁহার পুত্র ভবানন্দ গুহ মজুমদার, ভবানন্দের পুত্র রাজা বিক্রমাদিত্য এবং বিক্রমাদিত্যের পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্য ; * বিরাট হইতে প্রতাপাদিত্য ১৫শ পর্য্যায়।

পরিশিষ্ট।

(গ)

গ্রন্থকারের বংশ পরিচয়।

(শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার, বি, এ, লিখিত)

সুপ্রসিদ্ধ মাহীনগরের বসুবংশেরই এক ধারা যশোহরের অন্তর্গত ডোঙ্গাঘাটায় আসিয়া 'ডোঙ্গাঘাটার বসু' নামে খ্যাত হয়েন। প্রথমে আমরা সহস্ররামের নাম প্রাপ্ত হই, সম্ভবতঃ তিনিই প্রথমে মহেশ্বর-পাশা গ্রামে আগমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র—গুরুপ্রসাদ, রঘুনাথ, মনোহর ; মনোহরের পুত্রসন্তান ছিল না, মাত্র দুই কন্যা ছিল। গুরু-প্রসাদের চারি পুত্র—গঙ্গাপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ, গোপাল এবং প্রাণনাথ। † প্রাণনাথের বংশ বাঁশগ্রামে বাস করিতেছেন। গোপালের পুত্র সন্তান ছিল না, মাত্র দুই কন্যা। ভবানীপ্রসাদ নিঃসন্তান। গঙ্গা-প্রসাদের পুত্র দেবীপ্রসাদ, তাঁহার পুত্র উমেশচন্দ্র। তিনি বেশ

---

* কায়স্থ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৩৫, পৃষ্ঠা ১৫৭।

† এই পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সামান্য ভ্রমপ্রমাদ আছে। পুস্তক ছাপা হইয়া গেলে অন্য স্থান হইতে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে।—গোপাল।


মাঘ, ১৩৩৪।

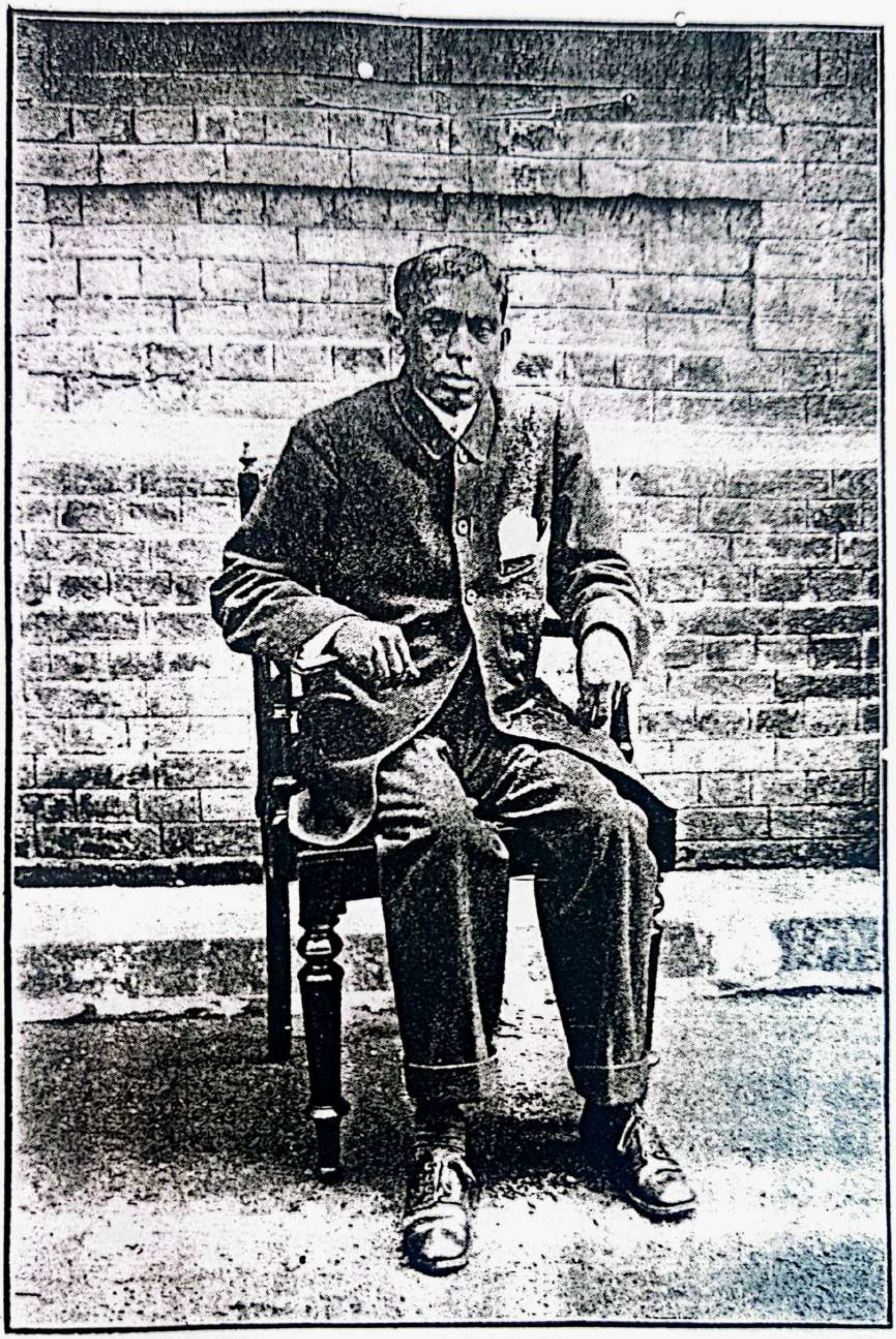
অমায়িক এবং সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। অপরাহ্ণে কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ পাঠ তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। আগ্রহ চিত্তে ইহা শুনিবার জন্য পাড়ার প্রাচীনাগণ তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন। উমেশচন্দ্রের ৭ পুত্র, এইক্ষণে ৫ জন বর্ত্তমান। ইন্দুভূষণ, বঙ্কবিহারী ও জিতেন্দ্রনাথ রেল বিভাগে চাকরী করেন। যোগেন্দ্রনাথ খানখানাপুরে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা ব্যবসা করেন। শরচ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাপদ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া রেলবিভাগে চাকরী করিতেছেন। উমেশচন্দ্রের মৃত মধ্যমপুত্র শশিভূষণ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন, ৬ষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ রেল বিভাগে কাজ করিতেন।

সহস্ররামের অন্যতম পুত্র রঘুনাথের পুত্র নীলমণি। তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র শীতল ও নিবারণ। নিবারণচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও তৎকালে গ্রামের মধ্যে বুদ্ধিবিবেচনা এবং অন্যান্য সামাজিক গুণের জন্য যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। নিবারণচন্দ্রের দুই বিবাহ, জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বসন্তকুমারীর গর্ভে ৬ পুত্র—কেশব, শ্রীশ, সতীশ, ভূপেন্দ্র, খগেন্দ্র, পঞ্চানন এবং এক কন্যা সুভাষিণী। কনিষ্ঠা উত্তমাসুন্দরীর গর্ভে দুই পুত্র, উপেন্দ্র ও অশ্বিনী এবং তিন কন্যা—সরলা, খোকন ও সুশীলা। পঞ্চানন, সুভাষিণী ও খোকন অতি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভূপেন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন কিন্তু পাঠ্যাবস্থাতেই মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন এবং শিক্ষকমণ্ডলীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়া পরলোক গমন করেন। কেশব ও উপেন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত তৎকালের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে E. B. R. Examiner of Accounts আফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন, এবং পরে ডাক বিভাগে প্রবেশ করিয়া দ্বারভাঙ্গা, মুজাফরপুর, প্রভৃতি জায়গায় অনেকদিন

পর্য্যন্ত কার্য্য করেন ; ডাকবিভাগে ছুটি পাওয়া দুষ্কর তাহাতে দূরদেশে থাকার দরুণ বাড়ীতে আসা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ায় তিনি নিজ চেষ্টায় বাঙ্গালা বিভাগে বদলী হয়েন। এখানে যশোহর ও খুলনা জেলার ম্যালেরিয়া প্রধান নানা স্থানে অবস্থিতির জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভগ্ন হয় এবং বহুদিন রোগভোগের পর তিনি ইং ১৯১৪ সালে অকালে দেহত্যাগ করেন। তিনি পরোপকারী এবং সদন্তঃকরণ বিশিষ্ট ছিলেন। সাহিত্যালোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার এক পুত্র বিজয় ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

এস্থলে সতীশচন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার আবশ্যকতা অনুভব করি।

সতীশচন্দ্র ১২৮৭ সালের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন, গ্রামের উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয় হইতে ইং ১৮৯৩ সালে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখনকার নিয়ম ছিল উচ্চপ্রাথমিক বৃত্তি ভোগ করিতে হইলে মধ্যবাঙ্গালা বা মধ্য-ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতে হইত ; সেজন্য তিনি ঘাটভোগের মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হন। তৎকালে এই গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানকার হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। ঘাটভোগ স্কুল হইতে ইং ১৮৯৭ সালে পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৩ বৎসরের জন্য মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ৩য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েন। ইং ১৯০১ সালের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা দুর্গাচরণ লাহা বৃত্তি পাইয়া রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হন। তখন পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি সংস্কৃত পড়াইতেন; ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হারাণবাবু প্রভৃতি ঐ কলেজে



শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু [পৃষ্ঠা ৮০]

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য)

অধ্যাপনা করিতেন। ইং ১৯০৩ সালে সতীশচন্দ্র রিপণ কলেজ হইতে এফ্., এ, পাশ করেন।

ইহার পর অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাঁহার আর অধিক পড়াশুনা হয় নাই। অস্থায়ীভাবে নানা আফিসে নানা কার্য্য করার পরে Board of Revenue, Lower Provinces আফিস হইতে Stipendiary apprenticeএর offer পাইয়া কিছুকাল কার্য্য করিবার পর Govt. of India, Secretariate Clerkship Examination পাশ করেন। Imperial Record Dept.এ প্রথমতঃ ৫০৲ টাকা বেতনের এক অস্থায়ী পদ গ্রহণ করেন। ইং ১৯০৫ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে তিনি এখানে প্রবেশ করেন এবং ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে confirmationএর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ৭৫৲ টাকা বেতন হয়। তিনি সেই অবধি এই বিভাগে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, মাঝে যুদ্ধের সময় কিছুদিন Director of Industries আফিসে চাকুরী পাইয়া সেখানে যান, কিন্তু কিছুদিন পরেই পুনরায় Record Dept.এ ফিরিয়া আসেন। ইং ১৯২৬ সালে দিল্লী আফিসে বদলী হইয়া যা , সেখান হইতে ১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। এখন তাঁহার বেতন ২৬০৲ টাকা। দৌলতপুর স্কুলে পাঠকালেই তিনি এই গ্রামের ৺দেবনাথ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভের এক পুত্র—প্রফুল্ল—বর্ত্তমান, কিন্তু এই স্ত্রী অকালে কলেরারোগে পরলোকগমন করিলে তিনি বাসাবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ নাগবংশীয় খুলনা কালেক্টরী তদানীন্তন Treasurer বাবু বিপিন-বিহারী নাগের তৃতীয়া কন্যা সুরবালাকে বিবাহ করেন; এই স্ত্রীর গর্ভজাত ৩ কন্যা—রমা, রাধা ও কমলা—বর্ত্তমান।

নানা প্রতিকুল অবস্থায় পড়িয়া সতীশচন্দ্র একমাত্র নিজের অধ্যবসায় ও চরিত্রগুণে সর্ব্ববিষয়েই অভ্যুদয় লাভ করিতে পারিয়াছেন।

CamScanner

কলিকাতায় তাঁহার সহিত একসঙ্গে কিছুদিন বাস করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং সাধ্যগত পরোপ-কারের প্রবৃত্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। স্বর্গীয় মহাত্মা ভোলানন্দ গিরিমহারাজের নিকট হইতে তিনি ছাত্রাবস্থাতেই দীক্ষা লাভ করেন। সদগুরুর কৃপায় তাঁহার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে, সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইব।

অশ্বিনীকুমার আরারিয়ার উকিল। তিনি ৺নিবারণচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত ২য় পুত্র। তিনিও বাল্যকাল হইতে প্রতিভাবান; উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় জেলার মধ্যে ২য় স্থান এবং ঘাটভোগ স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। পরে এণ্ট্রান্স ও এফ্, এ, পরীক্ষায় যথাসময়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আইন অধ্যয়ন করেন এবং ইং ১৯০৯ সালে প্লিডারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। ইং ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ মধ্যে জেনেরাল পোষ্টআফিসে এক মাস, টেলিগ্রাফ চেক আফিসে ৬ মাস এবং মিলিটারী একাউণ্ট আফিসে তাহাদের 6th Grade Accountship Examination পাশ করিয়া প্রায় এক বৎসর কাজ করেন। এখানে চাকুরী করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় করিয়ার জন্য স্বেচ্ছায় কার্য্যে ইস্তফা দেন। ইহার পরে কয়েকমাস রঘুনাথপুর এণ্ট্রান্স স্কুলে ২য় শিক্ষকের কাজ করিয়া ইং ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে রাঁচিতে ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি এখানে বেশীদিন থাকিতে পারেন নাই, ইহার পরে নড়াইল কিছুদিন থাকিয়া ইং ১৯১২ সালের জুলাই মাসে আরারিয়ায় প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করেন। তিনি সেই সময় হইতে আরারিয়াতেই আইন ব্যবসা চালাইতেছেন, এবং আরারিয়ার একজন প্রসিদ্ধ উকিল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

অশ্বিনী বাবুর বর্ত্তমানে ৯টী সন্তান। ৫ পুত্র—অনিল কুমার, শিব চন্দ্র, অজিতকুমার, কালীপদ, গোরা এবং ৪ কন্যা—রেণু, বেণু, বীণা ও সদ্যপ্রসূতা খুকী। অশ্বিনীবাবু খাজুরা নওয়াপাড়ার সুবিখ্যাত রায়চৌধুরী বংশে খুলনা ও পরে যশোহর কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ৺মণীন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলনলিনীকে বিবাহ করেন।

অশ্বিনীবাবুর নাম পূর্ব্বে কখন কখনও শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই মাত্র জানিতাম যে তিনি আমাদের "খগেনদার" দাদা এবং আরারিয়ার একজন 'নামকরা' উকিল। এই বার বড়দিনের বন্ধের শেষভাগে কলিকাতার মেসে একজন কৃশকায় ভদ্রলোক আমার নাম করিয়া আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কোথায়? আমি পরিচয় দিয়াছি, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যখন শুনিলাম যে তিনিই সেই অশ্বিনী বাবু তখন একটু আশ্চর্য্যই হইলাম। শুনিয়াছিলাম অশ্বিনী বাবু একজন বড় উকিল। কিন্তু তাঁহার সেই অতি সাধারণ বেশভূষা, তাঁহার সেই সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর ভাব দেখিয়া তাহাকে একজন বড় উকিল বলিয়া ধারণা করা আমার পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর সমস্ত দিন ধরিয়া বহু আলাপ পরিচয় হইল—তিনিও বহুকথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও বহুকথা বলিলাম। অনেক আলোচনা হইল—গ্রাম, শিল্প, স্বাস্থ্য, সমাজ সর্ব্ববিষয়েই বহু আলোচনা হইল, সারাটি দিন বড়ই আনন্দে কাটিল। সেই এক দিনেই অশ্বিনী বাবুর সম্যক পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাঁহার চিত্তের উদারতা, অন্তঃকরণের তেজস্বিতা এবং চরিত্রের মাধুর্য্য আমাকে সত্যই অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। অর্থ অনেকেই উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, প্রতিষ্ঠাও অনেকে লাভ করিয়া থাকেন এবং কার্য্যক্ষেত্রেও অনেকে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন কিন্তু হৃদয়ে যদি প্রীতি এবং ঔদার্য্য না থাকে তাহা হইলে তাহাতে

কিছুই ফলোদয় হয় না। অশ্বিনী বাবুর অর্থ শুধু ভোগার্থে নহে, পরহিতে তাহার অনেকাংশই ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই স্বার্থান্ধ যুগে নিজের বিপন্ন আত্মীয় বন্ধুকেও লোকে ফিরিয়া দেখে না, কিন্তু আমি জানি এই সমস্ত বিষয়ে অশ্বিনীবাবু একান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ। তাঁহার অর্থে বহুব্যক্তিরই উপকার হইয়া থাকে। আত্মশক্তিতে কি করিয়া বড় হওয়া যায় এবং বড় হইয়াও বা কিরূপে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, অশ্বিনী বাবু অনেকাংশেই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

কনিষ্ঠ খগেন্দ্রনাথ আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থকার। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও সাহিত্যিক। বহু পুস্তক লিখিয়া তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার স্থান ইহা নহে। তবে তিনি যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং বহুল পরিমাণে নিন্দা ও অপবাদ গ্লানি অম্লান এবং অক্ষুব্ধচিত্তে বহন করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিতেছেন তাহাতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া উঠে এবং গ্রামের অন্যতম গৌরব হিসাবেও তাঁহারও জীবনী আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে স্থান ইহা নহে। সরলতা এবং নিরহঙ্কারিতায় তিনি জেষ্ঠভ্রাতৃগণেরই অনুরূপ। আমরা একমাত্র মঙ্গলনিলয় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি এই ভাবে দেশের এবং দশের কল্যাণসাধন করিয়া পত্নী ও পুত্রকন্যাগণের সহিত সর্ব্ববিধ শ্রেয়োলাভ করিতে থাকুন। উপস্থিত তাহার ৩ পুত্র ও এক কন্যা। *

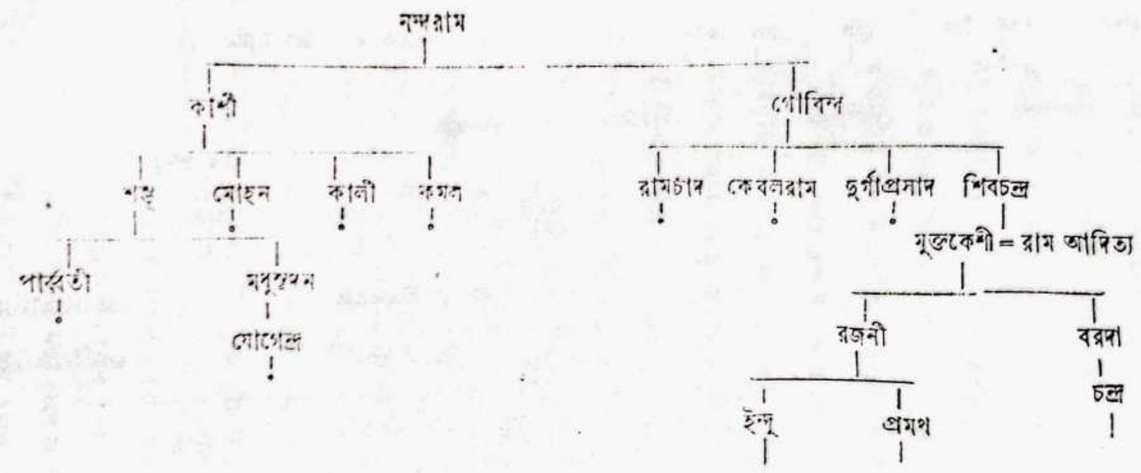
---

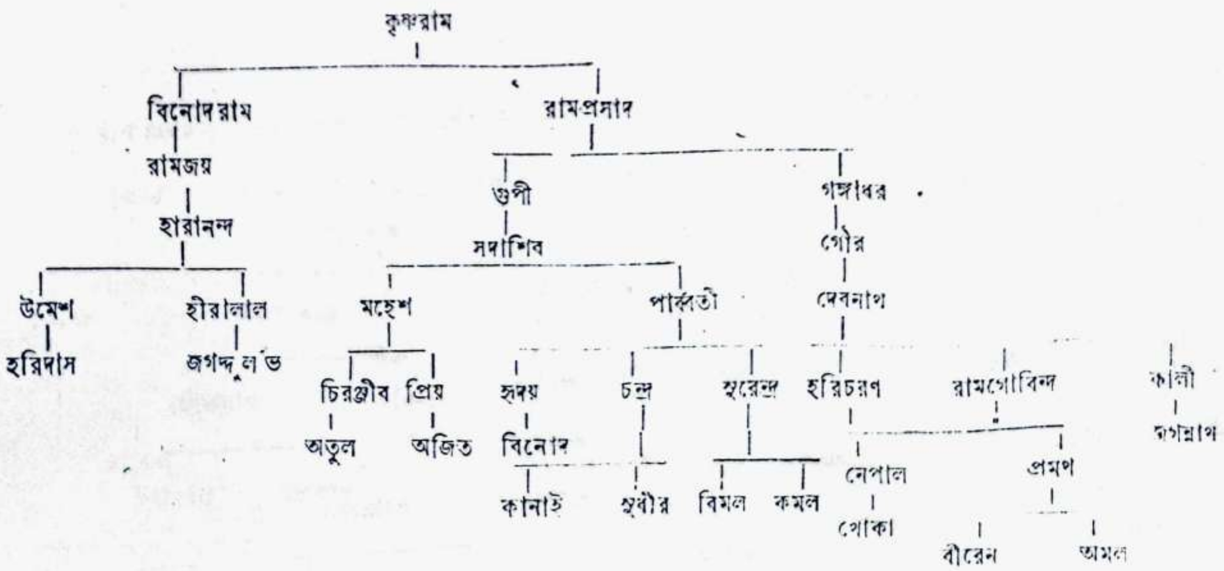
* সমরেন্দ্র নাথ (জন্ম, ২৩শে পৌষ, ১৩২১, বৃহস্পতিবার)
অমরেন্দ্র নাথ (জন্ম, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৩০, সোমবার)
শেফালিকা (জন্ম, ২২শে চৈত্র, ১৩৩২, সোমবার)
মনুজেন্দ্র নাথ (জন্ম, ১৯শে চৈত্র, ১৩৩৫, মঙ্গলবার)

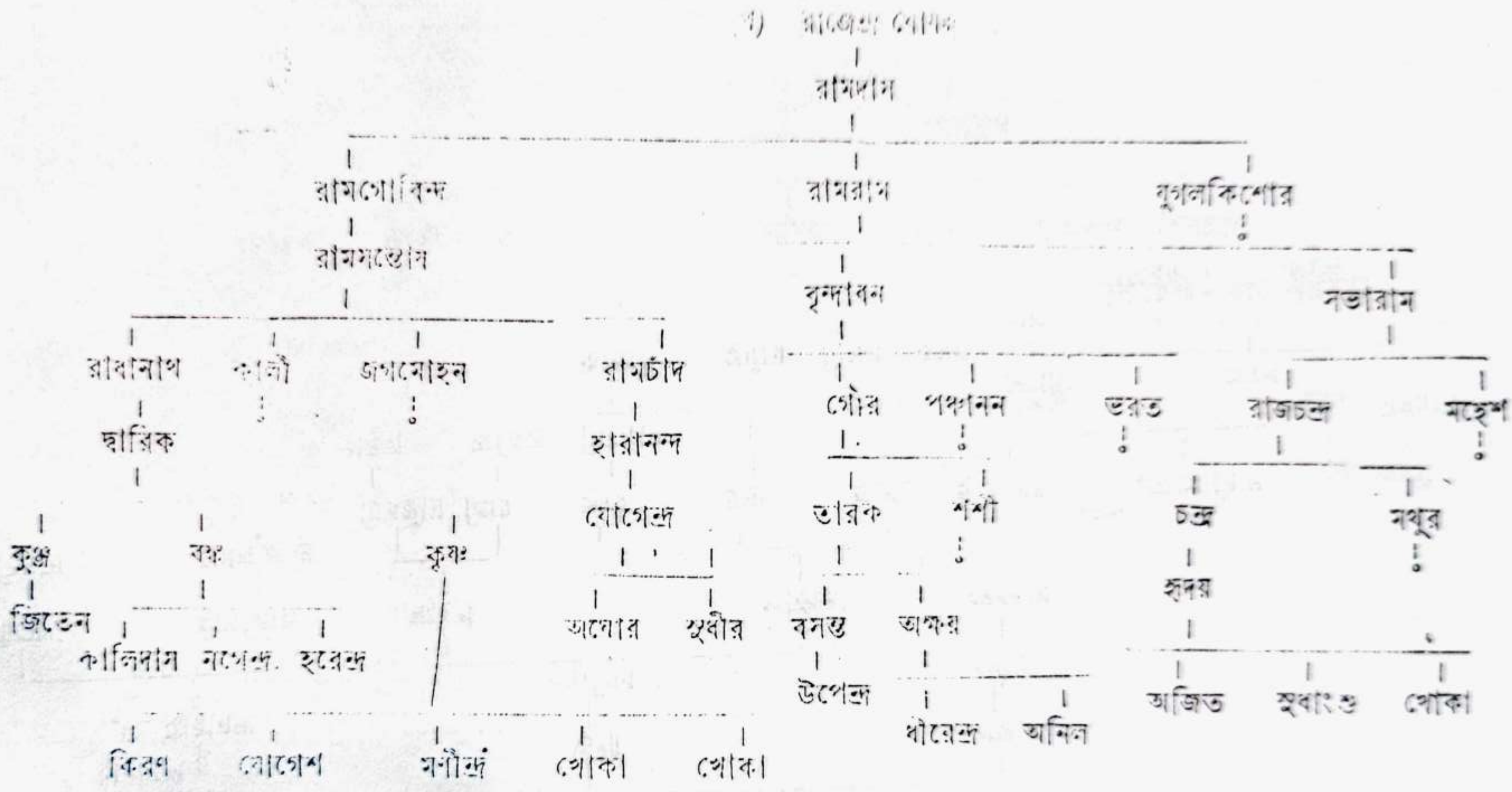
বংশাবলী (Geneology)

মহেশ্বর ঘোষের বংশ।

(ক) মহেশ্বর ঘোষ
- নীলকমল
  - রামকমল
    - রামসুন্দর
      - রামগোপাল
        - রামরাম
          - মাতুলাল
            - গোলোক
              - ০
          - রামকিঙ্কর
            - কনকচন্দ্র
              - রাম
                - তিন. কন্যা
              - লক্ষ্মণ
                - কন্যা
              - ভরত
                - রাজেন্দ্র
                  - স্মৃতিপ্রিয়
                  - শক্তিপদ
                  - খোকা
                - সুরেন্দ্র
                  - শান্তিশরণ?
                  - খোকা
                  - [illegible]
                - নগেন্দ্র?
                  - ননী
                - শৈলেন?
                  - [illegible]
                  - [illegible]
                  - [illegible]
        - নন্দরাম
        - কৃষ্ণরাম

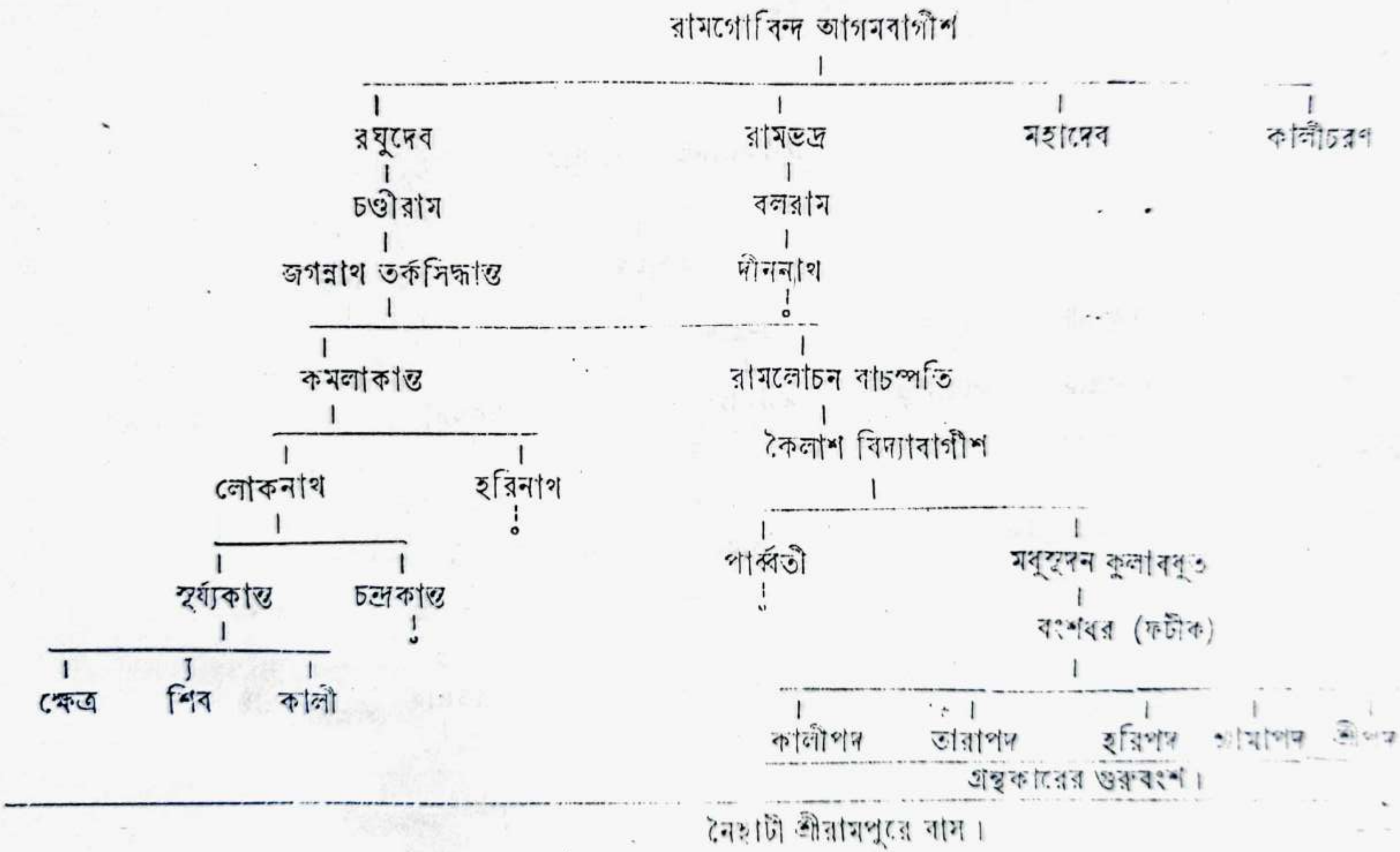

নন্দরাম
কাশী
গোবিন্দ
শম্ভু
মোহন
কালী
কমল
রামচাঁদ
কেবলরাম
দুর্গাপ্রসাদ
শিবচন্দ্র
পার্ব্বতী
মধুসূদন
যোগেন্দ্র
মুক্তকেশী = রাম আদিত্য
রজনী
বরদা
চন্দ্র
ইন্দু
প্রমথ

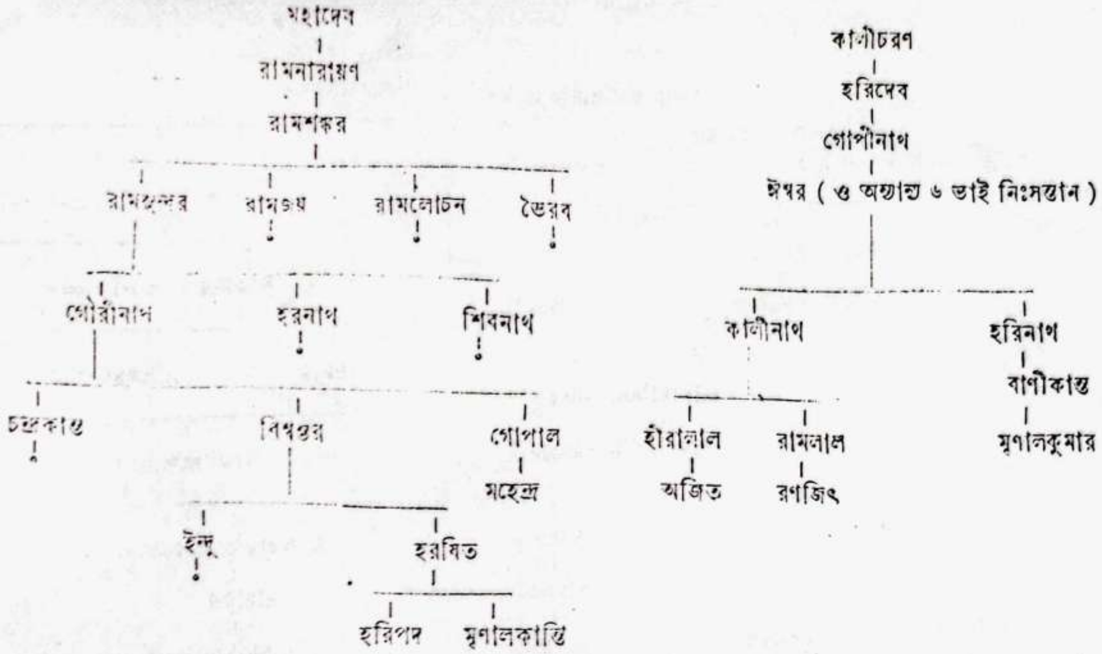

কৃষ্ণরাম
বিনোদরাম
রামপ্রসাদ
রামজয়
গুপী
গঙ্গাধর
হারানন্দ
সদাশিব
গৌর
উমেশ
হীরালাল
মহেশ
পার্ব্বতী
দেবনাথ
হরিদাস
জগদ্দুর্লভ
চিরঞ্জীব
প্রিয়
হৃদয়
চন্দ্র
সুরেন্দ্র
হরিচরণ
রামগোবিন্দ
কালী
অতুল
অজিত
বিনোদ
নেপাল
প্রমথ
জগন্নাথ
কানাই
সুধীর
বিমল
কমল
খোকা
বীরেন
অমল



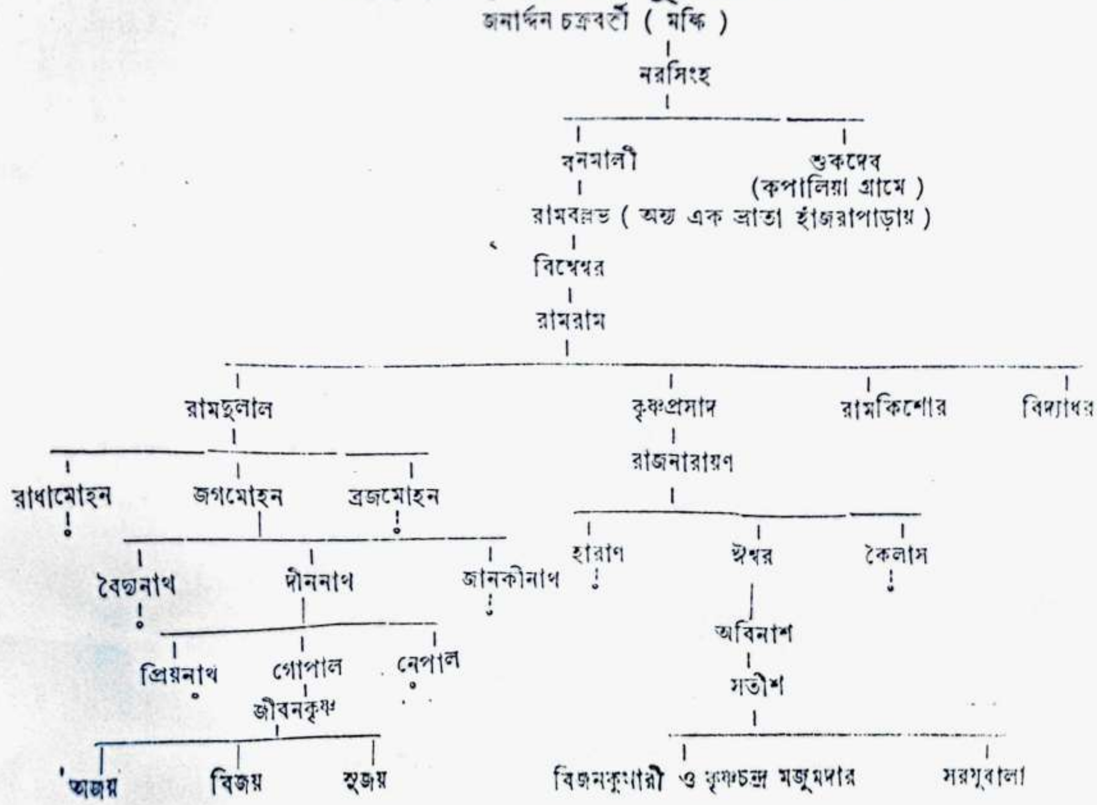
* ইনি মহেশ্বর ঘোষের সন্তান বলিয়া কথিত, মতান্তরে তাঁহার জ্ঞাতি ; প্রমাণ পৃথক গুরুপুরোহিত—গ্রন্থকার।

মহেশ্বর ঘোষের গুরুবংশ।

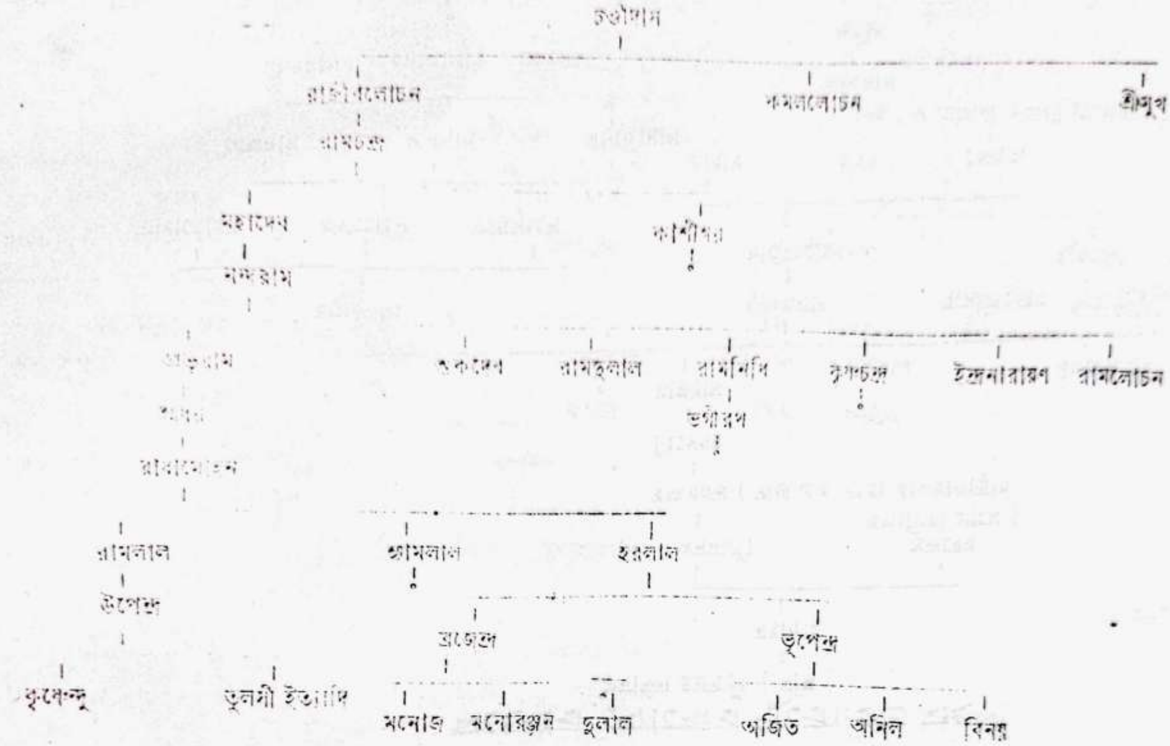


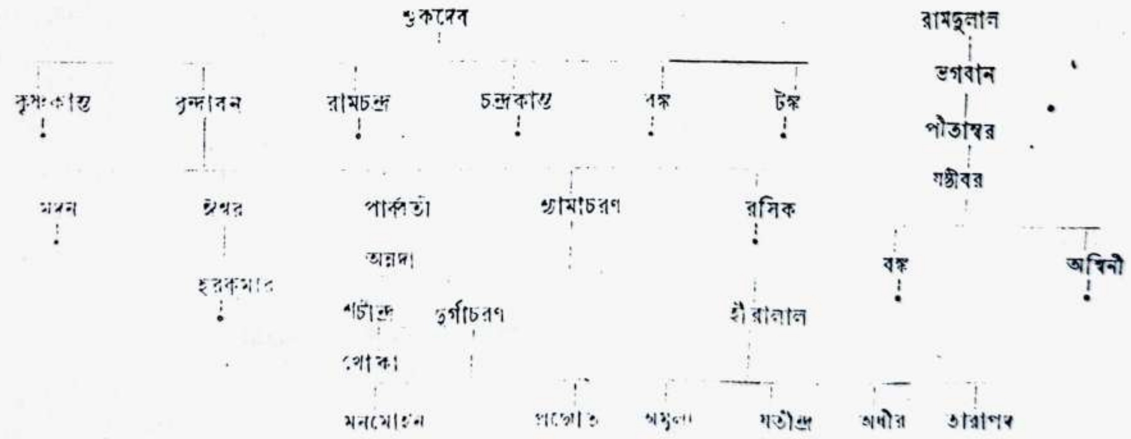


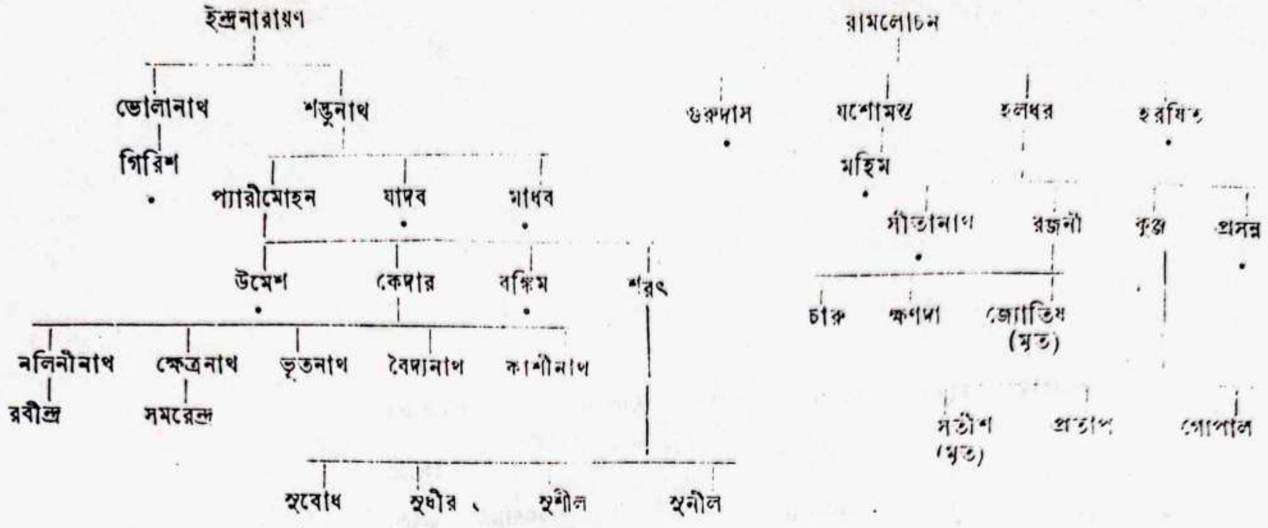
মহেশ্বর ঘোষের পুরোহিত বংশ

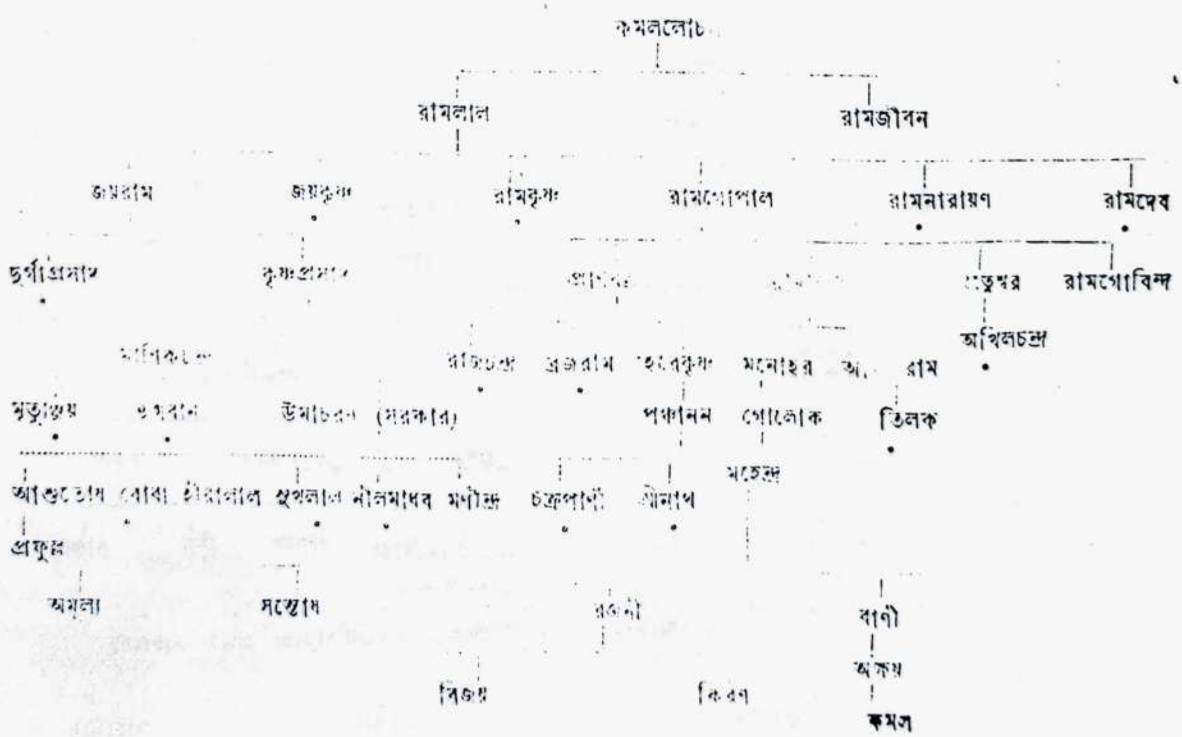


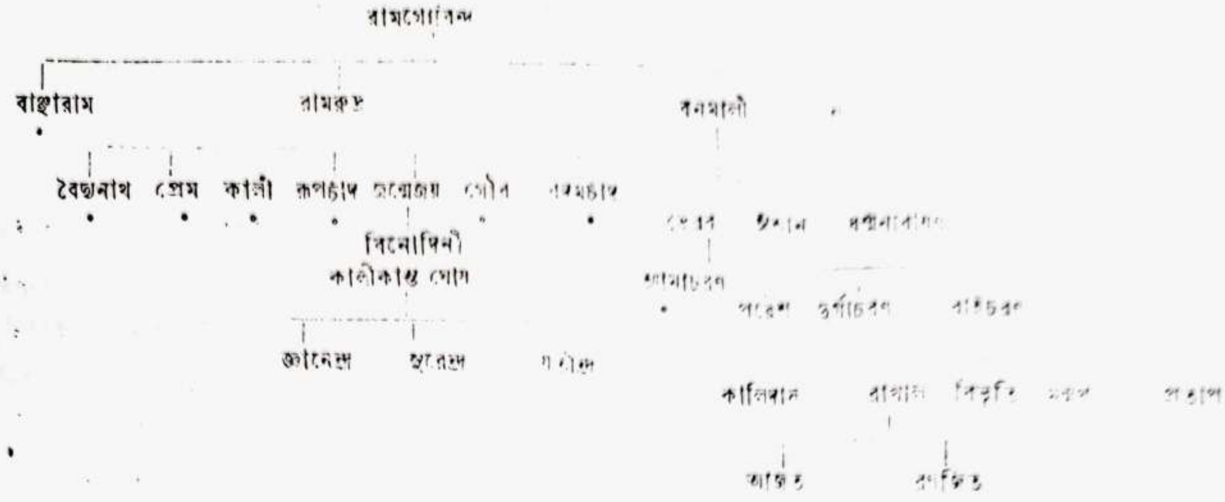
গুহ মজুমদার বংশ।

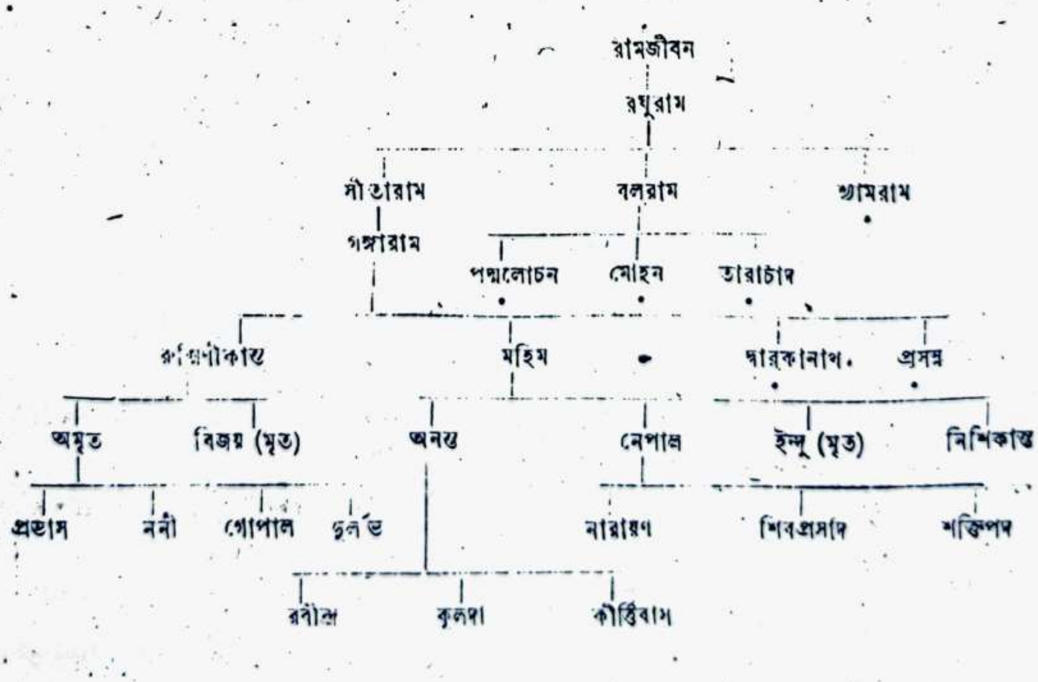

রাজীবলোচন
কমললোচন
শ্রীমুখ
রামচন্দ্র
মহাদেব
কাশীশ্বর
নন্দরাম
শুকদেব
রামদুলাল
রামনিধি
কৃষ্ণচন্দ্র
ইন্দ্রনারায়ণ
রামলোচন
ভগীরথ
রামলাল
শ্যামলাল
হরলাল
উপেন্দ্র
ব্রজেন্দ্র
ভূপেন্দ্র
কৃষ্ণেন্দু
তুলসী ইত্যাদি
মনোজ
মনোরঞ্জন
দুলাল
অজিত
অনিল
বিনয়

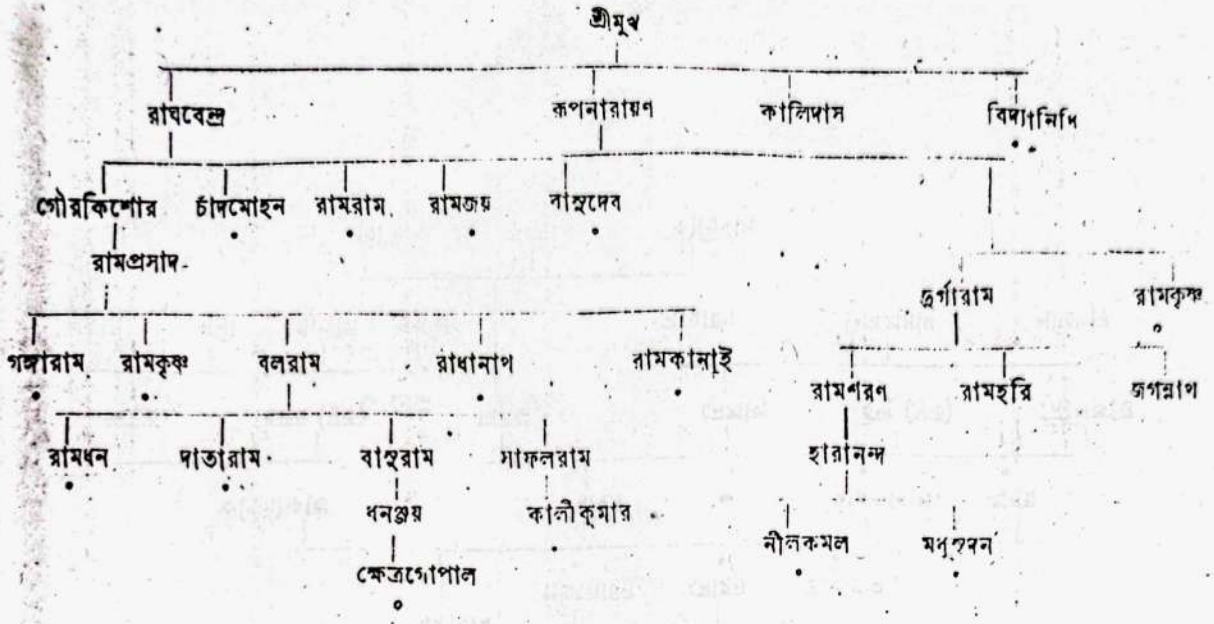

শুকদেব
রামদুলাল
ভগবান
কৃষ্ণকান্ত
বৃন্দাবন
রামচন্দ্র
চন্দ্রকান্ত
বঙ্ক
টঙ্ক
পীতাম্বর
ষষ্ঠীবর
মদন
ঈশ্বর
পার্ব্বতী
শ্যামাচরণ
রসিক
অন্নদা
বঙ্ক
অশ্বিনী
হরকুমার
শচীন্দ্র
দুর্গাচরণ
হীরালাল
খোকা
মনমোহন
সতীন্দ্র
অধীর
তারাপদ

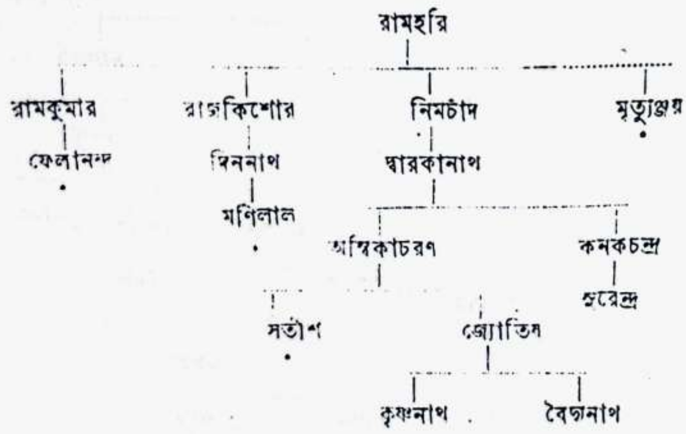

ইন্দ্রনারায়ণ
ভোলানাথ
শম্ভুনাথ
গিরিশ
প্যারীমোহন
যাদব
মাধব
উমেশ
কেদার
বঙ্কিম
শরৎ
নলিনীনাথ
ক্ষেত্রনাথ
ভূতনাথ
বৈদ্যনাথ
কাশীনাথ
রবীন্দ্র
সমরেন্দ্র
সুবোধ
সুধীর
সুশীল
সুনীল
রামলোচন
গুরুদাস
যশোমন্ত
হলধর
মহিম
সীতানাথ
রজনী
কুঞ্জ
প্রসন্ন
চারু
ক্ষণদা
জ্যোতিষ (মৃত)
সতীশ (মৃত)
প্রতাপ
গোপাল


কমললোচন
রামলাল
রামজীবন
জয়রাম
জয়কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ
রামগোপাল
রামনারায়ণ
রামদেব
দুর্গাপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
রামগোবিন্দ
অখিলচন্দ্র
ব্রজরাম
হরেকৃষ্ণ
মনোহর
রাম
মৃত্যুঞ্জয়
উমাচরণ (সরকার)
পঞ্চানন
গোলোক
তিলক
আশুতোষ
বোবা
হীরালাল
সুখলাল
নীলমাধব
মণীন্দ্র
চক্রপাণি
শ্রীনাথ
মহেন্দ্র
প্রফুল্ল
অমূল্য
সন্তোষ
রজনী
বাণী
অক্ষয়
বিজয়
কিরণ
কমল


রামগোবিন্দ
বাঞ্ছারাম
রামকৃষ্ণ
বনমালী
বৈদ্যনাথ
প্রেম
কালী
বিনোদিনী
কালীকান্ত ঘোষ
কালিদাস


রামজীবন
রঘুরাম
সীতারাম
বলরাম
শ্যামরাম
গঙ্গারাম
পদ্মলোচন
মোহন
তারাচাঁদ
মহিম
দ্বারকানাথ
প্রসন্ন
অমৃত
বিজয় (মৃত)
অনন্ত
নেপাল
ইন্দু (মৃত)
নিশিকান্ত
প্রভাস
ননী
গোপাল
নারায়ণ
শিবপ্রসাদ
শক্তিপদ
রবীন্দ্র
কৃষ্ণ
কীর্ত্তিবাস


শ্রীমুখ
রাঘবেন্দ্র
রূপনারায়ণ
কালিদাস
বিদ্যানিধি
গৌরকিশোর
চাঁদমোহন
রামরাম
রামজয়
বাসুদেব
রামপ্রসাদ
দুর্গারাম
রামকৃষ্ণ
গঙ্গারাম
রামকৃষ্ণ
বলরাম
রাধানাথ
রামকানাই
রামশরণ
রামহরি
জগন্নাথ
রামধন
দাতারাম
বাহুরাম
সাফলরাম
হারানন্দ
ধনঞ্জয়
কালীকুমার
নীলকমল
মধুসূদন
ক্ষেত্রগোপাল


রামহরি
রামকুমার
রাজকিশোর
নিমচাঁদ
মৃত্যুঞ্জয়
ফেলানন্দ
দিননাথ
দ্বারকানাথ
মণিলাল
অম্বিকাচরণ
কনকচন্দ্র
সুরেন্দ্র
সতীশ
জ্যোতিষ
কৃষ্ণনাথ
বৈদ্যনাথ


জগন্নাথ
ত্রিলোচন
রামতনু
গোলোক
গৌর
রসিকলাল
পূর্ণচন্দ্র

CamScanner

কা'লরাম

রামশঙ্কর

রামাকঙ্কর রামমোহন শিবপ্রসাদ যুগল কিশোর ভুবন

কেবলরাম

নবকৃষ্ণ মহেশ্বর

পার্ব্বতী প্রাণহরি

হেমন্ত লালচাঁদ

জলধর হলধর সুধাংশু

বেণীরাম

গোকুলরাম কন্দর্প [illegible]

রামচন্দ্র [illegible] [illegible]

যদুনাথ

দুর্গাদাস বিনোদ [illegible] (মৃত)

শচীন্দ্র সৌরীন্দ্র অমরেন্দ্র [illegible]

গিরিধর

কৈলাস সারদা ভবনাথ প্রিয়নাথ
(দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ বসু)

বিপিন ইন্দুভূষণ ভুবন

শৈলেন্দ্র নীতিন্দ্র অনুপম নিরূপম নগেন্দ্র মণীন্দ্র (মৃত) প্রফুল্ল নির্ম্মল বিমল হরিনাথ সুধীর

সুরেন্দ্রনাথ বসু।

পীতাম্বর রাধিকা প্রফুল্ল গোপাল

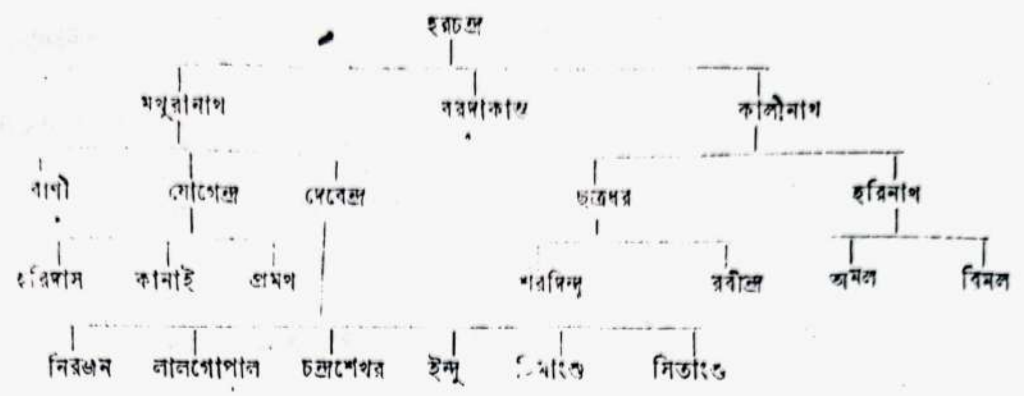
ভবনাথ প্রিয়নাথ

মহানন্দ শশিভূষণ অশ্বিনী মেঘনাদ অটল কেশব [illegible]

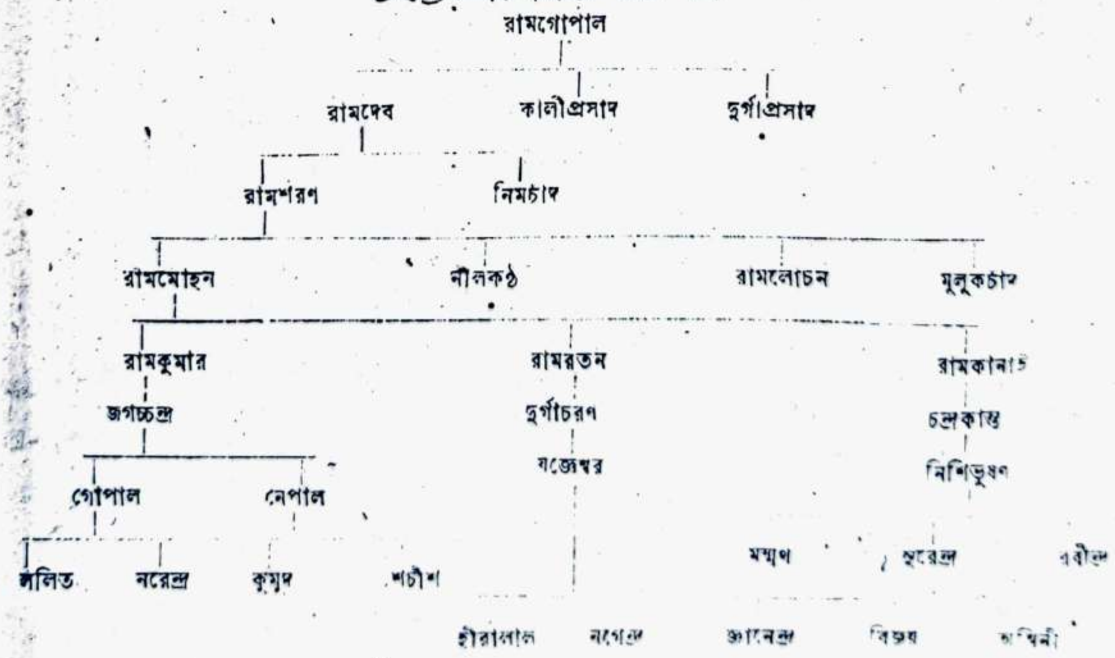
দেবকুমার

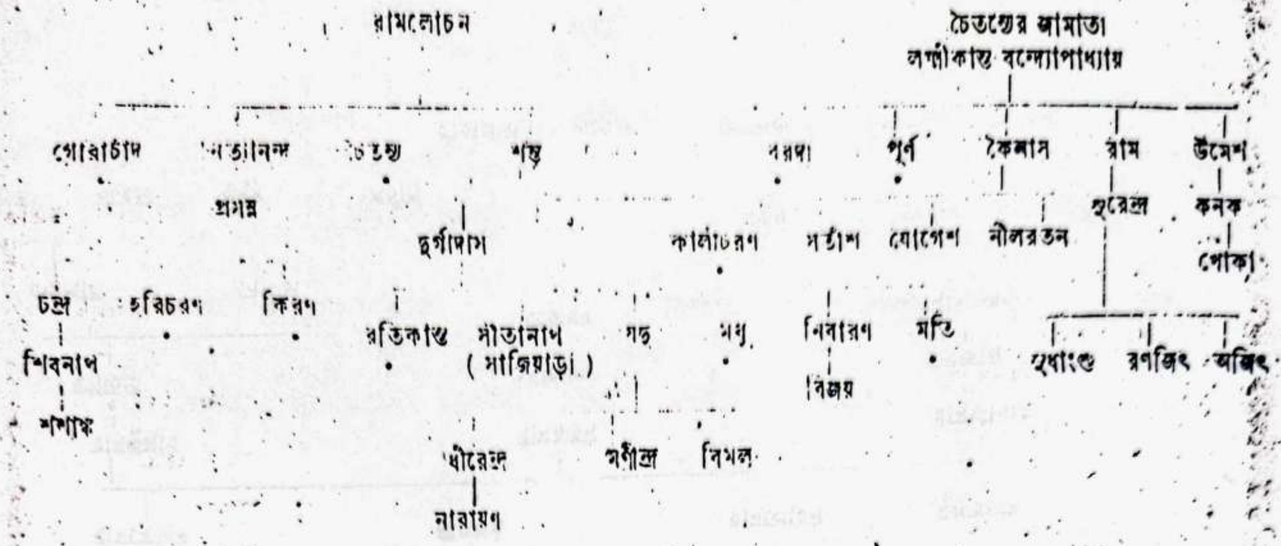
মনোরঞ্জন রাধিকা সুধীর নেপাল বিনয় শচীন্দ্র [illegible] [illegible]

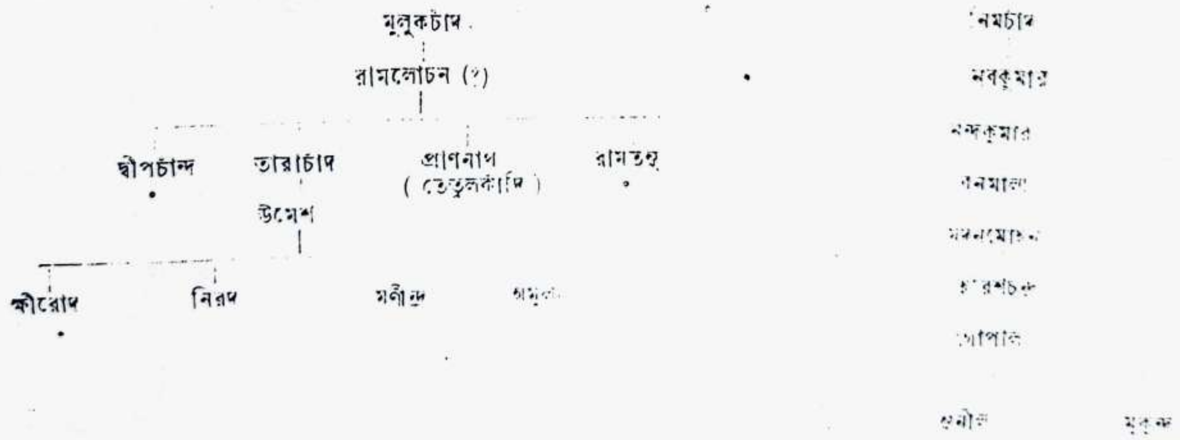
দুলাল রাম নারায়ণ [illegible] [illegible] [illegible]

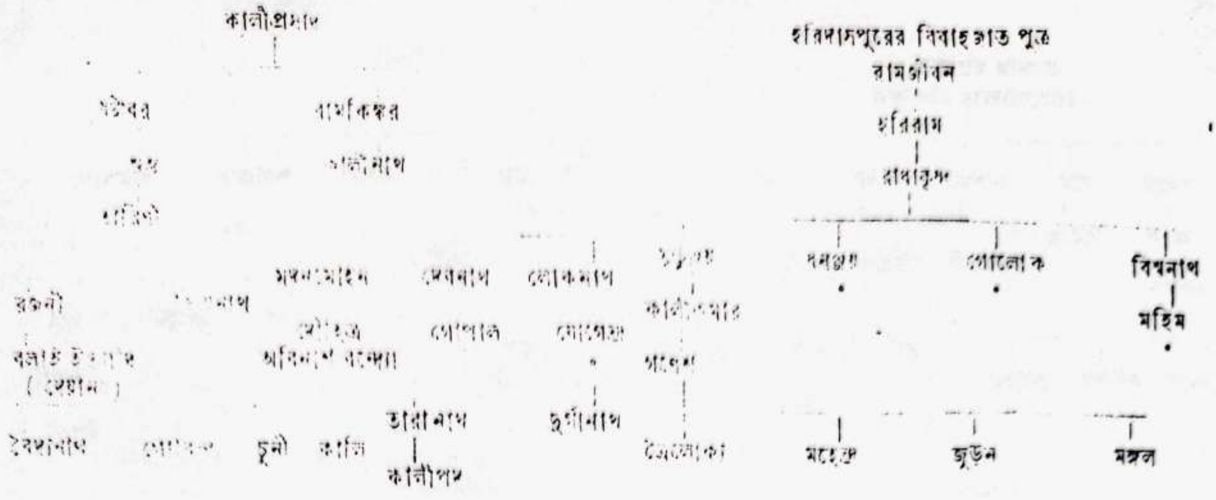

হরচন্দ্র
মথুরানাথ
কালীনাথ
যোগেন্দ্র
দেবেন্দ্র
হরিনাথ
হরিদাস
কানাই
প্রমথ
শরদিন্দু
রবীন্দ্র
অমল
বিমল
নিরঞ্জন
লালগোপাল
চন্দ্রশেখর
ইন্দু
সিতাংশু

চট্টোপাধ্যায় বংশ।

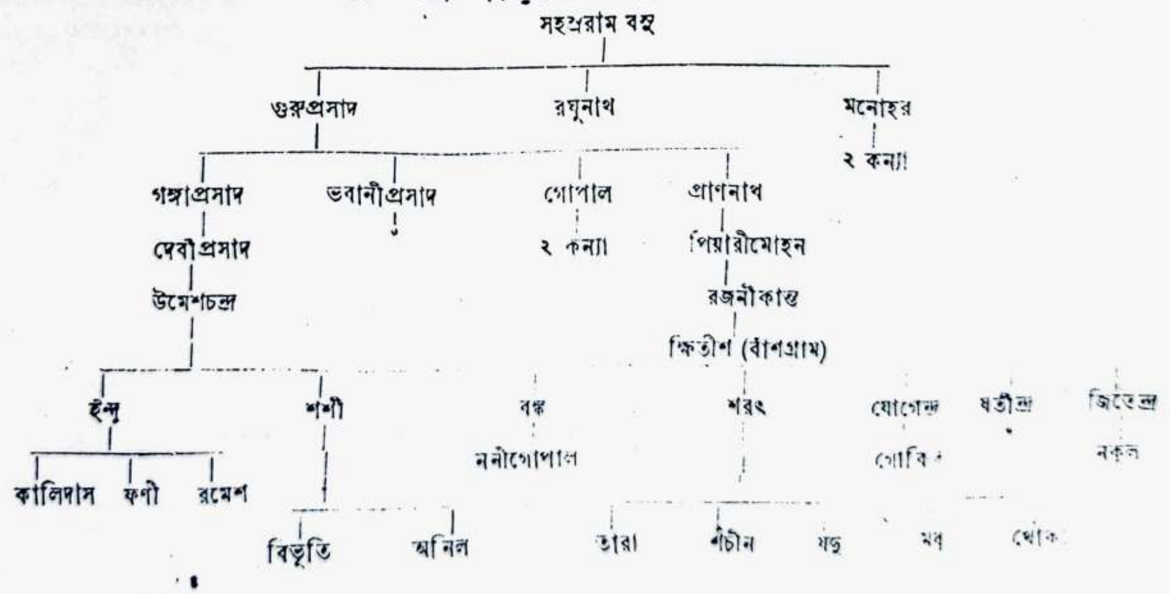

রামগোপাল
রামদেব
কালীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
রামশরণ
নিমচাঁদ
রামমোহন
নীলকণ্ঠ
রামলোচন
মুলুকচাঁদ
রামকুমার
রামরতন
রামকানাই
জগচ্চন্দ্র
দুর্গাচরণ
চন্দ্রকান্ত
গোপাল
নেপাল
যজ্ঞেশ্বর
নিশিভূষণ
ললিত
নরেন্দ্র
কুমুদ
শচীশ
মন্মথ
সুরেন্দ্র
হীরালাল
নগেন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্র

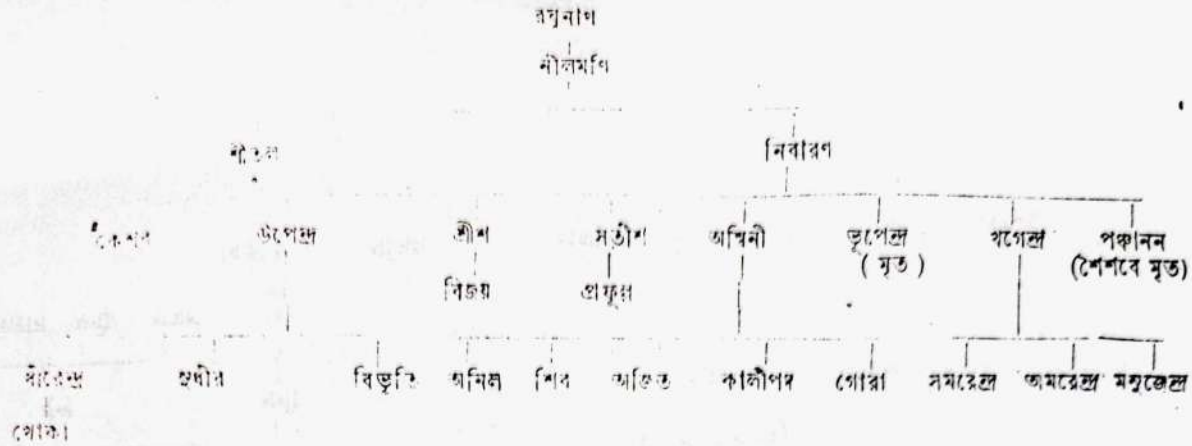

রামলোচন
চৈতন্যের জামাতা
লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
গোরাচাঁদ
নিত্যানন্দ
চৈতন্য
শম্ভু
বরদা
পূর্ণ
কৈলাস
রাম
উমেশ
প্রসন্ন
সুরেন্দ্র
কনক
দুর্গাদাস
কালাচরণ
সতীশ
যোগেশ
নীলরতন
খোকা
চন্দ্র
হরিচরণ
কিরণ
রতিকান্ত
সীতানাথ
(সাজিয়াড়া)
মধু
নিবারণ
মতি
সুধাংশু
রণজিৎ
অজিত
শিবনাথ
বিজয়
শশাঙ্ক
ধীরেন্দ্র
সতীন্দ্র
বিমল
নারায়ণ


মুলুকচাঁদ
রামলোচন (?)
দ্বীপচান্দ
তারাচাঁদ
প্রাণনাথ
(তেতুলকাঁদি)
রামতনু
উমেশ
ক্ষীরোদ
নিরদ
সতীন্দ্র
নন্দকুমার

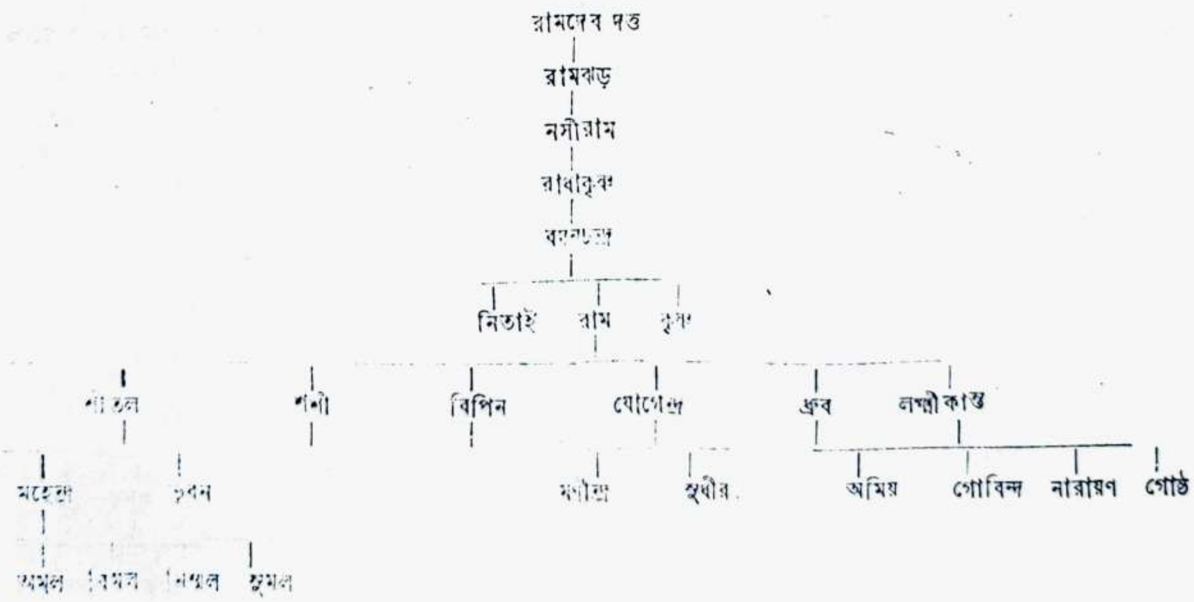


বসুমিত্র পাড়ার বসু বংশ।

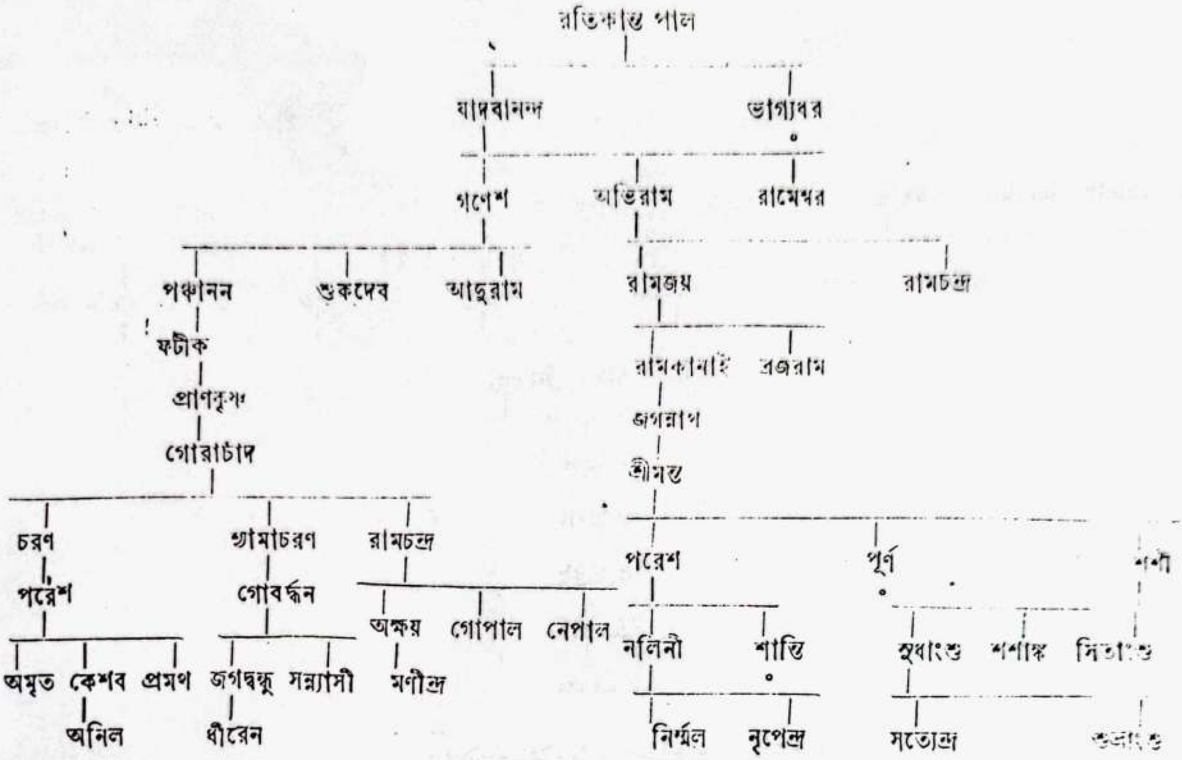



রঘুনাথ
নীলমণি
নিবারণ
উপেন্দ্র
শ্রীশ
সতীশ
অশ্বিনী
ভূপেন্দ্র
(মৃত)
খগেন্দ্র
পঞ্চানন
(শৈশবে মৃত)
বিজয়
প্রফুল্ল
সুধীর
বিভূতি
অনিল
শিব
কালীপদ
গোরা
সমরেন্দ্র
অমরেন্দ্র
মনুজেন্দ্র
খোকা

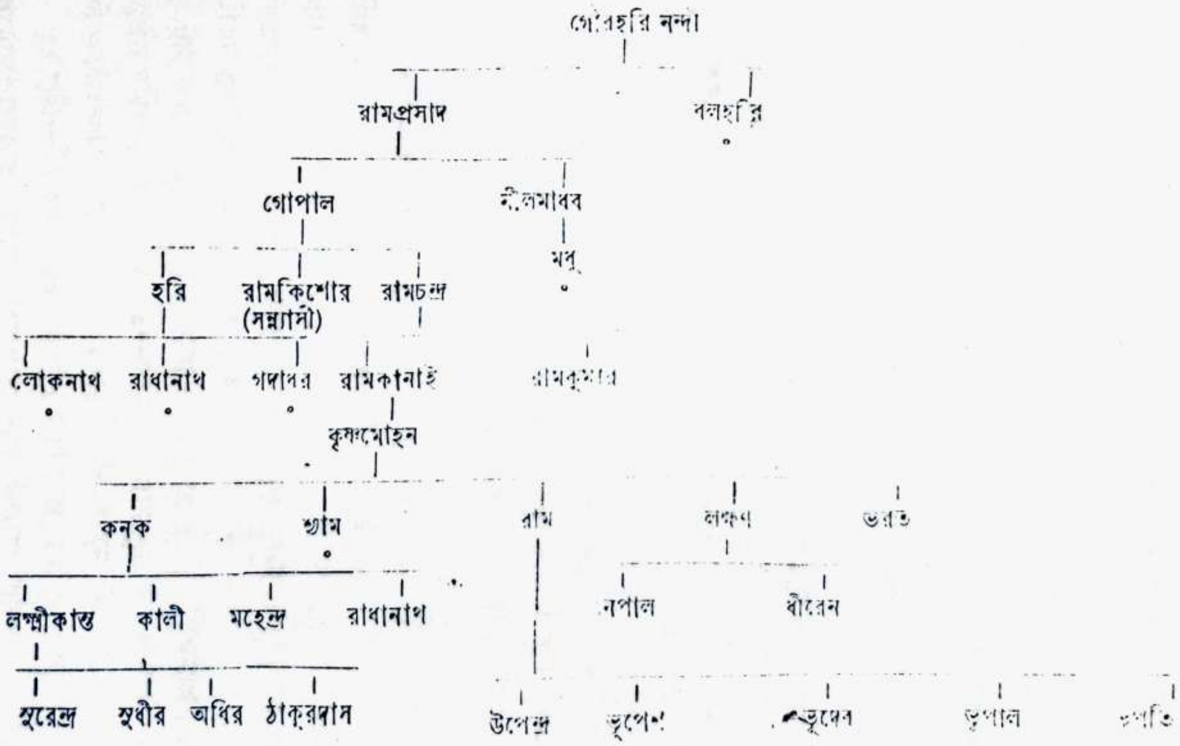
দত্তবংশ (বারুজীবি)


রামদেব দত্ত
রামঝড়
নসীরাম
রাধাকৃষ্ণ
নিতাই
রাম
শশী
বিপিন
যোগেন্দ্র
ধ্রুব
লক্ষ্মীকান্ত
সুধীর
অমিয়
গোবিন্দ
নারায়ণ
গোষ্ঠ
মহেন্দ্র
অমল
সুমল

বারুজীবি পালবংশের কতকাংশ।



নন্দীবংশ (বারুজীবি)



- রামকুমার
  - গোবিন্দ
    - বিশ্বম্ভর
      - হীরালাল
      - সতীশ
      - শশিকান্ত
      - ঠাকুরদাস
    - শীতল °
    - নন্দ
    - কেদার
      - শান্তি
      - বিনোদ
      - ললিত
    - কৃষ্ণ °
    - প্রিয়নাথ
      - পাগল
      - পুলিন

ত্রুটী স্বীকার।

শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া মহেশ্বরপাশার অধিবাসীবৃন্দের পুণ্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমি যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, আজ তাঁহার অপার অনুগ্রহে এবং হিতৈষী মহাত্মগণের কৃপায় তাহা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলাম, কিন্তু পাঠককে আমি যাহা দিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা পারি নাই। ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের জন্য প্রত্যেকের কথা ইহাতে সন্নিবেশ করিব, মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু নানাকারণে পারি নাই, তবুও আজ এই সমাপ্তি পৃষ্ঠায় কয়েকজনের নামোল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

এই পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় ৺হরিচরণ ঘোষের দুই পুত্র, নেপাল ও প্রমথ উল্লেখ করা হইয়াছে নেপাল অল্পবয়সেই স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া অতি সামান্য বেতনে রেল আফিসে প্রবেশ করেন,কিন্তু কঠোর অধ্যবসায় এবং অসাধারণ কার্য্যদক্ষতাগুণে অল্পদিনেই চাকরীজীবনে যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে লাহোর এন্ ডব্ লু রেলে সাবষ্টোরকিপার; পরোপকারে এবং দানশীলতায় তিনি গ্রামের অন্যতম প্রতিষ্ঠান্বিত ব্যক্তি। কনিষ্ঠ প্রমথ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কিছুদিন দৌলতপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু নানা অসুবিধায় পড়িয়া পাঠ ত্যাগ করেন।

২৪ পৃষ্ঠা—অক্ষয়কুমার ঘোষের ৩ পুত্রের মধ্যে দুইজন বর্ত্তমান। কনিষ্ঠ শচীন্দ্র গ্রামের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি আই, এ, প্রথম বিভাগে পাশ করেন কিন্তু বি, এ, পাঠকালে সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অকাল মৃত্যু মহেশ্বর ঘোষের বংশের দুর্ভাগ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই বংশের শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ (পৃঃ ২১) শিবসাগর জেলার অন্তর্গত মরিয়ানী জংসনের ষ্টেশনমাষ্টার, সামান্য অবস্থা হইতে তিনি স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় এই বিভাগে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

৫৫ পৃষ্ঠা—কৈলাসচন্দ্রের ৩ পুত্র সতীশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, নীলরতন। আমোদপ্রমোদের মধ্যে যোগেশচন্দ্রের উল্লেখ আছে; "প্রফুল্লে" জগমণির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, লোকে

আজও তাহা বিস্মৃত হয় নাই। "সরলা" অভিনয়ে প্রমদার ভূমিকা তাঁহার এতই স্বাভাবিক হইত যে এক দিন এক বর্ষীয়সী মহিলা স্থান কাল ভুলিয়া তাহার উদ্দেশে অজস্র গালি বর্ষণ করেন।

৬২ পৃষ্ঠা—শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী মিত্রের পুত্র হরিপদ গ্রামের মেধাবী ছাত্র, তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন কিন্তু সংসারের অসচ্ছলতা বশতঃ আর পড়াশুনা করিতে পারেন নাই।

৯৭ পৃষ্ঠা—মথুরানাথের ৪ পুত্র, যতীন্দ্র, রমেন্দ্র, চারু, প্রফুল্ল। রমেন্দ্র অকালে দেহত্যাগ করেন। প্রফুল্ল রেল বিভাগে কাজ করেন।

১০৭ পৃষ্ঠায় রামজয়ের ৩ পুত্রের মধ্য কমলাকান্তের অন্যতম পুত্র হরচন্দ্র,তাঁহার পুত্র দীননাথ। দীননাথের ৫ পুত্র—যোগেন্দ্র,অমৃত,নবকান্ত, পঞ্চানন, শশী। নবকান্ত ই বি, রেলে ৩০ বৎসর গার্ডের কার্য্য করিয়া ৫২ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শশিভূষণ রেলবিভাগে এসিষ্ট্যাণ্ট গুডস্ ক্লার্কের কাজ করিতেন কিন্তু একমাত্র পুত্র সুবোধের জন্মের দুই মাস পরে অতি অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন। সুবোধচন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কিছুদিন দৌলতপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন কিন্তু রোগগ্রস্ত হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দেন। ইং ১৯২৭ সালে গবর্ণমেণ্ট সেনিটারী ইনস্পেক্টার ক্লাস হইতে পাশ করিয়া বর্ত্তমানে খুলনা জেলাবোর্ডের অধীনে কার্য্য করিতেছেন।

* * * * *

রায়বাহাদুর শশিভূষণ মজুমদারের জীবনীতে তাঁহার কন্যা একটী প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ করেন নাই, জ্ঞানদা তাঁহার ২য় পক্ষের স্ত্রী। শশিভূষণ প্রথমে মঙ্গলপেতে গ্রামে প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে শ্রীযুত কেদারনাথ ঘোষের কন্যা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করেন ; কুসুমকুমারী পরমা রূপবতী, আমোদপ্রিয়া এবং দানশীলা রমণী ছিলেন। ধনী পিতার কন্যা হইয়া তিনি পাড়ার ছেলেদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতে যথেষ্ট অর্থদান করিতেন। পাড়ার মধ্যে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সকলে একবাক্যে বলিতেন, তেমন বধু আর হয় নাই, সে স্বর্গীয় কুসুম অকালে শুকাইয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত।

CamScanner



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ

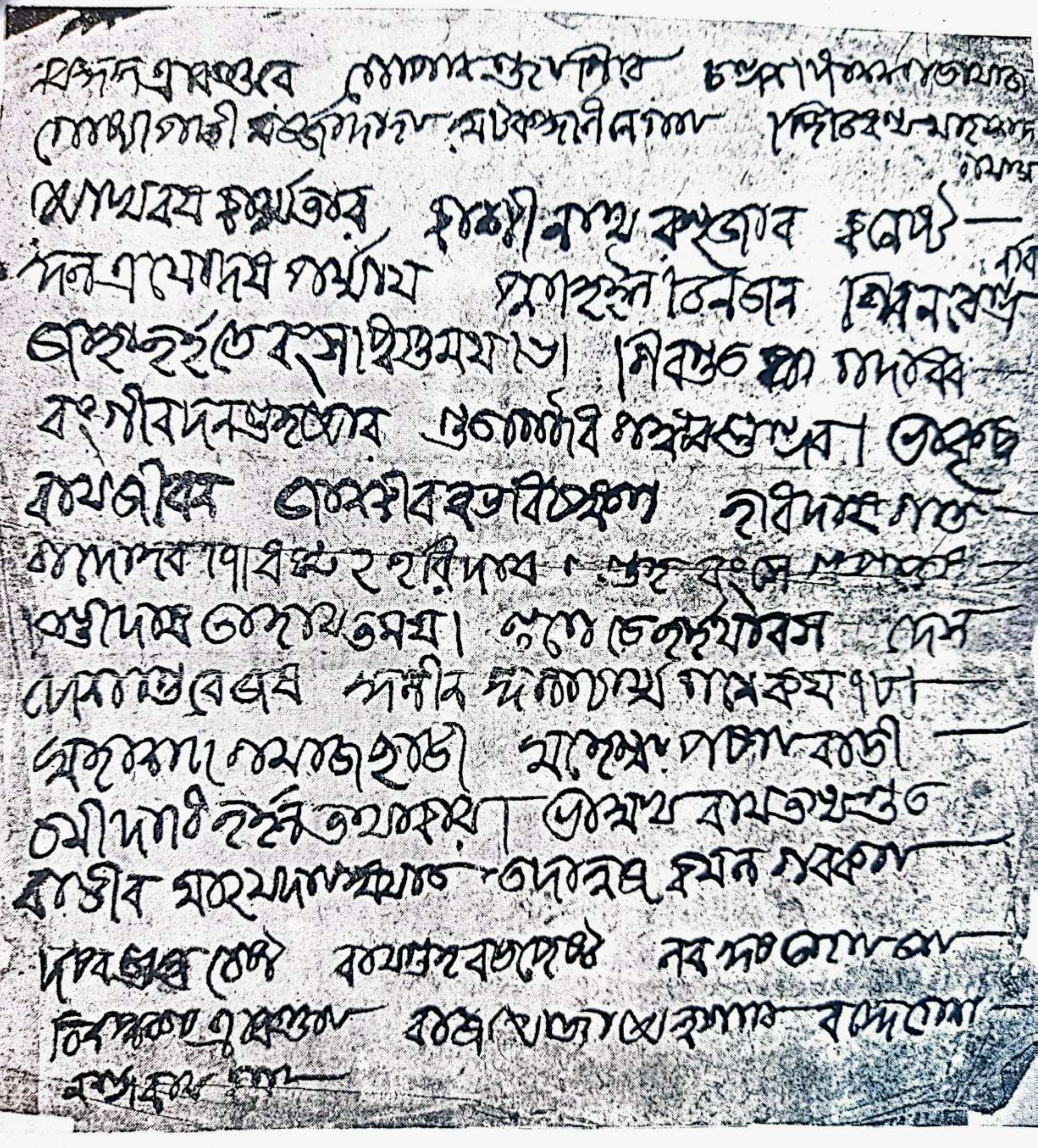
[ষ্টেসন মাষ্টার মরিয়ানী ;] [পৃষ্ঠা ২১

(শ্রী[illegible] নাথ বসুর “মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের” জন্য।)

কনুঙ্গ নগর গ্রাম দমরত গুহ নাম আদি-
পুরুষ সর্ব্বত্র আগমন। বিধাদসাক্ষিকার স্য
যৌনিকত্ত পাদহয় পানহিন হইলে তেকারণ গাছা
চারিবিন্দু [illegible] কয়স্থ হবজেগত লক্ষ্য বহিলে
এই দেশে। তবত আর [illegible] বংশতথ্য এক জন
দুই পুত্র লক্ষণের বংশোয় [illegible]
[illegible] বংশ সম্প্রদায় [illegible] ।।
তৎসুত [illegible] দ্বিবাকর [illegible]
বাণীশ্বর [illegible] ৩। একজন হইলতার [illegible]
[illegible] তাহার নগরে। তৎসুত
কমলাকান্ত বংশেতে সে [illegible]
একজন ৪। [illegible] নাম [illegible]
ঠাকুর তাহার [illegible]। তাহার তনয় দুই [illegible]
বাণী এই [illegible]

ঘটক নন্দরাম মিত্রের কারিকা। (১ম পৃষ্ঠা)

শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।



ঘটক নন্দরাম মিত্রের কারিকা (২য় পৃষ্ঠা।)

শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।